মহাস্থবির জাতক

(তৃতীয় পর্ব)

"মহাস্থবির"

রঞ্জন পাবলিশিং হাউস
৫৭, ইন্দ্র বিশ্বাস রোড কলিকাতা-৩৭

প্রচ্ছদপট : শ্রীআশু বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রথম সংস্করণ : আষাঢ় ১৩৬১

মূল্য পাঁচ টাকা

শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭
হইতে শ্রীরঞ্জনকুমার দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

১১—১৯. ৬. ৫৪

নিবেদন

'মহাস্থবির জাতক' লিখতে আরম্ভ ক'রে মনে হয়েছিল তিন চার বছরের মধ্যেই কয়েক পর্ব লেখা সম্পূর্ণ করতে পারব। কিন্তু তা হয় নি—অর্থাৎ আর একবার প্রমাণ হয়ে গেল, যা মনে করা যায় সব সময়ে তা হয়ে ওঠে না। দ্বিতীয় পর্ব লেখবার সময়েই আমার দেহ ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হয়। কিছুকাল পরে একটু সুস্থ হয়েই তৃতীয় পর্ব লিখতে শুরু করি। তৃতীয় পর্ব যখন মাসে মাসে 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশিত হচ্ছিল, তখন আবার ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে পড়ি। সেই সময়েই মাসে মাসে নিয়মিতভাবে 'জাতকে'র আবির্ভাব হয়তো বন্ধ হয়ে যেত যদি না স্নেহাস্পদা কবি উমা দেবী তাঁর সাহায্যহস্ত প্রসারিত করতেন। তিনি প্রতি মাসে পাণ্ডুলিপি থেকে আমার দুর্বোধ্য হস্তাক্ষর উদ্ধার ক'রে নিয়মিতভাবে প্রেস-কপি তৈরি ক'রে দেওয়ায় 'জাতক' প্রকাশের ধারাবাহিকতা অক্ষুন্ন ছিল—এজন্যে এখানে তাঁর ঋণ স্বীকার করছি।

"মহাস্থবির"

উৎসর্গ

দুর্দিনে দুর্গম পথের সহযাত্রী

বন্ধু

উষাকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের স্মরণে

মহাস্থবির জাতক

তৃতীয় পর্ব

কবি বলেছেন, সুখ-দুখ দুটি ভাই। কি রকম ভাই? মায়ের পেটের ভাই, কি চোরে চোরে মাসতুতো ভাই—সে বিষয়ে তিনি নীরব। তাই সুখ ও দুঃখ সম্বন্ধে এইখানে তেড়ে একটি ভাষণ ঝাড়বার প্রলোভন হচ্ছে। কিন্তু ভয় নেই, সংযত হচ্ছি। আপনারা শুধু একবার মনশ্চক্ষু উন্মীলন ক'রে দেখুন, স্থবির শর্মা চটিজুতো পায়ে দিয়ে চ্যাটাং চ্যাটাং করতে করতে চলেছে কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটের ফুটপাথ দিয়ে ইস্কুলের দিকে। বগলে তার খানকয়েক বই, তাতে অনেক জ্ঞানগর্ভ কথা আছে; কিন্তু যে অভিজ্ঞান তার মাথায় বোঝাই করা রয়েছে তার তুলনায় সে সব জ্ঞান অতি তুচ্ছ। কিন্তু সংসার তা স্বীকার করলে না, তাই আবার এই কৃচ্ছ্রসাধনের অভিনয়—

বাড়িতে ফিরে আসবার পর বাবা কোনও কথা বললেন না—না বকুনি, না প্রহার। শুধু বললেন—কাল থেকে আবার ইস্কুলে যেতে আরম্ভ কর।

আমি আশঙ্কা করেছিলুম, বাড়ি ফিরলে বাবা মেরে একেবারে পাট বিছিয়ে দেবেন। কিন্তু পাছে আবার পলায়ন করি, এ জন্যে তিনি কিছু বললেন না। প্রহারের হাত থেকে অব্যাহতি পেয়ে আমিও ভালমানুষের মত ইস্কুলে যেতে আরম্ভ ক'রে দিলুম। আমি মনে করলুম, বাবা কি ভালমানুষ; আর বাবা মনে করলেন, আমার ছেলে কি বাধ্য। কিন্তু আমরা দুজনেই ভুল করলুম, কারণ বাড়ি থেকে পালানো আমার বন্ধ হ'ল না। বাবাকেও দীর্ঘকাল ধ'রে আপসোস করতে শুনেছি যে, প্রথমবারের পলায়নের পর বেশ উত্তম-মধ্যম পেলে আমি আর কখনও পালাতে সাহস করতুম না। আর আমার দিক দিয়ে আমিও বহুকাল আপসোস করেছি এই ভেবে যে, প্রথমবারেই যদি ভুলে যেতে

অস্বীকার করতুম, তা হ'লে যা হবার তখুনি একটা এস্‌পার-ওস্‌পার হয়ে যেত, কারণ প্রথমবারেই গৃহপ্রত্যাগমনের পর আবার আমায় ইস্কুলে যেতে হয়েছে।

যা হোক, ইস্কুলে যেতে হ'লেও পড়াশুনোর বালাই আর রইল না। স্বদেশীর বন্তায় সারা বাংলা দেশ তখন টলমল করছে। ইস্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন নামকরণ হয়েছে—গোলামখানা। এই স্বদেশীর কল্যাণে অনেক ছেলে ইস্কুল-কলেজের কবল থেকে রক্ষা পেয়ে গেল, অনেক ধনী-অভিভাবক ব্যাপার সুবিধা নয় বুঝে ছেলেদের বিলেতে পাঠিয়ে দিলেন। বোম্বাইয়ের খলিফারা এই সুযোগে গরিব বাঙালীর পয়সায় বড়লোক হতে লাগল। বাঙালীরা বিলিতী মিলের ধুতি বর্জন ক'রে ডবল দাম দিয়ে বোম্বাই মিলের চট কিনতে লাগল। আর তার পরিবর্তে বোম্বাইয়ের মিলওয়ালারা বাংলা ও বিহারের কয়লা বর্জন ক'রে দক্ষিণ-আফ্রিকা থেকে কয়লা আমদানি ক'রে বাংলার ঋণ পরিশোধ করতে লাগল।

বাঙালীর জাতীয় জীবনে পূজা, দোল, দুর্গোৎসব, পরনিন্দা, ঘোঁট, কীর্তন প্রভৃতি উৎসবে উৎসাহ ছিল প্রচুর, কিন্তু এই স্বদেশী আন্দোলন তাদের জীবনে উৎসাহের সঙ্গে নিয়ে এল উত্তেজনা।

স্বদেশী আন্দোলনের ঘটনাপ্রবাহ আজ চলচ্চিত্রের মতন মনের পর্দায় একে একে ভেসে উঠছে। ভেসে উঠছে বাঙালীর সেই উন্মাদনার চিত্র, সেই ভাবের জোয়ার—যাতে একদিন তারা হাত পা ছেড়ে আপনাকে ভাসিয়ে দিয়েছিল। অদ্ভুত এই বাঙালী-চরিত্র! তারা পূজা করে শক্তির, কিন্তু চর্চা করে মাধুর্য রসের—তাই কাটলেট ও মালপোয়ায় তাদের সমান রুচি। এই স্বদেশীর দিনে তারা কীর্তনের সুরে যুদ্ধের গান গেয়ে সকলকে দেশাত্মবোধে অনুপ্রাণিত ক'রে বেড়াতে লাগল।

সিপাহী-বিদ্রোহের পর ইংরেজরা কিছুকাল মুসলমান-দমননীতি চালিয়ে ও সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুদের পিঠে হাত বুলিয়ে কিছুতেই এই মূর্তিপূজকদের বাগে আনতে না পেরে হিন্দু-দমন ও মুসলমান-তোষণ নীতি অবলম্বন করলে—যার

ফলে হ'ল বঙ্গ-বিভাগ। ইংরেজরা পূর্ববঙ্গকে একটা ছোটখাট পাকিস্তানে পরিণত ক'রে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে ভেদ বাড়িয়ে তোলবার চেষ্টা করতেই বাঙালী নেতারা হিন্দু-মুসলমানের মিলনের চেষ্টা করতে লাগলেন। কয়েকজন মহাপ্রাণ মুসলমানও হিন্দুদের দলে যোগ দিলেন বটে—কিন্তু অধিকাংশ মুসলমানই এই মিলনের শুধু বিপক্ষতা নয়, বিরোধিতা করেছিলেন। মুসলমানদের গ্রন্থাদি যাই বলুক না কেন, তাঁরা কখনও কোনও সময়েই অন্যধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে স্বচ্ছন্দে একত্রে বাস করেছেন—এমন নজির ইতিহাসে পাওয়া যায় না! তাই ইংরেজদের এই চালকে তাঁরা আগ্রহের সঙ্গে বরণ করেছিলেন। ইংরেজদের এই অপচেষ্টা ব্যর্থ করবার জন্য সে সময় বাংলার নেতারা সমস্ত ভারতবর্ষের হিন্দু-মুসলমানকে মিলিত করবার চেষ্টা করেছিলেন।

সে সময় উপযুক্ত স্থানের অভাবে সভা করবার খুবই অসুবিধা ছিল। হয় খোলা মাঠ কিংবা টাউন হল ছাড়া সভা করবার বড় জায়গা শহরে ছিল না। কিন্তু গড়ের মাঠ ও টাউন হল দুই-ই ছিল সরকারী আমলাদের কবজায়, কাজেই সরকারের বিরোধী কোনও সভা হওয়া সেখানে এক রকম অসম্ভবই ছিল। তাই স্বদেশীযুগের আরম্ভেই নেতারা স্থির করলেন যে, হিন্দু-মুসলমানের মিলন-মন্দির নাম দিয়েই একটা বড় সভা-গৃহ নির্মাণ করতে হবে। অবিশ্যি তাঁরা ঠিক করেছিলেন এই সভাগৃহের নাম হবে—দি ফেডারেশন হল। মাতৃ-ভাষায় কিছু কল্পনা করা তাঁদের পক্ষে দুরূহ ছিল কিনা!

আচার্য জগদীশচন্দ্রের বাড়ির সম্মুখে, ব্রাহ্ম-বালিকা-শিক্ষালয়ের ডান দিকে একটা বড় এবড়ো-খেবড়ো খালি জমি প'ড়ে ছিল। ঠিক হ'ল এই জমির ওপর প্রস্তাবিত মিলন-মন্দির তৈরি করা হবে। তিরিশে আশ্বিন রাখিবন্ধনের দিন এইখানে বিরাট সভা হ'ল। সভায় বোধ হয়, কুড়ি-পঁচিশ হাজার লোকের সমাগম হয়েছিল। আজকাল একটা ফুটবল ম্যাচ দেখতে যেমন হুট বলতে পঞ্চাশ হাজার লোক জমা হয়, তখন তা ছিল না। কোন সভায় বিশ-পঁচিশ হাজার লোক একত্র হওয়া অদ্ভুত ব্যাপার ব'লে বিবেচিত হ'ত।

সেদিন বেলা তিনটে বাজতে না বাজতে সেই পতিত জমিতে লোক এসে জমা হতে লাগল। নানান পাড়া, সংঘ, সমিতির শোভাযাত্রা আসতে লাগল স্বদেশ-সঙ্গীত গাইতে গাইতে। 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনিতে আকাশ কেঁপে উঠতে লাগল। তখনকার দিনে সারকুলার রোডের ওই অঞ্চলটা ছিল বেশ নির্জন, বাড়ি-ঘরও বেশি ছিল না। যা দু-চারখানা নতুন বাড়ি সে সময় তৈরি হয়েছিল, তারই ছাতে ছাতে লাগল মেয়েদের ভিড়—কলকাতায় সে দৃশ্য নতুন, এক নতুন ভাবের জোয়ারে নগরবাসী গা ঢেলে দিয়েছে, সে এক নতুন উত্তেজনা!

সভায় সেই কাল্পনিক মিলন-মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করা হ'ল। কার জমি, কে টাকা দেবে, কোথা থেকে টাকা আসবে—সে সব তুচ্ছ ব্যাপার কেউ গ্রাহ্যের মধ্যেও আনলে না। স্বর্গীয় ব্যারিস্টার আনন্দমোহন বসু মহাশয় ভিত্তি স্থাপন করলেন। তিনি তখন অত্যন্ত অসুস্থ ছিলেন—এই ব্যাপারের কিছুদিন পরেই তিনি দেহরক্ষা করেন।

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের বাড়ি থেকে তাঁকে তোলা-চেয়ারে বহন ক'রে সভা-ক্ষেত্রে নিয়ে আসা হ'ল। সেই বিরাট জন-কল্লোল মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেল। তার মধ্যে একতারার মত ক্ষীণ কণ্ঠে বেজে উঠল বসু মহাশয়ের প্রার্থনা—একখানি করুণ সঙ্গীতের মত। মুমূর্ষু দেশনায়কের সেই কাতর মর্মবাণী আজ অতীতের গর্ভ থেকে উঠে নতুন সুরে আমার কানে এসে বাজছে, And Thou, Oh God of this ancient land, the Protector and Saviour of Aryavarta and the merciful Father of us all, by whatever name we call upon Thee, be with us on this day, and as a father gathered his children under his arms, do Thou gather us under Thy protecting and sanctifying care.

কিন্তু ওই যে Thou, যিনি পুরুষের ভাগ্য এবং নারীর চরিত্র সৃষ্টি করেছেন, তিনি যে সবচেয়ে বেশি দুজ্ঞেয়—সে কথাটা মানুষ যে জানে না তা নয়, কিন্তু

দুর্দিনে প'ড়ে মানুষ তাঁর কাছে সোনার পাথর বাটি চেয়ে বসে। হাত পাতলেই যদি তাঁর কাছ থেকে জিনিস পাওয়া যেত, তা হ'লে ঘরে ঘরেই বিরোধের অন্ত থাকত না। এ কথা ভুললে কিছুতেই চলবে না যে, আমাদের মঙ্গল সম্বন্ধে এই Thou আমাদের চেয়ে ঢের বেশি সচেতন, এবং বোধ হয় সেই জন্যেই হিন্দু-মুসলমানে আজও মিলন হয় নি—মিলন-মন্দির তো দূরের কথা।

সেই কল্পিত মিলন-মন্দিরের মাঠে এখন কতকগুলো বাড়ি তৈরি হয়েছে। এই বাড়িগুলোর পাশ দিয়ে একটা রাস্তা তৈরি হয়েছে, তার নাম ফেডারেশন স্ট্রীট। যেখানে একদিন উচ্চচূড় মিলন-মন্দিরের সম্ভাবনা হয়েছিল সেখানে আজ সদর রাস্তা হয়েছে—অর্থাৎ মিলনের আশা ধূলিসাৎ হয়েছে।

বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে সমান তালে আমার অন্তরেও তখন বিক্ষোভ, অশান্তি ও উত্তেজনার ঝড় বইতে শুরু করেছিল। স্বদেশীর বন্যায় গা ঢেলে দিয়ে মাঠে মাঠে মীটিংএ যাওয়া, দলবদ্ধ হয়ে গান গাইতে গাইতে শহরের রাস্তা পরিক্রমণ করা, কনস্টেব্‌লের তাড়া খেয়ে লম্বা দেওয়া, তার ওপরে ফুটবল খেলা ও গড়ের মাঠে ম্যাচ দেখতে যাওয়া—সবই চলছিল বটে; কিন্তু আমার মধ্যে যে একজন চৌকিদার আছে সে কিছুতেই নিশ্চিন্ত হতে দিচ্ছিল না। আমার খালি মনে হতে লাগল, এর পরে কি হবে! এই উত্তেজনার ঝড় শান্ত হয়ে গেলে—একদিন শান্ত হবেই—তখন আমার কি হবে? কি আমার ভবিষ্যৎ? আমি কি করব? লেখাপড়া শিখে নিজেকে ভবিষ্যতের জন্যে তৈরি ক'রে নিতে হ'লে যে বুদ্ধি, অধ্যবসায় ও পারিপার্শ্বিক অনুকূল অবস্থার প্রয়োজন হয়, আমার তা ছিল না। তা ছাড়া কানুনমাফিক নিয়মানুবর্তিতায় পড়াশুনো করবার আগ্রহ বহুদিন আগেই ছুটে গিয়েছিল। তার ওপরে কেন জানি না, সে সময় স্বদেশী নেতারা—বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাল ভাল মার্কা যাঁরা অঙ্গে ধারণ করতেন তাঁরা পর্যন্ত—বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি একটা আক্রোশ পোষণ করতেন এবং বক্তৃতায় ও লেখায় তা প্রকাশ করতেন। আশুতোষ বিল্ডিং বা দারভাঙ্গা বিল্ডিং তখনও

তৈরি হয় নি। সেনেট হলকে লোকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাড়ি ব'লে জানত। সেনেট হলের মোটা থামে শিগগিরই 'To Let' অথবা 'বাড়ি ভাড়া' লেখা ঝুলতে থাকবে—এ কথাও অনেক নেতাই বলতেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম দেওয়া হয়েছিল—গোলামখানা। তাঁরা বলতেন, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ইস্কুল ও কলেজগুলোতে এক গোলামি করতে শেখানো ছাড়া আর কিছুই শেখানো হয় না। ছাত্ররা যাতে সত্যিকারের শিক্ষা পেতে পারে সেজন্য স্বদেশী বিশ্ববিদ্যালয় খোলা হ'ল। অবিশ্যি এই স্বদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গতিপন্ন কর্তারা নিজেদের ছেলেদের শিক্ষার জন্য বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের শরণাপন্ন হয়েছিলেন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় ফেল-করা অনেক ছেলে 'আসল শিক্ষা' লাভ করবার জন্যে স্বদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকতে লাগল। ছেলেরা যাতে হাতে-কলমে ব্যবহারিক কোন শিক্ষা পায় সেজন্য স্বদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইন্সটিটিউট খোলা হ'ল। সারকুলার রোডে আজ যেখানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সায়ান্স কলেজের বিরাট বাড়ি দেখা যাচ্ছে, সেখানে ছিল সার্ তারকনাথ পালিত মহাশয়ের বাগানবাড়ি। সেই বাড়িতেই বসেছিল বেঙ্গল টেক্‌নিক্যাল ইন্সটিটিউট। এখানেও দলে দলে ছেলে ভর্তি হতে লাগল। এই বেঙ্গল টেক্‌নিক্যালই পরে যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পরিণত হয়েছে।

সে সময় তাঁত শিল্পকে বাঁচিয়ে তোলবার খুব একটা হিড়িক পড়েছিল। ভদ্রলোকের ছেলেদের তাঁত চালাতে শেখাবার জন্যে অনেকগুলি প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে উঠেছিল। এই সব জায়গাতেও দলে দলে ছেলে এসে ভর্তি হতে লাগল। মোট কথা, ইস্কুল ও কলেজী শিক্ষা এ দেশে প্রবর্তিত হবার পর থেকে সেদিন পর্যন্ত এক ধারায় নিরুপদ্রবে চ'লে আসছিল যে প্রবাহ, তারই ধারাবাহিকতায় লাগল প্রচণ্ড আঘাত। তার ফলে কত ছেলের জীবনতরী যে বানচাল হয়ে গেল, তার ঠিক-ঠিকানা নেই।

এই উত্তেজনার মধ্যে বাস ক'রেও আমার মনে হতে লাগল, আমার জীবনের ক্ষেত্র এ নয়। আমাকে যদি জীবনে উন্নতি করতে হয়, তবে আমাকে সব ছেড়ে বেরিয়ে পড়তে হবে। বাইরে থেকে একটা প্রবল আকর্ষণ আমাকে দিনরাত্রি টানতে লাগল। সেখানকার বৈচিত্র্য, সেখানকার সুখদুঃখ, অপরিচিতের সঙ্গে আত্মীয়তা, নিতান্ত নিশ্চিন্তে জীবন একটানায় চলতে চলতে অপ্রত্যাশিত ভাবে বিপদ ও অনিশ্চয়তার আবর্তে প'ড়ে হাবুডুবু খাওয়া—এই জীবনের মধ্যে যে নেশা আছে, সেই নেশা আমাকে পেয়ে বসেছিল। গতবারে আমার জীবনে যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল, লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করলে অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত পরীক্ষা কৃতিত্বের সঙ্গে পাস করলেও তার সঙ্গে তুলনা হয় না। আমি স্থির করলুম, আমি সেই জীবনেই ফিরে যাব। পরীক্ষা পাস ক'রে চাকরি নিয়ে নিশ্চিন্ত জীবন যাপন করা আমার দ্বারা হবে না।

বাইরে চ'লে যাব অর্থাৎ এক কথায় যার নাম আবার বাড়ি থেকে পালাব। কিন্তু পালাব বললেই পালানো যায় না। এই পলায়ন ব্যাপারে গতবারে যে কতকগুলো অভিজ্ঞতা হয়েছিল, তার প্রথমটা হচ্ছে—অর্থ কিঞ্চিৎ বেশি চাই। সেবারে প্রথম থেকে অনেকে অযাচিতভাবে আমাকে সাহায্য করেছিলেন। ভাগ্য সুপ্রসন্ন থাকলে আমার জীবননদী অন্য খাতে প্রবাহিত হ'ত। কিন্তু যদি কেউ সাহায্য না করে! সেজন্য অন্তত কিছুদিনের জন্যও তৈরি থাকা বুদ্ধিমানের কাজ। এই অর্থ যোগাড় করা আমার দ্বারা সম্ভব নয়; কাজেই এমন লোক সঙ্গী চাই যে, সেই প্রয়োজনীয় অর্থের যোগাড় সে করতে পারবে। পরিতোষকে সঙ্গে নেবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু সে দেখলুম ইস্কুল-টিস্কুল ছেড়ে দিয়ে তাঁতের ইস্কুলে ঢুকে মনের আনন্দে মাকু চালাচ্ছে এবং স্থির ক'রে ফেলেছে যে, ঐ তাঁতের মাধ্যমেই সে জীবনে উন্নতি করবে। যা হোক, সে দিক থেকে কোন সাড়া না পেয়ে আমি তক্কে-তক্কে ফিরতে লাগলুম—দেখি, কোথা দিয়ে কি হয়!

আমরা যেখানে পড়তুম, সেটা ছিল বোর্ডিং ইস্কুল। নতুন ইস্কুল ব'লে

ছাত্রসংখ্যা ছিল খুবই কম এবং সে জন্যে আমরা প্রায় সকলেই সকলকে চিনতুম। বোর্ডিঙের বেশির ভাগ ছেলেই মফস্বলের, ও তাদের অধিকাংশেরই বাড়ির অবস্থা বেশ ভাল। একদিন বিকেলে খেলার পর মাঠে ব'সে গল্প হচ্ছে—গল্পের বিষয়বস্তু আমার পলায়নের অভিজ্ঞতা—এমন সময় সুকান্ত বললে, তোমার সঙ্গে আমাদের জনার্দনের দেখছি অনেক মিল আছে।

সুকান্ত ও জনার্দন দুজনেই বোর্ডিঙে থাকত এবং আমার চাইতে নীচের ক্লাসে পড়ত। কিন্তু তা হ'লেও সুকান্ত ভাল খেলতে পারত ব'লে আমার সঙ্গে তার খুব ভাব জ'মে গিয়েছিল। সে বললে, জনার্দন দু-দুবার বাড়ি থেকে লম্বা দিয়েছিল।

—বল কি! তা হ'লে তো ভাব করতে হয় তার সঙ্গে।

জনার্দনের সঙ্গে আমার মৌখিক আলাপ ছিল মাত্র, এবার ভাল ক'রে ভাব জমল। মাস দুয়েক আগে সে ইস্কুলে ভর্তি হয়েছে। এর আগে পূর্ববঙ্গের কোন এক শহরের ইস্কুলে পড়ত। তাকে বাইরে থেকে একটু গম্ভীর প্রকৃতির ছেলে ব'লে মনে হ'ত। কিন্তু মিশে দেখলুম, সে দিব্যি হাসিখুশি দিলখোলা ছেলে। বাড়ি থেকে সে পালায় কেন—তার কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে বললে, দূর, এ সব কিছু ভাল লাগে না, তাই মাঝে মাঝে চ'লে যাই।

জিজ্ঞাসা করলুম, কি সব ভাল লাগে না?

—এই সব ইস্কুল, পড়াশুনো, বাড়িঘর, আত্মীয়, পরিজন—

মোট কথা, জনার্দন কেন যে বাড়ি থেকে পালায় তার কারণ তার নিজের কাছেই পরিষ্কার নয়। বর্তমান জীবন-যাত্রার মধ্যে কোথায় কি একটা খুঁত আছে, যা স্পষ্ট না হ'লেও তাকে খোঁচা দিয়ে বাড়ি থেকে বের ক'রে নিয়ে যায়। আমিও বাড়ি থেকে পালিয়েছিলুম শুনে সে বললে, বেশ হয়েছে, তোমার সঙ্গে আমার মিলবে ভাল।

শুনলুম, জনার্দন দু-দুবার পালিয়ে তিব্বতের দিকে রওনা হয়েছিল। একবার সিকিমের ভেতর দিয়ে খানিকটা অগ্রসর হয়েছিল আর একবার

নৈনিতাল না কোথা দিয়ে ভারতের সীমান্ত অবধি পৌছেছিল—সেখান থেকে মানস সরোবর আর দিন দুয়েকের রাস্তা মাত্র। কিন্তু দুবারেই তাকে পুলিসে ধ'রে নিয়ে এসেছে।

জনার্দনকে জিজ্ঞাসা করলুম, এত জায়গা থাকতে তিব্বতের দিকে গেলে কেন?

সে বললে, কেন! তিব্বত তো ভাল জায়গা—রাজা রামমোহন রায় গিয়েছিলেন সেখানে—

বললুম, রামমোহন রায় গিয়েছিলেন তার কারণ আছে। সেখানে ধর্ম সম্বন্ধে অনেক বই-টই আছে, সেই সব বই পড়তে গিয়েছিলেন। তার পর সেখানকার লোকেরা তাঁকে মেরে ফেলতে গিয়েছিল, তিনি কোন রকমে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছিলেন।

জনার্দন জিজ্ঞাসা করলে, কেন, তিব্বত কি তোমার ভাল লাগে না?

বললুম, না ভাই, আমার দুরাশা অত উচ্চ নয়। শেষকালে কি বেঘোরে প্রাণটা দেব?

জনার্দন বেশ মুরুব্বির চালে বললে, নাঃ, আজকাল আর তিব্বতে গেলে ওরা কিছু বলে না। তার ওপর সেখানে সব লামারা আছে, তারা খুব ভাল লোক। আমার তো তিব্বত খুবই ভাল লাগে। পয়সা-কড়ির সুবিধে করতে পারলে আবার আমি সেখানে চ'লে যাব।

কোন কোন লোকের বিশেষ কোন রঙের প্রতি কিংবা খাবারের প্রতি বা বিশেষ কোন স্থানের প্রতি একটা অহেতুক আকর্ষণ থাকে। দেখলুম, আমাদের জনার্দনেরও তাই। দুনিয়ার এত সমতল ক্ষেত্র থাকতে হিমালয়ের উচ্চতার প্রতি তার এই আকর্ষণ আমার কাছে অদ্ভুত ব'লে মনে হ'ল।

একদিন কথায় কথায় জনার্দন আমাকে বললে, দেখ, যদি টাকার যোগাড় করতে পারি তো আমার সঙ্গে তিব্বত যাবে?

—পাগল হয়েছ! খামকা তিব্বত কেন যাব বল?

—কেন, সেখানে সব লামা আছে।

—লামা আছে তো আছে, তাতে আমার কি? প্রথমে তিব্বতের পথ অত্যন্ত বিপদসঙ্কুল, সেখানকার লোকেরা বাইরের লোককে তাদের দেশে ঢুকতে দেয় না, অনেক সময় মেরেই ফেলে। তার পরে ভয়ানক শীত সেখানে—সবার ওপরে সেখানে গিয়ে কি করব বল? বরঞ্চ আমি চ'লে যাব দিল্লী কি বোম্বাই কিংবা অন্য কোন শহরে। সেখানে গিয়ে ব্যবসা করব। পয়সা যদি বেশি পাই তো চ'লে যাব ইউরোপ কিংবা আমেরিকায়—কোথাও কিছু নেই, তিব্বতে যেতে যাব কেন?

অহো! দিল্লী নামের কি মহিমা! শুধু ভারতবর্ষেই নয়, সুদূর অতীতেও দূর-দূরান্তরের দুর্ধর্ষদের উত্তেজিত করেছে এই নামের মোহ, এই নামের রহস্য। কেউ এসেছে একলা, কেউ বা এসেছে সদলবলে। কেউ জিতেছে, আবার কেউ বা পস্তিয়েছে দিল্লীর লাড্ডু আস্বাদন ক'রে। জনার্দন তো ক্ষীণজীবী বাঙালী বালকমাত্র। নাম শুনেই সে তিব্বত থেকে গড়াতে গড়াতে একেবারে সমতল ভূমিতে এসে পড়ল।

জনার্দন বললে, আচ্ছা, কুছ পরোয়া নেই, দিল্লীই যাওয়া যাবে। টাকার জন্যে ভাবনা নেই, টাকার যোগাড় হয়েই যাবে। যে দিন টাকা পাওয়া যাবে, সেই দিনই যেতে পারবে তো?

—নিশ্চয় পারব।

আমাদের ছেলেবেলায় কলকাতা শহরে গুজব-সম্রাটের আধিপত্য ছিল খুবই বিস্তৃত। ফুটবল, হকি, ক্রিকেট প্রভৃতি খেলা সে সময় এখনকার মত জনপ্রিয় ছিল না। সিনেমা, রাজনৈতিক সভা ও নানা মতের প্রতিষ্ঠান, রেডিও, প্রভৃতি আমোদের উপাদানগুলি তখনও আবিষ্কৃত হয় নি। এই গুজব-সম্রাটেরাই তখন ছিল এক রকম সাধারণ প্রমোদ-পরিবেশক। এরা অদ্ভুত অদ্ভুত সব গুজব আবিষ্কার ক'রে বাজার সরগরম রাখত। ওদিকে বটতলার প্রকাশকেরা মাঝে মাঝে এক ফরমা পাতলা কাগজে মুদ্রিত গুজব-পুস্তিকা বাজারে ছাড়ত।

হুকারেরা চীৎকার ক'রে হাঁকতে হাঁকতে গলি দিয়ে চলত, ১৮৯৯ সালে—কি জানি কি আছে কপালে—একটি পয়সা খরচ ক'রে ইত্যাদি।

হু-হু ক'রে সেই সব বই বিক্রি হ'ত।

মনে আছে, একবার গুজব রটল—পৃথিবী ধ্বংস হবে। অবিশ্যি পৃথিবী ধ্বংস হবার গুজবটা প্রায়ই রটত, কিন্তু সেগুলো ছিল অত্যন্ত ক্ষীণ। এবারকার গুজবটা রটল খুব জোর। অমুক দিনে রাত্রি একটার সময় এবার পৃথিবী নিশ্চয় ধ্বংস হবে। বাড়িতে বাড়িতে ইস্কুলে আপিসে ওই একই আলোচনা চলল দিনরাত্রি ধ'রে। কি ভাবে ধ্বংস হতে পারে, তা নিয়ে হরেক রকমের গবেষণা হয়। বন্যা, ভূমিকম্প, পৃথিবী ফুঁড়ে অগ্ন্যুৎক্ষেপণ—এর কোনও একটা কিংবা সব কটাই একসঙ্গে হতে পারে। মোট কথা, কলির শেষ হয়েছে, এবার পৃথিবী ধ্বংস হয়ে আবার সত্যযুগ আরম্ভ হবে।

মনে পড়ে, নির্দিষ্ট রাত্রির সন্ধ্যাবেলা অভিভাবকেরা পড়তে বসবার তাগাদা দিলেন না। খাওয়া-দাওয়া শেষ হবার পর আমাদের বিছানায় যাবার হুকুম হ'ল। মা বললেন, বারোটা নাগাদ সব ঘুম থেকে তুলে দেওয়া হবে।

সত্যিই রাত্রি বারোটার সময় আমাদের ঘুম থেকে তুলে দেওয়া হ'ল। উঠে দেখি চারিদিকে হৈ-হৈ ব্যাপার চলেছে। বাড়িতে বাড়িতে ছোটরা কেউ ঘুমোয় নি, সব চেঁচামেচি করছে, কোন দল বা লুকোচুরি খেলছে। পৃথিবী ধ্বংস হবার উপলক্ষ্যে ছেলেদের উৎসাহ ও স্ফূর্তি বেড়ে গিয়েছে। নির্দিষ্ট সময়ের কিছু আগে, বাড়ির পুরুষেরা বাইরের রকে এসে বসলেন, মেয়েরা সদর-দরজার ঠিক পেছনেই পান-দোক্তা মুখে ঠেসে কলরব করতে লাগলেন অর্থাৎ বিপদের সূচনা হ'লেই 'অ্যাকশন' শুরু হয়ে যাবে। ভূমিকম্প যদি হয় তবে তাঁরা রাস্তায় বেরিয়ে পড়বেন, আর যদি জলপ্লাবন হয় তবে পুরুষেরা বাড়ির মধ্যে ঢুকে ছাতে চড়বেন। কিন্তু ক্রমে ঘড়ির কাঁটা ঘুরতে ঘুরতে একটা দেড়টা ছুটোর ঘর পেরিয়ে গেল—কিছুই হ'ল না। যে যার বিছানায় সকলেই

ফিরে গেল—পৃথিবী ধ্বংসও হ'ল না, কলিরও অবসান হ'ল না, অপ্রতিহত প্রভাবে তিনি আজও রাজত্ব ক'রে চলেছেন।

আধুনিকেরা প্রশ্ন করতে পারেন, এই সব গাঁজাখুরি গুজবের মধ্যে কোনও সত্য নেই—এ কথা কি শহরবাসীরা বুঝত না? তার উত্তর হচ্ছে, খুবই বুঝত। বড়দের কথা ছেড়েই দেওয়া যাক, আমরা বালকেরাও তা বুঝতে পারতুম। কিন্তু ব্রহ্ম যেমন নিজের সৃষ্ট মায়ার মধ্যে লীলা করেন, শহরবাসীরাও তেমনই নিজেদের কল্পিত বিপদ নিয়ে দিন কয়েক লীলানন্দ উপভোগ করতেন। তাঁদের সঙ্গে তাল রাখতে গিয়ে লীলাসঙ্গিনীদের যে অবস্থা হ'ত, সে কথা উল্লেখ ক'রে আর কাজ নেই।

সেবার আমাদের পুজোর ছুটি আরম্ভ হবার কিছু আগেই ছেলে-ধরার গুজব উঠল বড় জোর। মারপিটের চোটে শহর সরগরম হয়ে উঠল। শোনা গেল, সারাতে রেল-কোম্পানি যে নতুন পুল করছে সেখানে ঠিকাদারেরা নাকি একশো ছেলেকে বলি দেবে ব'লে ঠিক করেছে। প্রমত্তা পদ্মা মানুষের রক্ত চায়, তা না হ'লে সে বন্ধনে ধরা দেবে না ব'লে স্বপ্ন পাওয়া গেছে। ঠিক সেই তালে দু-চারটি খলিফা ছেলে বাড়ি থেকে লম্বা দেওয়ায় অগ্নিতে ঘৃতাহুতি পড়ল। খবরের কাগজওয়ালারা এই নিয়ে আন্দোলন শুরু ক'রে দিলে। তখন সবেমাত্র স্বদেশী যুগ আরম্ভ হয়েছে, একটা কিছু পেলেই গভর্মেণ্টকে তুড়ে গালাগালি দেওয়া হ'ত। কাগজে পুলিস-বিভাগের অযোগ্যতা সম্বন্ধে খুব লেখালেখি চলতে লাগল। রোজই সত্য মিথ্যা ছেলেধরার গুজব উড়তে লাগল শহরময়।' কোনও ব্যক্তির ওপরে কোনও কারণে রাগ থাকলে একবার তাকে রাস্তায় ধ'রে এই ব্যক্তি 'ছেলেধরা' ব'লে চেঁচালেই হ'ল। কোথায় ছেলে, কার ছেলে, সে সম্বন্ধে খোঁজের কোনও প্রয়োজন নেই—আগে তাকে প্রহার দাও।

শহরের হালচাল তো এই দাঁড়িয়ে গেল। তখন মোটর গাড়ির বিশেষ প্রচলন হয় নি। ধনীর ছেলেরা বাড়ির ঘোড়ার গাড়িতেই ইস্কুলে যাতায়াত করত। এরই মধ্যে একদিন একজনদের বাড়ির ছেলেরা ইস্কুল থেকে গাড়ি

ক'রে কর্নওয়ালিস স্ট্রীট দিয়ে বাড়ি ফিরছে, এমন সময় কালীতলার কাছাকাছি ঘোড়াটা কি কারণে ভড়কে গিয়ে মারলে দৌড়। গাড়োয়ান গাড়ি সামলাতে পারে না, ভেতরে ছোট ছোট ছেলে, তারা কাঁদছে, গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়বার চেষ্টা করছে, এমন সময় কে রব তুলে দিলে—ছেলেধরারা গাড়ি ক'রে ছেলে তুলে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। যাঁহাতক এই কথা শোনা, অমনই রাস্তার লোক হৈ-হৈ ক'রে উঠল। নিজের জান-প্রাণ তুচ্ছ ক'রে সেই উড়ন্ত ঘোড়াকে ধ'রে ফেলা হ'ল। কোথায় গেল কোচোয়ান আর কোথায় গেল তার সহিস! ছেলেরা বাইরে লাফিয়ে পড়ল। কেউ তাদের জিজ্ঞাসাও করে না—কি হয়েছে? ঘোড়াটা ছাড়া পেয়ে উর্ধ্বশ্বাসে আবার দৌড় মারলে। শেষকালে লোকেরা লাঠি, শাবল, হাতুড়ি এনে দড়াদ্দম মারতে মারতে গাড়িখানাকে ভেঙে একেবারে চুরমার ক'রে ফেললে। এখন কর্নওয়ালিস স্ট্রীটে যেখানে শ্রীমানী বাজার আছে, আগে সেখানে সব খোলার চালের বস্তি ছিল। এই বস্তিতে পালেদের মস্ত বড় এক মুদির দোকান ছিল। উন্মত্ত জনসংঘ গাড়িখানাকে চুরচুর ক'রে ভেঙেও নিশ্চিন্ত হতে পারলে না, যদি গাড়ির সেই ভগ্নস্তূপের মধ্যে কোথাও ছেলেধরার বীজ লুকিয়ে থাকে—এই ভয়ে তারা সামনের সেই মুদির দোকানে ঢুকে কেরোসিন তেলের ক্যানেস্তারা টেনে বার ক'রে সেই চূর্ণ গাড়ির ওপরে ছড়িয়ে দিয়ে দিলে তাতে আগুন ধরিয়ে। আধ ঘণ্টার মধ্যে হাজার টাকার গাড়িখানা চার আনার কাঠকয়লায় পরিণত হয়ে রাস্তায় প'ড়ে রইল

বেশ মনে পড়ে, সেদিন আনন্দমোহন বসুর মৃত্যুদিন। সকালবেলা তাঁর দেহ শোভাযাত্রা ক'রে নিমতলার শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হ'ল। সেখান থেকে বেলা বারোটা নাগাদ বাড়িতে ফিরে আহারাদি ক'রে বেরুচ্ছি, এমন সময় দরজার সামনেই দেখি, জনার্দন ও আমার অন্যতম বন্ধু সুকান্ত দাঁড়িয়ে। দেখলুম, জনার্দনের মাথা ন্যাড়া। সে বললে, ছুটির মধ্যে হঠাৎ তার বাবা

মারা গিয়েছেন, দিনকতক আগে শ্রাদ্ধশান্তি চুকিয়ে আজ সকালে সে কলকাতায় ফিরেছে।

কথা বলতে বলতে আমরা অগ্রসর হতে লাগলুম। সুকান্ত বললে, জনার্দন কাজের ছেলে। বাড়ি থেকে শুধু-হাতে ফেরে নি, কিছু মালও নিয়ে এসেছে।

—তার মানে?

সুকান্ত বললে, চল না, বোর্ডিঙে গেলেই বুঝতে পারবে।

বোর্ডিঙে গিয়ে দেখা গেল, জনার্দন তিনটি লম্বা 'জেম' বিস্কুটের টিন ভর্তি টাকা নিয়ে এসেছে দেশ থেকে। টাকা বললে ভুল হবে, তিনটি টিন স্রেফ সিকি দুয়ানি ও আধুলিতে ভর্তি—বিশ্বাসঘাতকতা করব না, দু-চারটে টাকাও তাতে ছিল।

ইস্কুল খুলতে তখনও একদিন কি দুদিন দেরি ছিল। জনার্দন বললে, টাকা নিয়ে বাড়িতে থাকলে যদি ধরা প'ড়ে যাই, তাই ইস্কুল খোলবার আগেই চ'লে এসেছি।

তার বুদ্ধির তারিফ ক'রে বললুম, বেশ করেছ বাবা জনার্দন! ভবিষ্যতে এমন বিবেচনাশীল হবে বুঝতে পেরেই বাপে তোমার নাম রেখেছিল—জনার্দন।

তাড়াতাড়ি বোর্ডিঙের একটা ঘরে গিয়ে রেজকিগুলো গুনে ফেলা গেল। সবসুদ্ধ তিন শো টাকার কিছু বেশি হবে—তার মধ্যে আবার টাকা পঁচিশেকের সিকি দুয়ানি ছিল অচল ও কোঁড়ামারা। তার মধ্যে টাকা দশেক একেবারেই অচল আর বাকিগুলো 'চেষ্টা ক'রে দেখা যেতে পারে'-গোছের।

এত সিকি দোয়ানি জুটল কি ক'রে জিজ্ঞাসা করায় জনার্দন আকাশের দিকে মুখ তুলে যুক্ত কর বুকে ঠেকিয়ে পরলোকগত পিতার উদ্দেশে নমস্কার ক'রে বললে, বাবা যাবার সময় দিয়ে গিয়েছেন।

—তোর বাবার সিকি দোয়ানি জমাবার শখ ছিল বুঝি ?

জনার্দন হ্যাঁ কিংবা না কিছুই বললে না। শেষকালে জেরা করতে করতে বেরিয়ে পড়ল যে, বাপের শ্রাদ্ধের সময় তাদের এক এক ভাইয়ের হাতে এক-একটা কাজের ভার পড়েছিল। তার ওপর পড়েছিল ব্রাহ্মণ বিদায়ের ভার। তা থেকে সে নিজের ভাগে এই টাকাটি ফেলেছে। যা হোক, কি ক'রে অর্থ এসেছে সে বিষয়ে গবেষণা বন্ধ রেখে এখন কোথায় যাওয়া হবে তাই স্থির করতে মনোনিবেশ করা গেল। বলা বাহুল্য যে, সুকান্তও আমাদের সঙ্গে ভিড়ে গেল। আমরা স্থির করলুম যে, আমরা আগ্রায় যাব, তার পর সেখানে কিছু সুবিধে হ'লে সেখানেই স্থিতি, নয়তো অন্য কোথাও যাওয়া যাবে। তখনকার দিনে আগ্রা যাবার রেল ভাড়া ছিল প্রায় আট টাকা, কিছু কম-বেশি হতে পারে। কিন্তু ওই সিকি দোয়ানি নিয়ে তো আর টিকিট কিনতে যাওয়া চলে না। এন্‌টালির এক পোদ্দারের দোকান থেকে একশো টাকার সিকি দোয়ানি দিয়ে নব্বইটা টাকা পাওয়া গেল। তার পর একটা হোটেলে দমভোর খেয়ে রাত্রি প্রায় আটটার সময় দিল্লীযাত্রী একটা এক্সপ্রেস গাড়িতে চ'ড়ে আমরা আগ্রার দিকে রওনা হলুম।

পরের দিন দুপুর নাগাদ এলাহাবাদে গিয়ে পৌঁছনো গেল। স্টেশন থেকেই টাঙ্গা ক'রে ছুটলুম সঙ্গম দর্শন করতে। সেখানে গিয়ে নৌকো ক'রে সঙ্গমে গিয়ে মাথায় জল দিয়ে ফিরে কেল্লার মধ্যে অক্ষয়বট ইত্যাদি দেখে বাজারে যাওয়া গেল। আমরা তিনজনেই একবস্ত্রে বেরিয়েছিলুম। জনার্দন বাড়ি থেকে আসবার সময় খানিকটা গাওয়া ঘি এনেছিল। কি জানি কি মনে ক'রে সেই বোতলটা সে সঙ্গে নিয়েছিল। আর কিছুই আমাদের সঙ্গে ছিল না। বাজার থেকে তিনজনের জন্যে তিনখানা ধুতি ও একখানা লাল কম্বল কেনা গেল।

কাপড়ের দোকানে নানা রকমের কাপড় ও কম্বল দেখতে দেখতে প্রায় সন্ধ্যে হয়ে এসেছে, এমন সময় বাজারের মধ্যে একটা সোরগোল প'ড়ে গেল— মারো, মারো, পালাও ইত্যাদি। দেখলুম, লোকজন সব ঠিকরে ঠিকরে পালাচ্ছে। কি ব্যাপার! দোকান থেকে বেরিয়ে দেখা গেল, তিনজন গোরা সৈনিকের সঙ্গে মেওয়াওয়ালাদের মারপিট বেধেছে। এক পক্ষে তারা তিনজন, আর অন্য পক্ষে বাজারের দোকানদারেরা এবং যারা বাজার করতে এসেছে তাদের মধ্যে অতি সাহসী যারা, তারা। দোকানদারেরা গোরাদের লক্ষ্য ক'রে ইট-বাটখারা প্রভৃতি ছুঁড়ছে, আর তারা এক-একদিকে তাড়া ক'রে যাচ্ছে, আর হৈ-হৈ ক'রে দিগ্বিদিকে লোক ছুটছে। আমরা যে দোকানে জিনিসপত্র কিনছিলুম, সেখানেও হুড়মুড় ক'রে লোক ঢুকতে লাগল। দোকানী ছিল ভয়তরাসে লোক, সে ব্যাপার সুবিধের নয় দেখে বাইরের লোকেদের তাড়িয়ে দিয়ে একটা দরজা বন্ধ ক'রে দিলে। এদিকে গোরারা ছুটতে ছুটতে সেই দোকানের সামনে এসে দাঁড়াল। তাদের মাথার টুপি উড়ে গেছে, পেণ্টুলান জামা ছিঁড়ে ফর্দাফাঁই। মুখ, মাথা ও দেহের অনেক জায়গা দিয়ে রক্ত ছুটছে— সে এক ভয়াবহ দৃশ্য! আমরা ভয় পেয়ে দোকানের মধ্যে ঢুকতে যাচ্ছি, এমন সময় দোকানদার আমাদের ঠেলে বার ক'রে দিয়ে দরজায় তালা লাগাতে

আরম্ভ ক'রে দিলে। সুকান্তর বগলে সওদা, আমার কাছে ছিল টাকা। পাঁচ টাকা না সাড়ে পাঁচ টাকা জিনিসের দর হয়েছিল। সিকি দুয়ানি গুনছি— এর সঙ্গে দুটো কোঁড়ামারা সিকি ভিড়িয়ে দেব কি না ভাবছি, এমন সময় গোরারা একটা চলতি টাঙ্গা থামিয়ে তাতে উঠে পড়ল। টাঙ্গাওয়ালার সঙ্গে তাদের কথাবার্তা চলছে, এমন সময় একটা রোগাপানা লোক পাশের সরু গলি থেকে বেরিয়ে এসে টাঙ্গার পেছনে যে দুজন গোরা ব'সে ছিল তাদের একজনের পেটে ধাঁ ক'রে ছোরা বসিয়ে দিয়েই কোথায় পালিয়ে গেল—রক্ত একেবারে ফিন্‌কি দিয়ে বেরুতে লাগল। বাস্! টাঙ্গাওয়ালাকে আর নির্দেশ দিতে হ'ল না যে, কোথায় যেতে হবে। সে ঊর্ধ্বশ্বাসে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলে, খুব সম্ভব হাসপাতালের দিকে।

ব্যাপারটা এতই অভাবনীয় যে, প্রথমটা আমরা হকচকিয়ে গিয়েছিলুম; কিন্তু তখুনি সম্বিৎ ফিরে আসতেই মনে হ'ল, এখানে দাঁড়ানো আর কর্তব্য নয়। চারিদিকে একবার চেয়ে দেখলুম, মুহূর্তকাল পূর্বে যেখানে বাজার ছিল তা এখন মরুভূমির মতন নির্জন। সমস্ত দোকানপাট বন্ধ। আমাদের কাপড়ওয়ালারও কোনও উদ্দেশ নেই। তার অনুসন্ধানে আর বৃথা কালবিলম্ব না ক'রে জিনিসগুলি সঙ্গমস্নানের পুণ্যে লাভ হয়েছে মনে ক'রে তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে স'রে পড়লুম।

স্টেশনের যাত্রীশালায় লাল কম্বল পেতে তারই ওপরে রাত্রি যাপন করা গেল। পরদিন সকালবেলা খসরুবাগ দেখলুম। আমি এর পরেও অনেকবার খসরুবাগে গিয়েছি, কিন্তু সেবারে সেখানে যে ফুলের বাহার দেখেছিলুম তা আর কখনও দেখি নি। সেখানকার সমস্ত জমিতে অসংখ্য রঙের মৌশুমী ফুল ফুটে বাগানটাকে একেবারে আলো ক'রে ছিল। এর পরে এলাহাবাদ গেলেই ফুলের লোভে লোভে খসরুবাগ দেখতে গিয়েছি, কিন্তু সে রকমটি আর দেখি নি। সেই ফুলের রঙ অল্পবয়সে আমার মনে এমন রঙ ধরিয়ে দিয়েছে যে, আজও ট্রেনে ক'রে কোথাও যেতে যদি পথে এলাহাবাদ

স্টেশন পড়ে তো ধাঁ ক'রে তার সঙ্গে সেই প্রথম পরিচয়ের কথা মনে প'ড়ে যায়।

যা হোক, সেদিনটা সারা দিনই খসরুবাগে কাটিয়ে দিলুম। কখনও বা বাগানে শুয়ে, কখনও বা খসরুর সমাধিতে। সমস্তক্ষণটাই যে ভয়ে ভয়ে কাটল, তা বলাই বাহুল্য। পরোক্ষে ডবল অপরাধী হয়ে আছি—প্রথম, গোরাকে ছুরি মারা দেখা—রাজার জাতকে মারতে দেখাও সে সময়ে অপরাধ ছিল কিনা। দ্বিতীয়ত, দোকানদার দাম না নিয়ে পালিয়েছে, সেও দেখতে পেলে হাঙ্গামা বাধাতে পারে। কিন্তু সঙ্গমস্নান ও অক্ষয়বটবৃক্ষ-দর্শনের পুণ্যে সে সব কিছুই হ'ল না। আমরা নিরাপদে রাত্রি দশটা নাগাদ একখানা দিল্লীযাত্রী ট্রেনে সওয়ার হলুম।

আমার জীবনদেবতা মাঝে মাঝে অসময়ে যবনিকাপাতের ঘণ্টা বাজিয়ে যে রসিকতা ক'রে থাকেন, তার ইঙ্গিত ইতিপূর্বে দিয়েছি। এবারেও কোথাও কিছু না, অতর্কিতে সেই ঘণ্টা বাজিয়ে তিনি একটু মজা ক'রে নিলেন। আমাদের কাছে আগ্রা ফোর্টের টিকিট ছিল। বেলা সাড়ে নটা কি দশটার সময় টুণ্ড্‌লা জংশনে গাড়ি পৌঁছবার কথা। সেখানে নেমে অন্য গাড়ি চ'ড়ে আগ্রায় যেতে হবে। কিন্তু আর একটু হ'লে তার অনেক আগেই আমাকে আগ্রার চাইতে অনেক দূরে যে পাড়ি জমাতে হ'ত, সেই ঘটনাটা মনের পর্দায় উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠছে।

রাত্রিবেলা এলাহাবাদ স্টেশনে যখন ট্রেনে চড়ি, তখন সে কামরায় ভিড় মোটেই ছিল না। বড় কামরা, দু-তিনজন লোক এখানে সেখানে প'ড়ে আছে দেখেছিলুম। আমি জানলার ধারে একটা লম্বা বেঞ্চিতে শুয়ে পড়েছিলুম। ভোর হয়ে যাবার কিছু পরে, ঘুম ভেঙে গেলেও শুয়ে শুয়ে আলস্য কাটাচ্ছি, হঠাৎ এক হাত লম্বা ও আধ হাত চওড়া একজোড়া শ্রীচরণ আমার বুকের ওপর এসে পড়ল। জোরে পা দুখানা বুক থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে ধড়মড় ক'রে উঠে বসলুম। দেখি,

একটা লোক খুব লম্বা ও চওড়া হাড়ে-মাসে গঠিত দেহ, দেখলেই মনে হয় খুব শক্তিশালী—সামনের বেঞ্চিতে ব'সে ট্যারা চোখে রাগান্বিত ভাবে আমার দিকে চেয়ে রয়েছে। কে এই ব্যক্তি! আমার প্রতি তার এই উষ্মার কারণই বা কি? এ সব ভাবতে বোধ হয় মিনিট খানেক সময় লেগেছিল। ইতিমধ্যে সুকান্ত অন্য জায়গা থেকে উঠে এসে তাকে বলতে লাগল, তুমি তো আচ্ছা লোক! মানুষ শুয়ে আছে তার বুকে পা তুলে দাও!

কামরার মধ্যে তখন অনেক লোক, তাদের মধ্যে অনেকেই সেই লোকটাকে যাচ্ছেতাই ক'রে গালাগালি দিতে লাগল। কিন্তু সে কারুর কথায় প্রতিবাদ করলে না, এমন কি কারুর দিকে ফিরে চাইলেও না, শুধু কটমট ক'রে সেই ট্যারা চোখে আমার দিকে চেয়ে রইল। কিছুক্ষণ সেইভাবেই কাটাবার পর সে আবার সেই ডোঙার মত পা দুখানা আমার বেঞ্চির ওপর তুলে দিলে, এবারেও তার একখানা পা আমার গায়ে বেশ ভাবে ঠেকে রইল। গাড়িসুদ্ধ লোক হাঁ ক'রে মজা দেখছে, কেউ কেউ রকম-বেরকমের মন্তব্যও করছে, এদিকে বেশ বোঝা যেতে লাগল লোকটা একখানা পা ক্রমেই আমার গায়ের সঙ্গে চেপে লাগিয়ে দিচ্ছে। আমি নিজেকে অত্যন্ত অপমানিত বোধ করতে লাগলুম। কিছুক্ষণ এই রকম সহ্য ক'রে আমার দুই পা সোজা একেবারে তার বুকের ওপর চড়িয়ে দিলুম। গাড়িসুদ্ধ নরনারী হো-হো ক'রে হেসে উঠল। আমাদের সামনেই স্টেশনের দিকে বেঞ্চে একটি লোক সারা বেঞ্চি জুড়ে বিছানা ক'রে শুয়ে ছিল। লোকটিকে বেশ ভদ্র ব'লেই মনে হ'ল। সে আমার ওই কাণ্ড দেখে উঠে বলতে লাগল, সাবাস বেটা সাবাস! তারপর অন্যান্য যাত্রীদের দিকে চেয়ে বললে, আমি তখন থেকে এই লোকটার বেহুদাপনা দেখছি। এত বড় বেহুদা যে, ঘুমন্ত লোকের বুকে পা তুলে দেয়! তারপর আমার দিকে চেয়ে বললে, ওটার মুখে মারো তিন লাথি।

নিজের প্রশংসা শুনে মনে মনে বেশ গর্বিত তো বোধ করলুমই, উপরন্তু লোকটার মুখে টেনে একটি লাথি ঝাড়ব কি না ভাবছি, এমন সময় সে অদ্ভুত

ক্ষিপ্রকারিতার সঙ্গে আমার পায়ের নড়া দুটো চেপে ধ'রে আর এক হাতের সাহায্যে খোলা জানলা দিয়ে আমাকে চলন্ত গাড়ি থেকে বাইরে ফেলে দেবার চেষ্টা করতে লাগল। কামরার সকলে চীৎকার করতে লাগল, আমার বন্ধুদ্বয় তাকে বাধা দেবার চেষ্টা করতে লাগল ; কিন্তু তাদের সাধ্য কি তাকে ঠেকায়! সে অবলীলাক্রমে আমাকে ঠেলে কোমর অবধি বাইরে বার ক'রে ফেললে। আমার দেহের কোমর অবধি আধখানা বাইরে ঝুলতে লাগল, মাথাটা নীচু দিকে আর আধখানা নিয়ে গাড়ির মধ্যে লড়াই চলতে লাগল। বোধ হয় আধ কি পৌনে এক মিনিট এই অবস্থায় ছিলুম। ঝুলতে ঝুলতে একবার মনে হয়েছিল, সঙ্গমস্নানের পুণ্যফল পেয়ে গেলুম বুঝি! যা হোক, কামরার মধ্যে আমাকে টেনে নেবার পর দেখলুম, আট-দশ জন লোক মিলে লোকটাকে নির্দম পিটছে ; কিন্তু সে নির্বিকার। হাত-পাও চালাচ্ছে না বা একটা টুঁ শব্দও করছে না। লোকেরাই পিটতে পিটতে ক্লান্ত হয়ে যে যার জায়গায় চ'লে গেল। বলা বাহুল্য, আমিও আগেকার জায়গা ছেড়ে অন্যত্র গিয়ে বসলুম এবং দুর্জনের সঙ্গে একত্রে যাত্রা করা আর উচিত নয় এই স্থির ক'রে কোন্ স্টেশনে নেমে পড়া যাবে তাই নিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে গভীরভাবে আলোচনা করতে লাগলুম। একটা স্টেশনে এসে গাড়ি থামতেই আমরা নামবার বন্দোবস্ত করছি, এমন সময় আমাদের একজন সহযাত্রী সেই লোকটাকে ডেকে বললে, তুমি এখান থেকে নেমে যাও, নইলে পুলিস ডেকে ধরিয়ে দেওয়া হবে।

বলামাত্র লোকটা টপ্ ক'রে গাড়ি থেকে নেমে গেল। সে চ'লে গেলে সকলে বলতে লাগল, লোকটা নিশ্চয়ই পাগল। তার হালচাল দেখেও তাই মনে হ'ল।

তিনি কখন যে কি ভাবে কি সেজে আসেন কিছু বলা যায় না।

টুণ্ডলায় নেমে ট্রেন বদলে আগ্রা ফোর্ট স্টেশনে যখন পৌছলুম, তখন বেলা প্রায় বারোটা। স্টেশনেই দলে দলে হোটেলের দালাল ঘুরছে, তাদের মধ্যে একজন আমাদের ধরলে। কাছেই হোটেল, সব রকম সুবিধা আছে সেখানে,

ছাতের ওপর চারিদিক-খোলা চমৎকার ঘর, তার ওপর যেখানে যে দ্রব্যটি মানায় তাই দিয়ে সাজানো। খাট, টেবিল, চেয়ার, মেঝেয় সতরঞ্চি পাতা—আর কি চাই? ভাড়া দৈনিক দু আনা, চার আনা, আট আনা,—খাবারের বন্দোবস্ত তোমাদের নিজেদের করতে হবে।

আমরা এই লোকটার হোটেলেই থাকব ঠিক ক'রে তার সঙ্গে স্টেশন থেকে বেরুনো মাত্র কয়েকজন লোক 'চুঙ্গী' 'চুঙ্গী' ক'রে হাঁক ছাড়তে ছাড়তে এসে জনার্দনকে পাকড়াও করলে। আমরা তো ভ্যাবাচ্যাকা মেরে গেলুম। চুঙ্গী কি রে বাবা! শেষকালে হোটেলের সেই দালাল আমাদের বুঝিয়ে দিলে যে, ব্যবসার জন্যে কোন মাল নিয়ে এলে এখানে অকৃট্রয় ট্যাক্স দিতে হয়। আমরা মনে করলুম, এলাহাবাদ থেকে যে নতুন ধুতি ও কম্বল এনেছি, তার জন্য বোধ হয় ট্যাক্স দিতে হবে। কিন্তু প্রশ্ন ক'রে জানা গেল, জনার্দনের হাতে যে ঘিয়ের বোতলটা আছে তার জন্য ট্যাক্স লাগবে। অগত্যা যাওয়া গেল অকৃট্রয় অফিসে।

স্টেশন থেকে বেরিয়েই কেল্লার সামনে যে জমি আছে, সেখানে চারটে বাঁশের খুঁটির ওপর শন না কি দিয়ে কোন রকমে একটু ছাউনি করা হয়েছে, এই হচ্ছে অকৃট্রয় অফিস। অফিসের চেহারার সঙ্গে মিলিয়ে অফিসারেরও তেমনি মেকদারের চেহারা। আমাদের সেই ঘিয়ের বোতলটা নেড়ে-চেড়ে বললে, নাঃ, এর আর ট্যাক্স লাগবে না।

অকৃট্রয় অফিস থেকে রেহাই পেয়ে হোটেলে এলুম। স্টেশনের কাছেই বাড়ি। একতলার ঘরগুলো অন্ধকার খুপ্‌রি গোছের, ভয়ানক ময়লা। একটা ক'রে দড়ির খাটিয়া আছে, ভাড়া দিন-প্রতি দু আনা। দোতলায় বড় ছাত—ছাতের চার কোণে চারখানি প্রশস্ত ঘর। চারদিক খোলা। ঘরের মেঝেতে একটা দরি পাতা। দেওয়ালের সঙ্গে একটি টেবিল ও তারই সামনে একখানি চেয়ার। আর এক পাশে একখানা নেয়ারের খাট প'ড়ে আছে, তাতে বিছানাপত্র কিছুই নেই। এই ঘরের ভাড়া দৈনিক চার আনা।

তেতলার ওপরে দুখানা ঘর, তার আসবাবপত্র ওই রকমই, তবে খাট ও চেয়ার দুখানা ক'রে আছে, ভাড়া দৈনিক আট আনা।

আমরা দোতলায় দৈনিক চার-আনাওয়ালা একখানা ঘর নিলুম। খাটের যে অবস্থা দেখা গেল তাতে কেউ শুতে পারবে না।—ঠিক হ'ল মেঝেতেই দরির ওপরে শোয়া যাবে। টেবিল-চেয়ারে হাত দেওয়া মাত্র তাঁরা ট'লে পড়লেন। কি অদ্ভুত উপায়ে যে সেগুলোকে খাড়া রাখা হয়েছিল তা হোটেলওয়ালারাই জানে, কারণ আমরা তিনজনে মিলে দিন আষ্টেক চেষ্টা ক'রেও তাদের খাড়া করতে পারলুম না।

ঠিক করা গেল, বাজার থেকে খাবার না কিনে তখনকার মত আলুভাতে ভাত চড়িয়ে দেওয়া যাক, তারপরে ও-বেলা দেখা যাবে 'খন।

সুকান্ত ও জনার্দন বাজার করতে চ'লে গেল, আমি ঘর আগলাবার জন্যে রইলুম। ওরা চ'লে যাবার পর আমি একটু এদিক-ওদিক দেখতে লাগলুম, একতলায় যাত্রী আসা-যাওয়ার ও দরদস্তুরের চীৎকার হচ্ছে; আমাদেরই দোতলায় কোণের দিকের ঘরের একজন যাত্রী ছাতে জল তুলিয়ে স্নান করছে, ভদ্রলোককে দেখে মনে হ'ল, বোম্বাই অঞ্চলে তাঁর বাড়ি। এই রকম এদিক-ওদিক দেখতে দেখতে হঠাৎ চোখ পড়ল আমাদের ঘরের একেবারে সামনের ঘরে, মাঝখানে লম্বা ছাত। সেই ঘরের জানলায় দাঁড়িয়ে একটি যুবতী আমায় দেখছে। যুবতীর বয়স পঁচিশ থেকে ত্রিশের মধ্যে, নিটোল স্বাস্থ্য, রঙ ফরসা, দেখতে বেশ সুন্দরী। জানলা দিয়ে তার কোমর অবধি দেখা যাচ্ছিল, আমার চোখে চোখ পড়বার পরও কয়েক সেকেণ্ড দাঁড়িয়ে থেকে সে জানলা থেকে স'রে গেল। একটু পরেই আবার চোখ পড়ল, যুবতী তাদের ঘরের দরজার পাল্লা দুটো খুলে দাঁড়িয়েছে। আমাদের ঘর থেকে এবারে তার সম্পূর্ণ চেহারা দেখা যেতে লাগল। বেশ লম্বা চেহারা, কাপড় পরবার ধরন দেখে হিন্দুস্থানী ব'লেই মনে হ'ল। এবার সে অনেকক্ষণ আমাদের ঘরের দিকে চেয়ে রইল। একবার চোখে চোখ পড়তেই সে যেন একটু হাসলে।

ভাবতে লাগলুম—কি রকম হ'ল! চেনাশোনা নয় তো! কিন্তু কে হতে পারে? ইত্যাদি প্রশ্ন নিয়ে মনের মধ্যে আলোচনা করছি, তখনও সে ঠায় সেই ভাবে দাঁড়িয়ে। ইতিমধ্যে বন্ধুরা বাজার থেকে ফিরতেই তাদের সাড়া পেয়ে দরজাটা ভেজিয়ে দিলে।

বন্ধুরা বাজার থেকে হাঁড়ি, উনুন, চাল, কাঠ, আলু, নুন ও আরও কি কি সব এনেছিল, তারা সে সব রেখে বললে, চল্, যমুনা থেকে আগে স্নান ক'রে আসি, তার পরে রান্না চড়ানো যাবে।

আমি তখন সেই অপরিচিতার নয়ন-ফাঁদে আবদ্ধ হয়ে ছট্‌ফট্ করছি, স্থান ত্যাগ করবার ক্ষমতা কোথায়? তাদের বললুম, তোরা যা, আমি রান্নার ব্যবস্থা করি, পরে এখানেই স্নান্ ক'রে নেব।

ওরা স্নান করতে চ'লে গেল। ছাতের একধারে একটু ছায়া পড়েছিল, সেইখানেই রান্না চড়িয়ে দিলুম। রান্না হতে লাগল, কিন্তু আমার চোখ রইল সেই খোলা জানলার দিকে। একটু যেতে না যেতে সুন্দরী আবার জানলার পশ্চাতে উদিত হলেন। এবার তার মুখে স্পষ্ট হাসি দেখতে পেলুম। আমি হাসতে সেও আর একটু হেসে স'রে গেল বটে, কিন্তু তখুনি আবার সেখানে এসে দাঁড়াল।

বন্ধুরা বাজার থেকে করকচ নুন এনেছিল, কিন্তু সে তো পাতে খাওয়া চলবে না। আমার মনে হ'ল, নুন গুঁড়ো করবার কিছু আছে কি না—এই ছুতোয় তার সঙ্গে কথা বলা যাক। যাঁহাতক মনে হওয়া অমনই নুনের মোড়কটা হাতে ক'রে জানলার কাছে গিয়ে তাকে ব'লে ফেললুম, দেখুন, এই নুন গুঁড়ো করবার কিছু—

এই অবধি শুনেই সুন্দরী ধাঁ ক'রে জানলা থেকে স'রে গেল। ব্যাপার দেখে আমার ভয় হ'ল, ভাবতে লাগলুম, স'রে পড়ব নাকি! ইতিমধ্যে সে দরজাটা খুলে একটা ছোট পেতলের হামানদিস্তে এগিয়ে দিয়ে বললে, কাজ হয়ে গেলে দিয়ে যেয়ো।

—নিশ্চয়, সে কথা আর বলতে !

অতি সুমধুর হাসিতে মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠল, কিন্তু সে আর কিছুই বললে না।

হামানদিস্তে নিয়ে নুন গুঁড়ো করতে করতে ভাবতে লাগলুম, আরও কিছু কথা বললুম না কেন! মনের মধ্যে নানা রকম প্ল্যান গজিয়ে উঠতে লাগল—এই কথা বলা যেতে পারত, এই ক'রে ভাব আরও বাড়ানো যেতে পারত। মাহেন্দ্র সুযোগ যদি বা এল, হেলায় হারালুম, ইত্যাদি।

নুন গুঁড়ো হয়ে গেল। ভাবতে লাগলুম, হামানদিস্তেটা ফেরত দেবার সময় হয়েছে কি না! একটু পরেই দেখলুম, সুন্দরী আবার এসে জানলায় দাঁড়িয়েছে। হামানদিস্তেটা ফেরত নিয়ে গিয়ে দরজার সামনে দাঁড়াতেই যুবতী দরজা খুলে হাত বাড়িয়ে সেটা নিয়ে নিলে। এবার সে হেসে উর্দুতে জিজ্ঞাসা করলে, রান্না হচ্ছে বুঝি ?

—হ্যাঁ, রান্না করছি। কই, আপনারা রান্না করছেন না ?

যুবতী আঁচলের খোঁট মুখে চাপা দিয়ে খানিকটা হেসে নিলে। তার পরে বললে, নাঃ, পরদেশে এসে ওসব হাঙ্গামা আর লাগাই নি। আমরা বাজার থেকে খাবার এনে খাচ্ছি, ঘরওয়ালা খাবার কিনতে গেছে।

আর কি কথা বলব ভাবছি, হঠাৎ যুবতী মুখ তুলে চেয়ে কার দিকে যেন চোখ পড়তেই ঘরের মধ্যে আড়ালে স'রে গেল। আমি পেছন ফিরে দেখলুম, বোম্বাইয়ের সেই লোকটি তার ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আমাদের চোখ দিয়ে গিলছে। আর সেখানে না দাঁড়িয়ে ফিরে এসে ভাতে কাঠি দিতে লাগলুম—যুবতীও দেখলুম দরজা-জানলা সব বন্ধ ক'রে দিলে।

একটু পরেই বন্ধুরা যমুনা-স্নান সেরে ফিরে এল। আমি হোটেলেই স্নান সেরে নিলুম। কাঁচা শালপাতায় ভাত ঢেলে জনার্দনের আনা সেই গব্যঘৃত ও আলুভাতে দিয়ে আকণ্ঠ ভোজন ক'রে মেঝের দরিতেই প'ড়ে রইলুম। ঠিক হ'ল, রোদ পড়লে তাজে যাওয়া হবে। দুপুরবেলা আমার যখন ঘুম ভাঙল

তখনও বন্ধুরা ওঠে নি, পাশ ফিরছে মাত্র। একবার দেখা পাওয়া যায় কি না দেখবার জন্যে ঘরের বাইরে উঁকি দেওয়া মাত্র দেখলুম, সুন্দরী জানলার ধার থেকে সট ক'রে স'রে গেল। পাশের দিকে চেয়ে দেখি, ওদিকের ঘরে সেই বোম্বাইয়ের লোকটি দাঁড়িয়ে—আমাকে দেখে সে ধীরে সুস্থে স'রে গেল।

ভিজে ধুতিগুলো ঘরের মধ্যে টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছিল, সেগুলো তুলে ভাঁজ করতে লাগলুম আর ওদিকে সুন্দরী আবার এসে জানলায় দাঁড়ায় কি না সেদিকেও নজর রাখলুম। কিন্তু সে আর তো এলই না, উলটে ভেতরে অদৃশ্য থেকে আমাদের দিকের জানলাটা বন্ধ ক'রে দিলে। আর বাড়িতে ব'সে সময় নষ্ট ক'রে কি হবে ভেবে বন্ধুদের ডেকে তুললুম। হোটেলওয়ালারাই একটা অদ্ভুতদর্শন তালা দিলে, সেই তালা দরজায় লাগিয়ে তাজ দেখতে যাওয়া হ'ল। বেশ মনে পড়ে, স্টেশনের কাছ থেকে তাজ অবধি একাওয়ালা ভাড়া নিয়েছিল মাত্র দু আনা। তাতেও সেদিন সে আমাদের ঠকিয়েছিল, কারণ পরে প্রত্যহই ছ পয়সা খরচ ক'রে সেখানে গিয়েছি এবং এসেছি পদব্রজে।

তাজমহল দেখলুম যখন, তখন তার আধখানায় ছায়া পড়েছে আর আধখানা রোদে ঝকমক করছে। তাজমহল অপূর্ব, অভাবনীয়। অভিধান ঘেঁটে অনেক বিশেষণ তার প্রতি প্রয়োগ করা যেতে পারে। কিন্তু আমি তা করব না। আমার দেশের রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, সত্যেন্দ্রনাথ ও আরও অনেক কবি তাজমহলের প্রশস্তি গেয়েছেন। তাঁরা ছাড়া দেশবিদেশের আরও অনেক কবি ও মনীষী তাজের রূপস্তুতি করেছেন—'সেথা আমি কি গাহিব গান'!

অতি শৈশব থেকে তাজমহলের কথা আমি বাবা-মার মুখে শুনেছি। ছোটদের পাঠ্যপুস্তকে তাজের কথা পড়েছি ও তার ছবি দেখেছি, বড় হয়েও ইতিহাসে পড়েছি তাজের কথা। তাজের জন্মের পিছনে পটভূমিস্বরূপ যে প্রেমের করুণ ইতিহাস তার সঙ্গে গাঁথা হয়ে আছে, তাও শুনেছি বহুবার বহু রকম। এই সব শুনে প'ড়ে ও দেখে আমার মনের মধ্যেও এতদিন ধ'রে আস্তে আস্তে তাজের একটা রূপ তৈরি হয়ে উঠেছিল। কেউ যদি জিজ্ঞাসা

করেন, কি রকম দেখতে সে রূপ, আমি তার স্পষ্ট জবাব দিতে পারব না। তার খানিকটা বাস্তব, খানিকটা কল্পনা, কতকটা আলো, বেশির ভাগই অন্ধকার। সত্যিকার তাজের সঙ্গে তার কিছু সাদৃশ্য আছে, কিছু নেই। প্রথমে তাজ দেখে মনে হয়েছিল, এর সঙ্গে তো আমার মনের সেই তাজের মিল নেই!—সত্যি বলতে কি, মনে আঘাতই পেয়েছিলুম, নিরাশই হয়েছিলুম। হয়তো আমারই মতন সম্রাট সাজাহান প্রথম যেদিন তাজ দেখেছিলেন সেদিন নিরাশই হয়েছিলেন। হয়তো তাঁর একবার মনে হয়েছিল, যে-প্রেমের স্বপ্নকে রূপ দেবার জন্য এত আয়াস স্বীকার করা হ'ল তা ব্যর্থই হয়েছে। তাঁর স্বপ্নও ঠিক রূপ ধরে নি—কে বলতে পারে! হায়! মানুষের মনের মধ্যে যে রূপ ফুটে ওঠে, অক্ষরের কিংবা প্রস্তরের ইমারত তৈরি ক'রে তাকে হুবহু ফুটিয়ে তোলা যায় না। সে অনির্বচনীয়, অসংবেদনীয়।

তবু তাজ কি সুন্দর নয়? নিশ্চয় সুন্দর। তাজের সৌন্দর্য কি রকমের, সেই কথাটা বলবার চেষ্টা করছি।

আগ্রা শহরে এই আমার প্রথম আগমন, পরে আরও অনেকবার আগ্রায় আসতে হয়েছে এবং এখানে থাকতে হয়েছে কখনও অল্পদিন, কখনও বেশিদিন; কখনও বেকার অবস্থায়, কখনও বা চাকরি নিয়ে; কখনও বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে, কখনও বা একা। কিন্তু তাজকে আমি ভুলি নি। যখন যে অবস্থায় এসেছি—তা সে দু ঘণ্টার জন্যেই হোক কিংবা ছ মাসের জন্যেই হোক, ছুটে গিয়েছি তাজমহলে—কখনও কখনও তাজ আমাকে নেশার মতন পেয়ে বসেছে। এমনও হয়েছে যে, গ্রীষ্মকালে দিনের পর দিন শহর থেকে আগ্রার সেই রোদ মাথায় ক'রে সেখানে গিয়েছি, একলা ঘুরে বেড়িয়েছি তার কত অনধ্যাসিত গোপন কন্দরে। তাজের প্রবেশ-তোরণের অন্ধকারময় অলিন্দে যে সব ঘুলঘুলি আছে, তারই ফোকর দিয়ে রোদে জলন্ত তাজের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে নিদ্রাভিভূত হয়ে তারই স্বপ্ন দেখেছি। পূর্ণিমা প্রতিপদ দ্বিতীয়া, ওদিকে দ্বাদশী ত্রয়োদশী অর্থাৎ চন্দ্রালোকেও দেখেছি তাকে। নীলাকাশ

তার পটভূমিকা হ'লেও স্তিমিত চন্দ্রালোকে তাজকে মনে হয়, যেন নীল সমুদ্রে শ্বেত শতদল ফুটে উঠেছে। চন্দ্রালোকিত রাত্রে চলন্ত মেঘের মাঝে তাজের আর এক রূপ ফুটে ওঠে। এই রকম দেখতে দেখতে হঠাৎ তার আসল রূপ দর্শকের চক্ষে প্রতিভাত হয়। আগেই বলেছি, প্রথম দর্শনে তাজমহলের আসল রূপ চোখে পড়ে না, সে ধীরে ধীরে আপনাকে প্রকাশ করে। তার কায়িক রূপের পেছনে লুকিয়ে আছে সেই রূপ—প্রথম দর্শনের দিনে আমার কাছে তা সংবৃতই ছিল। দুষ্কর কৃচ্ছ্রসাধনের পর আমি তার অবগুণ্ঠন মোচন ক'রে দেখেছি, সে রূপসী।

যাই হোক, রাত্রে তাজ খোলা থাকে কি না জিজ্ঞাসা করায় খাদিমরা বললে যে, সেই রাত্রে প্রথম দিকে চাঁদ উঠবে ব'লে রাত্রি দশটা অবধি তাজ খোলা থাকবে। শুনলুম যে, পূর্ণিমা-রাতে বারোটা অবধি তাজ খোলা থাকে।

রাত আটটা সাড়ে আটটা অবধি সেখানে কাটিয়ে হেঁটে শহরে ফেরা গেল। শহরে একটু ঘোরাফেরা ক'রে একটা ময়রার দোকানে ঢুকে বেশ ক'রে কচুরি, জিলিপি ও রাবড়ি আহার করা গেল। কলকাতার হিসাবে সে খাবার দামে সস্তা তো বটেই, খেতেও ভাল। রাবড়ির সের সে সময় কলকাতায় আট থেকে বারো আনা ছিল, সেখানে তার চেয়ে ঢের ভাল জিনিস পাওয়া গেল ছ আনায়।

আহারাদি শেষ ক'রে পরম পরিতৃপ্ত হয়ে হোটেলে ফিরে এসে নীচে যেখানে ম্যানেজার বসে সেখানে ঘড়িতে দেখা গেল, দশটা বেজে গিয়েছে। হোটেলওয়ালা আমাদের ডেকে বললে, আজকে রাতে আপনারা দয়া ক'রে কোথাও বেরুবেন না। সরকার থেকে লোক আসবে রেজিস্টারি করতে।

সরকার, রেজিস্টারি প্রভৃতি কথা শুনে তো ভড়কে গেলুম। সে আবার কি রে বাবা!

হোটেলওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করায় জানতে পারা গেল যে, সেখানে ও প্রত্যেক হোটেলেই যত যাত্রী আসে পুলিস তাদের নাম, ঠিকানা, কোথা

থেকে আসা হচ্ছে, কোথায় যাওয়া হবে ইত্যাদি লিখে নিয়ে যায়—এই নিয়ম আবহমান কাল থেকে চ'লে আসছে।

আর বেশি কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করলে যদি হোটেলওয়ালার মনে সন্দেহ জাগে, তাই মনের ভয় মনেই চেপে দোতলায় ওঠা গেল। সেখানে উঠে দেখি, ভীষণ ব্যাপার! অনেক লোকজনের জটলা লেগেছে আমাদের ঘরের সামনের ঘরে—যেখানে দ্বিপ্রহরে সেই রহস্যময়ী সুন্দরীকে দেখেছিলুম।

দেখলুম, দুজন গুণ্ডামতন লোক আমাদের ঘরের সামনে ছাতে ব'সে আছে, তাদের একজনের হাতে একটা পাকা বাঁশের বড় লাঠি। ঘরের মধ্যে খুব ধমকধামক চলছে দেখে উঁকি দিয়ে দেখি যে, একটা কম্বলের ওপরে দিনের বেলায় ওদিককার ঘরের বোম্বাইয়ের যে লোকটিকে উঁকিঝুঁকি দিতে দেখেছিলুম, সে ব'সে রয়েছে। তার মাথার চুল উস্কোখুস্কো, একটা খুব ষণ্ডা-গোছের লোক সেই লোকটার কোঁচা বেশ বাগিয়ে ধ'রে সামনে ব'সে আছে। আর একটা ষণ্ডা লোক ঘরের মধ্যেই দাঁড়িয়ে আছে। স্ত্রীলোকটিকে দেখলুম, কম্বলের এক কোণে সেই দেওয়াল ঘেঁষে ব'সে আছে—তার মুখের ঘোমটা একেবারে হাঁটু অবধি ঝুলে পড়েছে—লজ্জায় কি চক্ষুলজ্জায় তা বোঝা মুশকিল। যে লোকটা আমাদের স্টেশন থেকে হোটেলে নিয়ে এসেছিল, দেখলুম ঘরের মধ্যে সেও দাঁড়িয়ে রয়েছে। যে লোকটা বোম্বাইওয়ালার কোঁচা ধ'রে ছিল সে বিরাট একটা হুঙ্কার ছাড়লে। তার যতটুকু বুঝতে পারলুম তাতে মনে হ'ল, সে অন্য ব্যক্তি হত্যা ক'রে ফাঁসি যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করছে।

কৌতূহল বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আমরা তিন জনেই ভিড় ক'রে জানলার আরও কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম। ইতিমধ্যে হোটেলের দালালটার সঙ্গে চোখাচোখি হওয়ায় সে বেরিয়ে এসে আমাদের বললে, বাবু, তোমরা জানলার কাছে দাঁড়িও না, নিজের ঘরে চ'লে যাও। এ সব ঝামেলার মধ্যে কি শরীফ লোকদের থাকতে আছে?

আমরা তাকে আমাদের ঘরে ডেকে এনে জিজ্ঞাসা করলুম, কি হয়েছে বল তো ?

লোকটা চেষ্টা ক'রে খুব গভীর রকম গম্ভীর হয়ে বললে, কি আর বলব বল ! বুরা কামকা ইয়েহি নতিজা হোতা হ্যায়।

বললুম, বাপু, হেঁয়ালি ছাড় দিকিন। কোন্ বুরা কামের কি নতিজা হয় তা আমরা ভাল রকম জানি। এখন বল তো কি হয়েছে ?

লোকটা বললে, ওই ঘরে একজনেরা এসেছে কাল বিকেলে। আজ সকালবেলা সে তার স্ত্রীকে রেখে কি কাজে বেরিয়েছিল। রাত্রিবেলা ফিরে এসে দেখে যে, ওই ওদিককার ঘরের যাত্রী তার ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ ক'রে তার স্ত্রীর সঙ্গে প্রেম করছে। বাস্, আর কি ! সে তার লোকজন ডেকে এনে এখন ধরেছে তাকে। হয় ওই লোকটা কিছু টাকা দিয়ে ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলুক, আর না হয় জাহান্নামে যাক।

লোকটাকে জিজ্ঞাসা করলুম, আসামী এখন কি বলছে ?

—বলবে আবার কি ! টাকা ওকে দিতেই হবে, নইলে বিদেশে এসে কি জান দেবে ! যাকগে, খারাপ কাজের এই রকম ফলই হয়ে থাকে। কিন্তু তোমরা ও-সবের মধ্যে যেও না। ও-দিকে যাবার দরকারই বা কি ?

আমাদের ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার সময় সে নিজেই দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে গেল। সমস্ত ব্যাপারটাই যে যোগ-সাজসে হয়েছে সে কথা বলাই বাহুল্য। আমাদের বয়েস নেহাত কম, তার ওপর বাড়ি থেকে পলায়নের অপরাধ কাঁধের ওপরে রয়েছে, নইলে তখুনি পুলিসে খবর দিতুম। আমি সমস্ত দিন ধ'রে অনেকবার লক্ষ্য করেছি, ওই ঘরের স্ত্রীলোকটি বোম্বাইয়ের সেই লোকটিকে নানাভাবে প্রলুব্ধ করবার চেষ্টা করেছে। এমন হওয়াও অসম্ভব নয় যে, সন্ধ্যার সময় দোতলাটা নির্জন দেখে ওই স্ত্রীলোকটি সেই লোকটিকে ডেকে নিজের ঘরের মধ্যে ঢুকিয়েছে। তার লোকগুলো তক্কে তক্কে ফিরছিল, শিকার জালে পড়তেই তারা টপ ক'রে এসে ধরেছে।

একটা ময়লা চিমনি-ভাঙা কেরোসিনের লণ্ঠন মেঝের ওপরে জ্বলছিল, সেটাকে নিবিয়ে দিয়ে মেঝেতেই শুয়ে আমরা লোকটার অবস্থার কথা আলোচনা করতে লাগলুম। পরস্ত্রীর সঙ্গে প্রেম করার খেশারতস্বরূপ তাকে কত টাকা দিতে হবে তারই একটা আন্দাজ করবার চেষ্টা করছিলুম, এমন সময় জনার্দন বললে, বাবা, প্রেম করেছ কি খেশারত দিতে হয়েছে। দেখলে না, নিজের স্ত্রীর সঙ্গে প্রেম ক'রে সম্রাট শাজাহানকে ন কোটি সতেরো লক্ষ টাকা দিতে হয়েছিল, ও-লোকটা সে তুলনায় আর কতই বা দেবে? যাই দিক, সস্তাতেই সেরেছে বলতে হবে।

রাত্রি বারোটার সময় হোটেলের একজন লোক এসে আমাদের নীচে ডেকে নিয়ে গেল, পুলিসের লোক এসেছে ব'লে। তাদের খাতায় নাম ধাম প্রভৃতি লিখিয়ে ওপরে উঠে একবার উঁকি দিয়ে সেই ঘরখানা দেখলুম—ভোঁ-ভাঁ, কেউ কোথাও নেই। একটু এগিয়ে দেখলুম, ও-ঘরখানাও ফাঁকা—

ভবিষ্যতে আবার কোন্ নাটক সেখানে অভিনীত হবে কে জানে!

এইখানে আগ্রা সম্বন্ধে কিছু বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। শুধু আগ্রা নয়, দিল্লী সম্বন্ধেও বলি। আগ্রা শহরে তাজমহল, ইৎমদউদ্দৌল্লা, সেকেন্দ্রা, কেল্লা এবং আগ্রার কাছেই ফতেপুর-সিক্রি প্রভৃতি দ্রষ্টব্য ঐতিহাসিক স্থানগুলি আছে। দিল্লীতেও কুতবমিনার, হিন্দু, পাঠান ও মুগলযুগের কেল্লা, প্রাসাদ, বিখ্যাত ও কুখ্যাত অনেক বাদশার কবর প্রভৃতি দ্রষ্টব্য স্থান আছে। এই দুটি শহরের মাঝামাঝি জায়গায় হিন্দুদের অতি পবিত্র তীর্থ মথুরা ও বৃন্দাবন। এই সবের আকর্ষণে বছরের প্রায় সব সময়েই এই দুই শহরে যাত্রীর ভিড় হয় খুব বেশি। শুধু ভারতবর্ষেরই নানা জায়গা থেকে যে এখানে লোক আসে তা নয়, পৃথিবীর নানা দেশ থেকে যাত্রী আসে সেই সব দেখতে। এই যাত্রীদের দোহন এবং শোষণ ক'রে এখানে শত শত লোক জীবিকা উপার্জন ক'রে থাকে। একদল লোক আছে, যারা গাইডের কাজ করে। লাইসেন্সধারী গাইড, যারা ঐতিহাসিক স্থানগুলির ইতিহাস, কিম্বদন্তী প্রভৃতি বলে—এরা তারা নয়। এরা যাত্রীদের সঙ্গে গায়ে-প'ড়ে ভিড়ে যায়, তারপরে তাদের গাড়ি ভাড়া ক'রে দেওয়া থেকে আরম্ভ ক'রে জিনিস কেনা, সঙ্গে সঙ্গে ঘোরা ইত্যাদি সব তাতেই কমিশন মারে। এদের ফী কিছু নির্দিষ্ট নেই—চার আনা থেকে চার শো টাকা, যার কাছ থেকে যেমন আদায় করা যেতে পারে। আশ্চর্যের বিষয় যে, কার কতখানি দেবার শক্তি আছে তা লোক দেখলেই তারা ধরতে পারে—এতই বিচক্ষণ তারা। স্টেশনে ও স্টেশনের আশেপাশে এরা ঘোরে। যাত্রী নামলেই গায়ে প'ড়ে মুটে ঠিক ক'রে দেয়, গাড়ি ঠিক ক'রে দেয়, তারপর সঙ্গে সঙ্গে হোটেলে আসে। তাজে যাও আর ফতেপুর-সিক্রিতেই যাও, সঙ্গে আঠার মতন লেপটে থাকবে। কোনও জিনিস কেনবার উপায় নেই—ঠিক এসে উপস্থিত। তাড়ালে যায় না, গালাগালি দিলে জবাব দেয় না, শেষকালে যাত্রীরা তাকে মেনেই নেয়। সর্বত্র সে কমিশন তো মারেই, যাবার সময় যাত্রীরাও কিছু দিয়ে যায়। প্রায় অধিকাংশ যাত্রীরই এদের সম্বন্ধে কিছু না কিছু অভিজ্ঞতা আছে।

আগে যে হোটেলের কথা বলেছি, এই রকম অনেকগুলি হোটেল এই সব যাত্রীদের অবলম্বন ক'রেই তখন বেঁচে ছিল। তা ছাড়া আগ্রায় নরম পাথর ও শ্বেতপাথরের কাজ হয় খুব ভাল। সেখানকার শতরঞ্চিও বিখ্যাত—যাত্রীদের দৌলতেই এই সব শিল্প এখনও টিকে আছে।

আমি যে সময়ের কথা বলছি, তখন প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধও মানুষের কল্পনার অতীত ছিল। তারপরে অনেক কাল অতীত হয়েছে, ভারতবর্ষও স্বাধীন হয়েছে। আশা করি, সেখানকার অবস্থা এখন অনেক উন্নত হয়েছে।

তারপর, সেই সব হোটেলে মানুষকে ফাঁদে ফেলে বেশ মোটা রকমের কিছু আদায় করবার যে কত রকমের ব্যবস্থা ছিল তার আর ঠিকানা নেই। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য—মানুষের এই ষড় রিপুকেই নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির উপায়স্বরূপ কাজে লাগিয়ে কিছু উপার্জন ক'রে নেবার যে অসামান্য কৌশল তারা প্রয়োগ করত, তাতে আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়। হোটেলের মালিকদেরও তার মধ্যে নিশ্চয় যোগ-সাজস থাকত, তা ছাড়া ধর্মাধিকরণেরাও কি এ বিষয়ে কিছুই জানতেন না?

সে সময় এক শ্রেণীর লোক মাথায় শামলা চড়িয়ে একটা ছোট বাক্স নিয়ে রাস্তায় ও হোটেলে হোটেলে ঘুরে বেড়াত। এরা কান দেখতে অর্থাৎ কানের ভেতর থেকে খোল বার করতে ওস্তাদ। রাস্তা দিয়ে হয়তো কোনও নতুন লোক চলেছে—বলা বাহুল্য, নবাগত দেখলেই এরা চিনতে পারে—তাকে ডেকে কোনও কথা বলবার অবকাশ না দিয়ে একেবারে তার কানটা টেনে ধ'রে ভেতরটা দেখেই শিউরে ব'লে উঠবে—আরে বাস্ রে! কতদিন এ রকম হয়েছে?

স্বভাবত লোকের কৌতূহল জাগে। যার জাগে না, সে ব্যক্তি সে যাত্রা বেঁচে গেল। নবাগত হয়তো বললে, কেন, কি হয়েছে আমার কানে?

—কি হয়েছে! দেখবে তবে?

তখুনি সে তার বাক্স খুলে নরুনের মতন চ্যাপ্টামুখো একটা যন্ত্র বার ক'রে

তার কানের মধ্যে সেটি সেঁধিয়ে দিয়ে এমন একটি তাল খোল বের করবে, যা দেখলে যে-কোনও লোকের চক্ষু চড়কগাছে চড়বে। এর পর শুরু হবে দর-দস্তুর। দরের কিছু ঠিক নেই, দু আনা থেকে পাঁচ টাকা, যাত্রীর দেবার ক্ষমতা ও লেকচার দিয়ে তার নেবার ক্ষমতার ওপর নির্ভর করছে।

একবার আমরা পরীক্ষা করবার জন্যে একই দিনে পাঁচ-ছজনকে কান দেখিয়েছিলুম। সকলেই কানের ভেতর থেকে প্রতিবারেই ডেলা ডেলা খোল বের করেছিল। এমন তাদের হাতসাফাই, কি ক'রে যে খোল বার করে তা আমরা চেষ্টা ক'রেও ধরতে পারি নি।

আর একবারের কথা বলছি—আমাদের পরিতোষ বেচারীর কান ছিল খারাপ। সে বলত, কানের ভেতরে দিনরাত কি সব খট্‌খট্ ঝন্‌ঝন্ করে। একবার আগ্রার একজন নাপিতকে ধ'রে বললুম, এর কানের মধ্যে কি হয়েছে দেখ তো! দিনরাত খট্‌খট্ করে।

লোকটা অনেক কসরৎ ক'রে দেখে শুনে বললে, নল বসাতে হবে।

আমরা মনে করতুম, এদের সব রকমের জোচ্চুরিই ধ'রে ফেলেছি; কিন্তু কোথায়? এই নল বসাবার কথা ইতিপূর্বে আর শুনি নি। জিজ্ঞাসা করলুম, সেটা কি রকম?

সে বললে, কানের ভেতরে পোকা হয়েছে। নল বসিয়ে সেটাকে বার ক'রে ফেলে দিতে হবে।

কথাটা আমরা বিশ্বাস না করলেও পরিতোষ আগ্রহসহকারে নল বসাতে রাজী হ'ল। লোকটি বাক্স থেকে একটা সরু পেতলের নল তার কানে ঢুকিয়ে দিয়ে মুখ দিয়ে তাতে টান দিতে আরম্ভ করলে। তারপর মাথার পেছন দিকে বুড়ো আঙুল দিয়ে টিপে টিপে দেখে ঠিক কর্ণমূলের কাছে এক জায়গায় পোকাটা যেন ধরা পড়েছে এই রকম অভিনয় করতে লাগল। তারপর মাথা টেপার পালা শেষ ক'রে আবার নল মুখে দিয়ে টানতে আরম্ভ করলে। টেনে টেনে শেষকালে নলচে কান থেকে খুলে নিয়ে তার ভেতর থেকে ইয়া বড় একটা

পোকা বের করলে। লোকটার হাত-সাফাই দেখে আমরা খুশি হয়ে তাকে আট আনা বকশিশ দিয়ে ফেললুম।

হোটেলে কি রকম যাত্রীবধ ক'রে টাকা আদায় করা হ'ত, তার কিছু নমুনা আগে দিয়েছি। এ ছাড়া আরও কত রকমে যে যাত্রীবধ করা হ'ত, তা লিখতে গেলে শুধু সেই বিষয়েই একখানা বড় বই হয়ে যাবে। এই সব ছাড়া যাত্রীদের আশ্রয় ক'রে সেখানে যে আরও কত শিল্প গ'ড়ে উঠেছিল, তার আর ঠিক-ঠিকানা নেই। তার মধ্যেও অনেকগুলি পুরোপুরি জোচ্চুরি না হ'লেও আধা-জোচ্চুরি বলা যেতে পারে।

দিল্লীকে এ বিষয়ে আগ্রার দাদা বলা যেতে পারত। সৈয়দ বন্দর ও আলেকজান্দ্রিয়া শহরের এ বিষয়ে খুব সুনাম আছে। দিল্লী তাদের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে কি না বলতে পারি না, তবে ভারতবর্ষের অন্য কোন শহরই দিল্লীর সঙ্গে মুকাবিলা করতে পারত না। এই সম্পর্কে একটা গল্প চলতি আছে—অনেকে উপভোগ করবেন ব'লে এখানে উল্লেখ করছি।

বোম্বাই শহরের একজন নামজাদা পকেটমার সেখানে প্রতিযোগিতায় টিকতে না পেরে ব্যবসায়ে সুবিধা হবে ভেবে দিল্লীতে গিয়েছিল। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই তাকে আবার স্বস্থানে ফিরে আসতে দেখে সমব্যবসায়ীরা জিজ্ঞাসা করলে, কি হে, কি হ'ল ? ফিরে এলে যে ?

লোকটি বললে, সেখানে কিছু সুবিধা করতে পারলুম না। আমাদের মত এলেমের লোক সেখানে পথে ঝাড়ু দেয়। সেখানকার গাঁটকাটা, পকেটমার ও জোচ্চোরদের হাল-চালই আলাদা।

কথাটা শুনে বোম্বাইয়ের একজন বড় পকেটমারের অভিমানে আঘাত লাগল। সংবাদটির যাথার্থ্য পরীক্ষা করবার জন্যে সেইদিনই সে দিল্লী রওনা হ'ল। সেখানে পৌছে একদিন সন্ধ্যের সময় সে ট্যাঁকে একখানা এক শো টাকার নোট গুঁজে চাঁদনীচকের অলিগলি, চৌরিবাজারের অন্ধিসন্ধি জায়গায় ঘুরে বেড়াতে লাগল। গাঁটকাটাদের সুবিধা দেবার জন্যে কোনও জায়গায় সে আতর কিনলে,

কোথাও বা পান কিনে খেলে, কিন্তু সর্বদা সতর্ক হয়ে রইল গ্যাঁটটি না কাটা যায়। রাত্রি দশটা এগারোটা অবধি ঘুরে যখন দেখলে ট্যাঁকের নোট ট্যাঁকেই আছে তখন তার মনে হ'ল, এই তো দিল্লীর গ্যাঁটকাটাদের ক্ষমতা—দূর থেকে অতি নগণ্য জিনিসেরও প্রশংসা শুনতে পাওয়া যায়। যা হোক, বাড়ি ফেরবার মুখে সে একটা বড় পান-সরবতের দোকানে ব'সে সরবৎ খাচ্ছে এমন সময় পানওয়ালা তাকে জিজ্ঞাসা করলে, কি ভাই বোম্বাইয়ের খবর কি? সেখানে আজকাল ব্যবসাপত্র কেমন চলে? অমুক খলিফা কি এখনও বেঁচে আছেন, না, দেহরক্ষা করেছেন?

পানওয়ালার কথাবার্তা শুনে বোম্বাইয়ের লোকটি বেশ বুঝতে পারলে যে, সে তারই সমধর্মী। তখন বেশ খোলাখুলিভাবেই কথাবার্তা আরম্ভ হ'ল। কিছুক্ষণ আলাপ-পরিচয় ও উভয় পক্ষে আপ্যায়নের পর বোম্বাইয়ের লোকটি বললে, ভাই সাহেব, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—যদি কিছু মনে না কর।

দিল্লীওয়ালা বললে, সে কি! তুমি মেহমান—স্বচ্ছন্দে জিজ্ঞাসা কর।

বোম্বাইয়ের লোকটি বললে, বোম্বাইয়ে দিল্লীর খুব নামডাক শুনেছিলুম। তিন-চার ঘণ্টা ধ'রে এই রাস্তায় ঘুরছি, কিন্তু একটা চড়ুই পাখির ঠোকরও তো বুঝতে পারলুম না।

এবার দিল্লীওয়ালা বললে, ভাই সাহেব, কিছু না মনে কর তো বলি।

—হাঁ হাঁ, নিশ্চয় বলবে, ভয় কিসের?

দিল্লীওয়ালা বললে, ট্যাঁকে জাল একশো টাকার নোট নিয়ে ঘুরলে ঠোকর বুঝতে পারবে কি ক'রে?

বোম্বাইয়ের পকেটমার সেই রাত্রেই দিল্লীর ওস্তাদের কাছে শিষ্যত্ব গ্রহণ করলে।

দিল্লী শহর এখনও সেই রকমই আছে—এ কথা যেন কেউ না মনে করেন। এ সব আমরা স্বাধীনতা পাবার পূর্বের ইতিহাস। এখন দিল্লী আমাদের ভারতরাষ্ট্রের রাজধানী—সেখানকার চক ও চৌরিবাজার চৌরস হয়ে গেছে।

সেখানকার জোচ্চোরেরা কর্মক্ষেত্র পরিবর্তন ক'রে রাষ্ট্রের নানা বিভাগে ছড়িয়ে পড়েছে।

কিন্তু এই জোচ্চোরদের ব্যূহ ভেদ ক'রে একটু ঝাড়া হাত-পা হয়েই বুঝতে পারলুম, আগ্রা নেহাত খারাপ জায়গা নয়। প্রথমত, এখানে খুব সস্তায় জীবনযাত্রা নির্বাহ করা যায়। ইতিপূর্বে কাশীতে জিনিসপত্র খুবই সস্তা মনে হয়েছিল; কিন্তু দেখলুম, আগ্রায় সেখানকার চেয়েও সস্তায় জিনিস পাওয়া যায়। যদিও কাশী অথবা কলকাতার মতন এত রকমের তরি-তরকারি সেখানে পাওয়া যায় না, কিন্তু যা পাওয়া যায় তা জীবনধারণের পক্ষে যথেষ্ট এবং তা অত্যন্ত সস্তা। মোট কথা, মাসে দশ-বারো টাকায় একজন লোক বেশ ভদ্রভাবেই সেখানে বাস করতে পারে। তবে এই দশ-বারো টাকা উপায় করবার রাস্তা সেখানে খুবই কম—এমন কি, এক রকম নেই বললেই চলে। হয়তো একটা উপায় ভবিষ্যতে হবেই—এই আশায় আমরা স্থির করলুম, আগ্রাতেই থেকে যাব। আগ্রাতে আর একটা মস্ত সুবিধা ছিল এই যে, সে সময় সেখানে অল্পসংখ্যক বাঙালী বাস করতেন। আর কিছু না হোক, দেখা হ'লেই কোথায় বাড়ি, বয়স কত, কেন বাড়ি থেকে পালালে—ইত্যাদি জেরার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে।

হোটেলে দিন দশ-বারো কাটবার পর, সেখানে প্রত্যহ চার আনা ক'রে দেওয়ার চেয়ে একটা বাড়ি ভাড়া করাই ঠিক করা গেল। অনেক খুঁজে-পেতে একটা বাড়ি ঠিক হ'ল। বেশ খোলামেলা, একতলা দোতলায় সর্বসমেত চার-পাঁচখানা ঘর—মাসিক ভাড়া পাঁচ টাকা। সেখানে আবার শহরের মধ্যে খোলামেলা বাড়ি পাওয়া মুশকিল। সরু সরু গলির মধ্যে খোলা বাড়ি তৈরি করাই যায় না। যা হোক, এদিকে বাড়িওয়ালার সঙ্গে কথা চলতে লাগল, ওদিকে আমরা বিছানা বালিশ প্রভৃতি তৈরি করাতে লাগলুম।

সেদিন আগ্রায় ছিল জলের উৎসব। এ ধরনের উৎসব বাংলা দেশে তো নেই-ই, অন্য কোথাও আছে কি না জানি না। দলে দলে লোক নানা

রকমের ভেলা, বড় বড় ধোপার গামলা, কেউ বা মশককে কি ক'রে ফুলিয়ে তার ওপরে ঘোড়ার মতন চ'ড়ে যমুনার স্রোতে ভেসে যায়। কত লোক নানা রকমের অঙ্গভঙ্গী করতে করতে, কেউ বা সারেঙ্গী বাজাতে বাজাতে অদ্ভুত ভেলায় চ'ড়ে শন্ শন্ ক'রে ভেসে চলেছে—দেখতে দেখতে কোথা দিয়ে সময় কেটে যায়! এই খেলা দেখবার জন্যে যমুনার দুই তীরে অসংখ্য লোকের ভিড় লাগে। বেলা দুটো আড়াইটে থেকে আরম্ভ ক'রে সন্ধ্যে অবধি খেলা চলতে থাকে।

আমরা তাজমহলের চত্বরে দাঁড়িয়ে এই তামাসা দেখছিলুম। সেখানে আরও অনেক হিন্দু-মুসলমান মেয়ে-পুরুষ দাঁড়িয়ে সেই জলকেলি দেখছিল। কেউ হাসছে, কেউ হাততালি দিচ্ছে, কেউ কথা বলছে, আমরাও মাতৃভাষায় নানা রকম মন্তব্য করছি। হঠাৎ একটি লোক—এতক্ষণ সে আশপাশের লোকের সঙ্গে খুব কথা বলছিল, হাসি ঠাট্টা করছিল—বাংলা কথা শুনে হাঁ ক'রে আমাদের দিকে চাইতে লাগল। লোকটির পরনে চুস্ত্ পাজামা, অঙ্গে সুতির সেরওয়ানি, মাথায় গোল ফেল্টের টুপি অর্থাৎ হিন্দু টুপি—বয়স তার পঁচিশের মধ্যে হবে, তবে বেশ হৃষ্টপুষ্ট ব'লে দু-এক বছর বেশি দেখায়। সরু একজোড়া গোঁফ, বেশ পরিপাটি ক'রে ছাঁটা। ভদ্রলোকই আগে কথা বললেন, তোমরা বাঙালী?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনি?

—আমিও বাঙালী, ব্রাহ্মণ-সন্তান। আমার নাম পরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

বললুম, আপনাকে দেখে তো বাঙালী ব'লে মনে হয় না! তার ওপরে যা পোশাক পরেছেন—

ভদ্রলোক বললেন, বাড়িতে ও অন্য কোথাও যেতে হ'লে ধুতিই ব্যবহার করি, তবে আপিসের বেলায় এ দেশের পোশাকই পরতে হয়।

জিজ্ঞাসা করলুম, এখানে চাকরি করেন বুঝি?

—হ্যাঁ, এখানকার আদালতে কাজ করি। আসলে আমার চাকরি-স্থল

দিল্লী—এখানে একজন ছুটি নেওয়ায় আসতে হয়েছে। তবে ছুটি ফুরিয়ে গেলে আমিও দিল্লী ফিরে যাব।

আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার নামটি কি ভাই ?

নাম বললুম। একবারে বুঝতে পারলেন না, আবার বলতে হ'ল। ভদ্রলোক বললেন, বেড়ে নামটি তো তোমার !

বন্ধুরাও নাম বললে। ভদ্রলোক কোনো রকম ভণিতা না ক'রে একেবারে সোজা প্রশ্ন করলেন, বাড়ি থেকে কতদিন হ'ল পালিয়েছ ?

আমরাও সোজা উত্তর দিলুম, এই দিন পনেরো হবে।

যমুনার তীর থেকে স'রে এসে একটা নির্জন জায়গা দেখে গোল হয়ে ব'সে যাওয়া গেল। বিড়ি ও সিগারেট আদান-প্রদান হতে লাগল। ভদ্রলোক বললেন, তোমাদের চেয়েও আমি যখন ছোট ছিলুম, তখন একবার ভাই বাড়ি থেকে পালিয়েছিলুম।

সুকান্ত বললে, তা হ'লে আমরা তো একই গোত্রের লোক বলতে হবে।

পরেশনাথ হেসে বললেন, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। আর একই গোত্রের যখন, তখন আর আমাকে 'আপনি' ব'লো না।

বললুম, বেশ। আপনি আমাদের দাদা।

পরেশনাথ বললে, বেশ বেশ, খুব ভাল কথা। তার পরে ভাই শোন, পালিয়ে গিয়েছিলুম গয়া, গয়া থেকে রাজগীর। বাস্, ওই পর্যন্ত।

—আপনার বাড়ি কোথায় ?

—বাড়ি তো বাংলা দেশের চব্বিশ পরগনার কোন্ এক গ্রামে ছিল। কিন্তু আমার প্রপিতামহ ইংরেজ গবর্মেণ্টের কমিশারিয়েটে চাকরি নিয়ে দেশ ছেড়ে চ'লে এসেছিলেন। তারপরে আমরা আম্বালা, সাহারানপুর, মীরাট প্রভৃতি জায়গায় থেকেছি। শুনেছি, আম্বালায় আমাদের বাড়িঘরও ছিল। আমার ঠাকুরদাদা দিল্লীতে বাড়ি করেছিলেন।

জিজ্ঞাসা করলুম, তা হ'লে দিল্লীতেই বাড়ি ?

—হ্যাঁ, দিল্লীতে বাড়ি ছিল বলতে পার। সেখানেই জন্মেছি। লেখাপড়া কিছুই শিখি নি, তবু এনট্রেন্স্ ওইখান থেকেই পাস করেছি। দাদুর দরুন বাড়িখানা ছিল, তা বাবুজী অর্থাৎ বাবা বেচে মেরে দিলেন। তিনি সারাজীবন ব'সে ব'সে খেতেন, কোনও কাজকর্ম করতেন না, শেষকালে মরবার সময় বাড়িখানা বেচে দিয়ে আমাকে আর মাকে একেবারে পথে বসিয়ে গেলেন।

এই অবধি ব'লে পরেশদা মনের দুঃখ হো-হো ক'রে হেসে উড়িয়ে দিলে। তারপর একটান বেশ জমিয়ে বিড়ি টেনে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলতে লাগল, বাংলা দেশের একরকম কিছুই জানি না বললেই হয়। বাবা মারা যাবার পর মাকে নিয়ে একবার মামার বাড়ির গাঁয়ে গিয়েছিলুম, সে একেবারে অজ পাড়াগাঁ। মামারা কেউ নেই, এক মামী থাকেন সেখানে ছেলেপিলে নিয়ে। তা তিনি নিজেই খেতে পান না তো আমাদের খাওয়াবেন কি! দিন কতক সেখানে থেকে আবার দিল্লীতে ফিরে আসতে হ'ল।

একটু চুপ ক'রে থেকে পরেশদা বললে, তারপর, আমি তো নিজের কথাই ব'লে যাচ্ছি, এবার তোমাদের কথা শুনি। তোমরা এ রকম দল বেঁধে পালালে কেন? কি মতলব তোমাদের? দেশ দেখা?

বললুম, আমাদের উদ্দেশ্য কাজকর্ম জুটিয়ে নিজেদের উন্নতি করা। বাড়ি ভাল লাগে না, বাড়ির তাঁবেও থাকতে ইচ্ছা করে না, পড়াশুনো করতেও ভাল লাগে না।

আমার কথা শুনে পরেশদা উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠলেন। বললেন, বল কি ভায়া! বাড়ি ভাল লাগে না, পড়াশুনো করতে ভাল লাগে না তো জীবনে উন্নতি করবে কি ক'রে? বাড়ি ভাল লাগে না কেন?

এ প্রশ্নের আর কি উত্তর দেব—চেপে যাওয়াই সমীচীন বোধ করলুম। পরেশদা বলতে লাগল, আমি কিন্তু ভাই বাড়িকে বড্ড ভালবাসি। বাড়ি বলতে এক মা—মাকে ছেড়ে এই বুড়ো বয়সেও আমি কোথাও থাকতে পারি না।

বলতে বলতে কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে সে বললে, এবার বোধ হয় মাকে একেবারেই ছাড়তে হবে।

জিজ্ঞাসা করলুম, কেন দাদা?

—মার শরীর খুবই খারাপ হয়ে পড়েছে। আর কাজকর্ম করতে পারেন না বললেই হয়।

পরেশদার সঙ্গে আরও অনেক কথা হ'ল। কথায়-বার্তায় একবার বুক ঠুকে জিজ্ঞাসা ক'রে ফেলা গেল, আমাদের কোন চাকরি-বাকরি জুটিয়ে দিতে পার কি না?

বেশ খানিকক্ষণ ভেবে পরেশদা বললে, দেখ, আগ্রা তো আমার জানা-শোনা জায়গা নয়—তবে তোমরা যদি আমার সঙ্গে দিল্লী যাও তবে নিশ্চয়ই পারি। কিন্তু একসঙ্গেই তিন জনের পারব না—এক-একজন ক'রে। তা মাস ছয়েকের মধ্যে তিন জনেরই হিল্লে ক'রে দিতে পারি বোধ হয়।

পরেশদাকে বললুম, আমরা তোমার সঙ্গে দিল্লীই যাব।

পরেশদা বলতে লাগল, একটা কথা তোমাদের আগে থাকতেই জানিয়ে রাখা ভাল ব'লে মনে হচ্ছে। তোমাদের চাকরি জোটবার আগেই মা যদি মারা যান, তা হ'লে তোমাদের জন্যে কিছু করা বোধ হয় আমার দ্বারা সম্ভব হবে না। কারণ মা মারা যাবার পর আমাকেই হয়তো সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে চ'লে যেতে হবে।

পরেশদার কথাগুলো কিছু রহস্যময় শোনালেও ও-বিষয়ে আর কিছু জিজ্ঞাসা না ক'রে তখনকার মত চেপেই গেলুম। জিজ্ঞাসা করলুম, তিনি আর কতদিন আগ্রায় থাকবেন? পরেশদা বললে, ছ মাসের প্রায় সাড়ে চার মাস কেটে গেছে—এখনও বুঝতে পারছি না কিছু। শুনছি, সে লোকটা নাকি ছুটি বাড়াবার জন্যে লিখেছে। দেখা যাক, কয়েকদিনের মধ্যেই টের পেয়ে যাব। আমার মনে হচ্ছে, শীতটা পুরোই এখানে কাটাতে হবে।

সেইখানে ব'সেই ঠিক ক'রে ফেলা গেল যে, পরেশদা যে কদিন আগ্রাতে

থাকবে, আমরাও সে কদিন এখানে থেকে তার পরে তার সঙ্গে দিল্লী চ'লে যাব।

পরেশদা বললে, চল ভাই, এবার ফেরা যাক, সন্ধ্যে হয়ে এল।

উঠে পড়া গেল। অস্তমান সূর্যের প্রভায় রঞ্জিত পশ্চিম-দিগন্তের মতন আমাদের মানসাকাশেও বিচিত্র রঙের খেলা শুরু হয়ে গেল। পরম উৎসাহে হোটেলের দিকে এগিয়ে চললুম।

পরেশদা আমাদের সঙ্গে গল্প করতে করতে হোটেলে একেবারে আমাদের ঘরে এসে উপস্থিত হ'ল। আমরা দৈনিক চার আনা ক'রে ঘর ভাড়া দিচ্ছি শুনে সে বললে, বাবা, এরা তো একেবারে ডাকাত দেখছি!

সে হোটেলের একটা চাকরকে ডেকে বললে, তোমাদের ম্যানেজারকে একবার ডেকে দাও তো।

কিছুক্ষণ পরে হোটেলের একজন লোক আসতেই পরেশদা বললে, দেখ, বাবুরা কতদিন এখানে আছে তার একটা বিল তৈরি ক'রে নিয়ে এস—আমরা এখুনি চ'লে যাব।

বহুৎ আচ্ছা।—ব'লে লোকটি চ'লে যেতেই পরেশদা বললে, চল আমাদের বাড়ি। এখানে এই চোর জোচ্চোর ডাকাতদের মধ্যে থাকতে আছে! কখন কি ফ্যাসাদে পড়বে আর মারা যাবে।

ইতিমধ্যে হোটেলওয়ালা দশ দিনের ঘর ভাড়ার বিল নিয়ে এসে উপস্থিত হতেই পরেশদা ব্যাগ খুলে তাকে টাকা দিতে যাচ্ছিল, আমরা বাধা দিয়ে নিজেদের তবিল থেকে তাদের প্রাপ্য চুকিয়ে দিয়ে ধুতি কম্বল বালিশ প্রভৃতি নিয়ে পরেশদার বাড়ির দিকে রওনা হলুম।

শহরের ঘিনজি থেকে বেশ খানিকটা দূরে এক গলির মধ্যে একটা বড় বাড়ির এক অংশে পরেশদা মাকে নিয়ে বাস করেন। বাড়িখানার মালিকও পরেশদার সঙ্গে কাজ করে। তিনি বাড়ির এক অংশ পরেশদাকে অমনিই থাকতে দিয়েছিলেন; কিন্তু পরেশদা মাসে তিন টাকা ক'রে ভাড়া জোর ক'রে

দিয়ে থাকে। একতলায় একটা বড় ও একটা ছোট ঘর, বেশ বড় একটা উঠোন। দোতলায় এই উঠোনের চারদিকে ছাত ও ছাতের একদিকে পাশাপাশি দুটো বড় ঘর—দিব্যি খোলামেলা। রান্না একতলাতেই হয়।

আমরা যখন পৌছলুম, তখন সন্ধ্যে হয়ে গেয়েছে। কার্তিকের শেষাশেষি। শীত খুব জাঁকিয়ে না পড়লেও বাংলা দেশে অগ্রাণের মাঝামাঝি যেমন ঠাণ্ডা পড়ে তেমনি শীত। সদর-দরজা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল। পরেশদা অনেকক্ষণ ধ'রে ধাক্কাধাক্কি করার পর এক বুড়ী ঝি দরজা খুলে দিলে।

দরজা খুলে—সিধে চ'লে এস—ব'লে পরেশদা এগিয়ে চলল, তাকে অনুসরণ ক'রে আমরা চললুম। উঠোন পেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে আমরা ছাতে উঠলুম—ঘোর অন্ধকার। পরেশদা চেঁচিয়ে কি বলায় বুড়ীটা গজগজ করতে করতে সিঁড়ি দিয়ে উঠে এসে পাশের ঘর থেকে দুটো হ্যারিকেন লণ্ঠন নিয়ে এল। পরেশদা লণ্ঠন জ্বালাতে জ্বালাতে বললেন, যেদিন বাড়িতে এসে দেখি যে, আলো জ্বলে নি, সেই দিনই বুঝতে পারি মা বিছানা নিয়েছেন। বুড়ীর দিকে ইঙ্গিত ক'রে বললেন, ইনি আবার লণ্ঠন জ্বালাতে পারেন না—জংলি কোথাকার!

ইতিমধ্যে আলো জ্বালানো হয়ে গেলে একটা হ্যারিকেন নিয়ে বুড়ী চ'লে গেল, আর একটা হাতে নিয়ে পরেশদা ঘরের ভেজানো দরজা ধাক্কা দিয়ে আমাদের বললেন, এস।

আমরা ঘরের মধ্যে ঢুকতেই পরেশদা বললে, আজকের মতন ভাই এইখানেই জায়গা ক'রে শুতে হবে। কাল জিনিসপত্র সরিয়ে সব ব্যবস্থা করা যাবে।

আমরা বললুম, তোমাকে কিছু ব্যস্ত হতে হবে না, সব আমরা নিজেই ঠিক ক'রে নিচ্ছি।

পরেশদা তার আপিসের বেশ ছেড়ে ওই ঘরেই ধুতি জামা পরল। তারপর কোণ থেকে একটা ঝাঁটা নিয়ে ঘর পরিষ্কার করতে আরম্ভ ক'রে

দিলে। সুকান্ত তার হাত থেকে জোর ক'রে ঝাঁটা কেড়ে নিয়ে নিজে ঝাঁট দিতে শুরু করায় পরেশদা বললে, আচ্ছা, তা হ'লে আমি ও-ঘরে একবার মাকে দেখে আসি।

ঘর পরিষ্কার ক'রে কম্বল বিছিয়ে একটু বসতে না বসতেই পরেশদা ফিরে এসে বললে, মাকে দেখে বিশেষ সুবিধের ব'লে বোধ হচ্ছে না।

—কেন, কি রকম দেখলে?

—কি রকম আচ্ছন্নের মত প'ড়ে আছেন। ডাকলুম, কিন্তু কোন সাড়া দিলেন না—কখনো এ রকম তো দেখি নি। সকালবেলা রান্না করেছেন—যখন আপিসে যাই তখন খেতে দিয়েছেন।

—কতক্ষণ এ রকম হয়েছে?

—তা তো বুঝতে পারছি না।—ব'লে পরেশদা ঝিকে ডেকে জিজ্ঞাসা করায় সে বললে যে, সে এসে দরজা ধাক্কাধাক্কি ক'রে খোলা না পেয়ে বাড়িওয়ালাদের বাড়ির ভেতর দিয়ে এ বাড়িতে ঢুকেছে। সে এসে অবধি দেখছে যে, মাইজী অমনি ক'রে শুয়ে আছেন।

পাশের ঘরে গিয়ে দেখলুম, পরেশদার মা একটা খাটে শুয়ে আছেন—বুকের ওপর হাত দুটি জোড় ক'রে রাখা। কোমর অবধি একখানা দিশী কম্বলে ঢাকা রয়েছে। অতি শীর্ণ, দেখলেই বুঝতে পারা যায় যে, দীর্ঘ দিন রোগ ভোগ করছেন। ঘরের মেঝেতে লণ্ঠনটা রাখা ছিল, তাতে খাটের ওপরটা ভাল ক'রে দেখা যাচ্ছিল না। তবুও যা দেখলুম তাতে মনে হ'ল যে, রোগিণীর চেহারা খর্ব, চোখ বোজা থাকলেও তা কোটরগত—কেবল টিকলো নাকটা বিগত রূপের নিশানস্বরূপ তখনও খাড়া রয়েছে। হঠাৎ দেখলে মনে হয়, যেন দেহে প্রাণ নেই; কিন্তু কিছুক্ষণ লক্ষ্য ক'রে বোঝা গেল, খুব ধীরে ধীরে নিশ্বাস পড়ছে। পরেশদা একবার খুব আস্তে ডাক দিলে, মা!

কিন্তু কোনও সাড়া পাওয়া গেল না। পরেশদা লণ্ঠনের আলোটা খুব

কমিয়ে ঘরের এক কোণে রেখে ইশারা ক'রে আমাদের ঘরের বাইরে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললে, রান্নার ব্যবস্থা ক'রে ডাক্তার আনা যাবে। কি বল ?

সে ঝিকে ডেকে আটা ইত্যাদি বার ক'রে দিয়ে বললে, আটা মেখে ঘুঁটেগুলোতে আগুন ধরিয়ে দিয়ে তুমি চ'লে যেতে পার।

পরেশদাকে বললুম, তুমি মুখ-টুখ ধোও। মার কাছেই থাক, আমরা রান্না করছি—শুধু রুটি তৈরি করবার সময়ে তুমি এলেই চলবে।

আমরা ডাল ধুয়ে চড়িয়ে দিয়ে আলু ও কুমড়ো কুটতে আরম্ভ ক'রে দিলুম। কিছুক্ষণ বাদে পরেশদা হাত-মুখ ধুয়ে এসে বললে, এই ভাই আমার সংসার।

জিজ্ঞাসা করলুম, মা কি রকম ?

—সেই রকমই প'ড়ে আছেন।

বললুম, তুমি ডাক্তার ডেকে নিয়ে এস।

পরেশদা বললে, তাই যাই ভাই। আমি ফেরবার আগে যদি তোমাদের ডাল ও তরকারি রান্না হয়ে যায় তো উনুনে বড় দেখে খান দুই গোবর ফেলে রেখে দিও। আমি এসে রুটি তৈরি করব।

সেখানে একটা সুবিধা এই দেখলুম যে, উনুন ধরাবার হাঙ্গামা পোয়াতে হয় না। ভাল ভাল গোবর যে অবস্থায় রাস্তায় প'ড়ে থাকে সেই অবস্থাতেই শুকিয়ে তা ওজনদরে বিক্রি করা হয় এবং তাই জ্বালিয়ে রান্না চলে। কতকগুলো উনুনে ফেলে তাতে কেরোসিন তেল ঢেলে দেশলাই জ্বালিয়ে দিলেই উনুন ধরানো হয়ে গেল।

বেরিয়ে যাবার আগে কোথায় কি দ্রব্য থাকে তা আমাদের দেখিয়ে দিয়ে ঝিকে ডেকে পরেশদা বললে, তুমি আজ একটু দেরিতে যেয়ো। মার অসুখ, সেখানে গিয়ে একটু ব'স, আমি ডাক্তার আনতে যাচ্ছি—আমি ফিরে এলে তুমি যেয়ো।

ঝিটা বকবক্ করতে করতে ওপরে উঠে গেল। পরেশদা বেরিয়ে যেতে দরজা বন্ধ ক'রে দিয়ে এসে আমরা সমারোহে রাঁধতে আরম্ভ করলুম। গল্প

করতে করতে সময় কেটে যেতে লাগল। রান্না করতে তখনও আমরা কেউ জানি না, রাঁধতে দেখেছি মাত্র। কখনও কোনও রকমে ভাত ও খিচুড়ি এর আগে রেঁধেছি। একবার হাতা দিয়ে তুলে দেখা গেল, ডাল যেন সেদ্ধ হয়ে গেছে—এবার নাবিয়ে সম্বরা দিতে হয়। কাঁচা মুগের ডালে কি সম্বরা দেওয়া যায়! আমি বললুম, দুটো শুকনো লঙ্কা। জনার্দন ও সুকান্ত পূর্ববঙ্গের লোক, তাদের একজন বললে, সরষে ফোড়ন দাও। আর একজন বললে, না, না, কালোজিরে দাও।

কিন্তু পরেশদা ব'লে গেলেও সেই ক্ষীণ আলোতে কোথায় যে কি আছে তা খুঁজে গেলুম না। ঝিকে জিজ্ঞাসা করলে সে ব'লে দিতে পারবে মনে ক'রে ওপরে গিয়ে দেখি যে, মেঝের ওপরে ময়লা ওড়নাটা পেতে সেই সন্ধ্যারাতেই সে তোফা ঘুম লাগিয়েছে—অগত্যা নেমে আসতে হ'ল। অনেক খোঁজাখুঁজির পর হলুদ ও লঙ্কার গুঁড়ো আবিষ্কার করা গেল। একটা বাটিতে ঘিয়ের মতন একটু ছিল, তাই দিয়েই ডালের সম্বরা দেওয়া হ'ল—নুন খুঁজে পাওয়া গেল না, কাজেই দেওয়াও হ'ল না।

ডাল নামিয়ে আলু ও কুমড়ো সেদ্ধ করতে চড়িয়ে দেওয়া গেল। সুকান্ত ও জনার্দন বাজারে ঘি ও নুন আনতে বেরিয়ে গেল। উনুনটা নিবে এসেছিল ব'লে কয়েক খণ্ড শুকনো গোবর দিয়ে নীচু হয়ে জোরে ফুঁ দিতে লাগলুম, ঘর ধোঁয়ায় অন্ধকার হয়ে উঠল। একবার এমনি ক'রে ফুঁ দিয়ে মুখ তুলেছি এমন সময় দরজার সামনে দেখলুম, এক নারীমূর্তি দাঁড়িয়ে। সে এক অদ্ভুত মূর্তি, ঠিক যেন একখানা সম্পূর্ণ নরকঙ্কাল একটা ছেঁড়া ময়লা কাপড় জড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চোখ দুটো কোটরগত হ'লেও অপরূপ ঔজ্জ্বল্যে জলজল করছে। ওদিকে উঠোনের মধ্যে কৃষ্ণপক্ষ রাত্রির অন্ধকার ও শীতের ধোঁয়ায় এক ভয়াবহ পটভূমির সৃষ্টি করেছে, আর সামনে সেই কঙ্কাল। ঘরের মধ্যেকার উনুনের আগুন জলছে আর নিবছে, আর তাই সেই জলজলে চোখে প্রতিবিম্বিত হচ্ছে। সে এক ভয়াবহ দৃশ্য! সে মূর্তি দেখে ভয়ে সেই শীতকালেও আমার ঘাম

ছুটতে আরম্ভ ক'রে দিলে। কিন্তু একটু পরেই কে যেন আমার মধ্যে ব'লে উঠল—ইনি পরেশদার মা। তখুনি নিজেকে সামলে নিয়ে উঠে গিয়ে তাঁকে একটা প্রণাম ক'রে বললুম, মা, আপনি উঠে এলেন কেন? আমরা তো নিজেরাই সব ক'রে নিচ্ছিলুম।

মা হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, তোমাকে তো—চিনতে পারছি না—তুমি কে বাবা?

সব বললুম। আমার কথা শুনে তিনি মাতৃহৃদয়ের সমস্ত মধু ঢেলে বললেন, আ ম'রে যাই—ম'রে যাই বাছা আমার! তা আমাকে ডাকতে হয়! কোথায়—পরু গেল কোথায়? অ পরু!

বললুম, পরেশদা ডাক্তারের বাড়ি গিয়েছেন।

—ওমা, কেন? তার শরীর ভাল আছে তো?

—তিনি ভালই আছেন। আপনি সন্ধ্যেবেলা অমন নিঝুম হয়ে পড়েছিলেন, আপনাকে ডেকে সাড়া না পেয়ে তিনি ভয় পেয়ে ডাক্তার আনতে গিয়েছেন।

মা বললেন, জোরে ডাকলেই হ'ত। আমার কি মরণ আছে বাবা—আহা, তোমাদের কত কষ্টই হ'ল!

পরেশদার মা উনুন থেকে কড়া নামিয়ে রীতিমত রান্না শুরু ক'রে দিলেন। ইতিমধ্যে সুকান্ত ও জনার্দন বাজার থেকে ফিরে এলে তাদের পরিচয় জানলেন। তরকারি নামিয়ে রুটি করছেন, এমন সময় পরেশদা ডাক্তার নিয়ে এসে হাজির হ'ল।

ডাক্তার এসে দেখলেন যে, তাঁর মুমূর্ষু রুগী রুটি সেঁকছে। ঘরে অভ্যাগত এসেছে—মরবার সময় তাঁর নেই।

পরেশদা হাঁকডাক ক'রে মাকে ওপরে নিয়ে গেল। ডাক্তার অনেকক্ষণ ধ'রে রোগিণীকে পরীক্ষা ক'রে প্রেসক্রপশন লিখে দিয়ে যাবার সময় আমাদের সবাইকে ব'লে গেলেন যে, রুগীর অবস্থা ভাল নয়। দিনরাত একেবারে

বিছানায় শুয়ে থাকতে হবে। ফল দুধ ইত্যাদি পথ্য। কিন্তু পথ্য যাই হোক—বিশ্রামের দরকার। আপনাদের ভরসা দিতে আমি পারছি না, তবে এ রকম অবস্থা থেকেও সুস্থ হয়ে উঠতে আমি দেখেছি—চিকিৎসা আরও অনেক আগে আরম্ভ হওয়া উচিত ছিল। রুগীর মানসিক শক্তি অসামান্য, কারণ তাঁর শরীরের যে অবস্থা তাতে উঠে হেঁটে কাজ করা একরকম অসম্ভব।

ডাক্তারের সঙ্গে পরেশদাও বেরিয়ে গেল ওষুধ আনতে। সেখানে আবার ন'টা সাড়ে নটার মধ্যে সব ডাক্তারখানা বন্ধ হয়ে যায়, শীতের দিনে তো কথাই নেই। পরেশদা যাবার সময় মাকে শুইয়ে রেখে গেল। আমরা তিনজনে রান্নাঘরে ব'সে রুটিগুলো সেঁকব কি না ভাবছি এমন সময় দেখি, মা নেমে এসেছেন।

—এ কি, আপনি নামলেন কেন ?

—আর খান কয়েক রুটি আছে সেঁকে দিয়ে যাই।

—কিন্তু ডাক্তারে যে আপনাকে শুয়ে থাকতে ব'লে গেলেন !

—বলুকগে ডাক্তার।—তিনি আর কিছু বলতে পারলেন না। বেশ বোঝা গেল, অশ্রুতে তাঁর কণ্ঠ রোধ হয়ে এল। রুটি উনুনে ফেলে সেঁকবার সময় মুখখানা আগুনের কাছে নিয়ে যাচ্ছিলেন—সেই আগুনের আভায় আমি স্পষ্ট দেখলুম, তাঁর দুই চোখ দিয়ে দুটি ধারা শুকনো গাল বেয়ে নামছে—ভাবতে লাগলুম, এ অশ্রুর উৎস কোথায় ?

খানকয়েক মাত্র আর রুটি ছিল, সেগুলো সেঁকে দিয়ে হাত মুখ ধুয়ে মা ওপরে চ'লে গেলেন, আমরা উনুনের ধারে ব'সে হাত পা সেঁকতে লাগলুম। ঘণ্টাখানেক পরে পরেশদা ওষুধ নিয়ে ফিরে এল। মাকে ওষুধ খাইয়ে সেই শীতে স্নান ক'রে পরেশদা আমাদের সঙ্গে এসে খেতে বসল। ওপরে যখন উঠলুম তখন এগারোটা বেজে গেছে—আগ্রা নগরী সুষুপ্তির কোলে ঢ'লে পড়েছে।

পরেশদার মা সেই যে গিয়ে বিছানায় শুলেন আর তাঁকে উঠতে হ'ল না। ডাক্তারে ঠিকই বলেছিল। অসামান্য মানসিক শক্তিবলেই তিনি এতদিন উঠে হেঁটে কাজ করছিলেন—সে দিন শেষ শক্তিটুকু ব্যয় ক'রে আমাদের জন্যে রান্না ক'রে দিয়ে শয্যাগ্রহণ করলেন।

পরের দিন সকালবেলা আমরা রান্না করলুম। রান্না এমন কিছুই না ভাত, ডাল ও একটা আলু কিংবা কুমড়োর ঘ্যাঁট। সে কাজ করতে আমাদের ভালই লাগছিল, কিন্তু পরেশদা শুনলে না। সে এক ব্রাহ্মণের মেয়েকে যোগাড় ক'রে নিয়ে এল, সে এসে দু বেলা রেঁধে দিয়ে যেতে লাগল। আমরা নিজেদের টাকা দিয়ে চাল ডাল ও জিনিসপত্র কিনে আনতে লাগলুম। পরেশদা সামান্যই মাইনে পেত—অবিশ্যি তাতে তার সংসার সচ্ছল ভাবেই চ'লে যেতে পারত—আমরা আসা সত্ত্বেও। কিন্তু মার অসুখে একদিন অন্তর ডাক্তার ডাকা ও তা ছাড়া ওষুধপত্তর এবং অন্যান্য খরচের ঠেলায় সে বেচারী বিব্রত হয়ে পড়ল। পরেশদার আপিসেরও দু-একটি বন্ধু এই সময়ে দেখাশুনো ও খোঁজখবর করতেন।

এক ভদ্রলোক, তাঁর ওই দেশেই বাড়ি, তিনি প্রায় প্রত্যহ সন্ধ্যেবেলায় আসতেন এবং আমাদের বলতেন যে, পরেশ হয়তো চক্ষুলজ্জার খাতিরে কিছু বলতে পারে না, কিন্তু তোমরা তার ছোট ভাই, তোমাদের বলা রইল যখন যা প্রয়োজন হবে—অর্থ, লোকজন, সেবার জন্য নারী—যদি কিছু সাহায্যের প্রয়োজন হয় তো নিঃসঙ্কোচে আমায় বলবে।

অনেক চেষ্টা ক'রেও আজ লোকটির নাম মনে করতে পারছি না, হয়তো এমন সময় মনে পড়বে তখন আর কোন কাজে লাগবে না—স্মৃতি চিরদিন আমার সঙ্গে এমনি লুকোচুরি খেললে।

পরেশদা প্রতিদিন সকালে মার সমস্ত কাজ ক'রে বেলা দশটার পর আপিসে বেরিয়ে যেত। খাওয়াদাওয়া শেষ ক'রে আমরা এক-একজন পালা

ক'রে তাঁর কাছে গিয়ে বসতুম। সন্ধ্যের সময়ে পরেশদা আপিস থেকে ফিরে সমস্ত দিনের সংবাদ নিয়ে ডাক্তারের কাছে ছুটত—কারণ ডাক্তার ব'লে দিয়েছিলেন, প্রতিদিনের সংবাদ যেন তাঁকে দেওয়া হয়। সেখান থেকে ফিরে হাত মুখ ধুয়ে তিনি মাতৃসেবায় লেগে যেতেন আবার পরদিন ভোরবেলা অবধি।

প্রায় প্রতিদিনই সন্ধ্যেবেলাটায় আমি রোগিণীর কাছে ব'সে তাঁর সঙ্গে গল্পসল্প করতুম। বাইরে থেকে বুঝতে না পারা গেলেও ডাক্তার বলতেন যে, রোগিণীর অবস্থা উত্তরোত্তর মন্দের দিকেই চলেছে—কোনও ওষুধই ধরছে না। রোগিণী অধিকাংশ সময়েই সেই আচ্ছন্নের মত প'ড়ে থাকলেও হঠাৎ মাঝে মাঝে বেশ সজীব হয়ে উঠতেন—তখন মনেই হ'ত না যে, ওই রকম একটা সাংঘাতিক রোগে তিনি ভুগছেন। যতটুকু সময় ভাল থাকতেন, শুধু কথা বলতেন একেবারে বিরাম-বিহীনভাবে। আমাদের উপদেশ দিতেন বাড়ি ফিরে যেতে। বলতেন, এ সংসার বড় খারাপ জায়গা, কোথায় কি বিপদ লুকিয়ে জাল পেতে ব'সে আছে, টপ ক'রে সেই ফাঁদে প'ড়ে যাবি আর সামলাতে পারবি না। কখনও বলতেন, আমি জীবনে কোনও কামনাই পোষণ করি নি, শুধু একটি মাত্র সাধ ছিল যে মরবার আগে পরুর বিয়ে দিয়ে তাকে সংসারে স্থিতি ক'রে যাব; কিন্তু সে-ও এই তোদেরই মত মার আশ্রয় ছেড়ে পালিয়ে গিয়ে এমন ফাঁদে প'ড়ে গেল যে, তা থেকে আর পালাবার পথ রইল না—সবই আমার বরাত। তা না হ'লে পরুর মত ছেলে মাকে ছেড়ে পালাবে কেন? বালক সে বুঝতে পারে নি যে, মার কোলের চাইতে নিরাপদ আশ্রয় আর নেই।

বললুম, কিন্তু পরেশদা তো মার দুঃখ ঘোচাবে ব'লেই বাড়ি থেকে চ'লে গিয়েছিল।

আমার কথার আর কোনও উত্তর না দিয়ে তিনি চুপ ক'রে রইলেন। অনেকক্ষণ কেটে যাবার পর তিনি আপন মনে বলতে লাগলেন, আমার আবার দুঃখ কি বাবা! আমি সুখেই আছি—তোমরা সুখে থাকলেই আমার সুখ।

সেদিন মার কথায় মনে হ'ল, পরেশদার জীবনের সঙ্গে নিশ্চয় কোনও রহস্য জড়িয়ে আছে, যার জন্যে বিয়ে করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। প্রেমঘটিত কোনও ব্যাপার মনে ক'রে সে সম্বন্ধে পরেশদাকেও আর কোনও কথা জিজ্ঞাসা করি নি।

আর একদিন সন্ধ্যেবেলা মার ঘরে তাঁর চৌকির সামনেই পরেশদার চৌকিতে ব'সে আছি, সুকান্ত ও জনার্দন দুজনেই পরেশদার সঙ্গে সেই ক্যাণ্টন্‌মেণ্টে ডাক্তারের বাড়ি গিয়েছে। নীচের তলায় মধ্যে মধ্যে রাঁধুনী ও ঝিয়ের গলার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। মার দিকে চেয়ে আছি—খুবই ধীরে ধীরে তাঁর নিশ্বাস পড়ছে। সাধারণত এই সময়টা তাঁর আচ্ছন্ন ভাব কিছুক্ষণের জন্যে কেটে যায়, কিন্তু সেদিন তখনও কাটে নি। তাঁর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছি, হঠাৎ দেখলুম তিনি চোখ খুলে মাথা ঘুরিয়ে একবার আমার দিকে চাইলেন। কিন্তু আমাকে কোনও কথা না ব'লে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে সামনের দিকে কি দেখতে লাগলেন। কিছুক্ষণ এইভাবে দেখতে দেখতে অতি ক্ষীণস্বরে যেন কি বললেন।

আমি চৌকিতে ব'সে ব'সেই জিজ্ঞাসা করলুম, মা, কিছু বলছেন?

দেখলুম, আবার তিনি চোখ বুজে ফেললেন। কিছুক্ষণ সেইভাবে কেটে যাবার পর আবার চোখ চেয়ে কি যেন বললেন। এবার আমি চৌকি থেকে নেমে তাঁর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, কি বলছেন মা?

অতি ক্ষীণস্বরে তিনি বললেন, ঘরে যিনি এসেছেন তিনি কে?

আমি চারিদিক চেয়ে দেখলুম, কেউ কোথাও নেই। বললুম, কই, কেউ তো আসে নি মা।

মা বললেন, দেখতে পাচ্ছিস না, এই যে সামনে—মাথায় জটওয়ালা এক সন্ন্যাসী—ওই যে একেবারে তোর পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন!

আমার সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে উঠতে লাগল—এমন কি পাশের দিকে চাইতেও সাহস হচ্ছিল না। শেষকালে জোর ক'রে মন থেকে ভয় ঝেড়ে

ফেলে পাশের দিকে চেয়ে দেখলুম, কেউ কোথাও নেই। মা কিন্তু দুই হাত যুক্ত ক'রে কাকে বার বার নমস্কার করতে লাগলেন।

কিছুক্ষণ কেটে যাবার পর আমি জিজ্ঞাসা করলুম, বাতিটা কি একটু বাড়িয়ে দেব মা?

মা বললেন, না, ঠিক আছে।

আবার জিজ্ঞাসা করলুম, মা, সন্ন্যেসীকে কি এখনও দেখতে পাচ্ছেন?

মা বললেন, না, তিনি চ'লে গেছেন। কালও অনেক রাত্রে একবার তাঁকে দেখেছিলুম। একেবারে আমার বিছানা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিলেন। আমি নমস্কার করতেই তিনি হেসে চ'লে গেলেন।

সেদিন রাত্রে খেতে খেতে মার কথা ওঠায় পরেশদাকে এই সন্ন্যাসীর কথা বললুম। পরেশদা কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বললে, লক্ষণ ভাল নয়। মা শীগগিরই চ'লে যাবেন—এ সব হচ্ছে তারই ইঙ্গিত।

আজকের এই বিষণ্ণ শীত-সন্ধ্যায় অতীতের সেই সন্ধ্যাটির কথা ভাবতে ভাবতে আর একটি সন্ধ্যার চিত্র আমার স্মৃতিপটে স্পষ্ট হয়ে উঠছে—এই দিনটির ঠিক দশ বছর পরে শ্রাবণের এক মেঘভরা সন্ধ্যায় তেমনি এক অন্ধকার ঘরে এক রুগীর পাশে ব'সে ছিলুম—রুগী আর কেউ নয়, আমারই ছোট ভাই অস্থির। কয়েকদিন থেকে তার জ্বর চলেছে, কিছুতেই ছাড়ে না। আমার সামনেই মেঝেতে উঁচু গদির ওপরে সে শুয়ে রয়েছে—চোখে আলো লাগে ব'লে ঘরের বাতি নিবিয়ে দিয়ে বারান্দার বাতি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। দুই ভাইয়ে গল্প হচ্ছে—অস্থির বলছিল, ওই টোব্যাকো মিক্‌চারগুলো আর পাকাতে ভাল লাগে না। টিনটা তুই নিয়ে যা, কাল সকালে আমার জন্যে এক টিন ভাল তৈরী সিগারেট এনে দিস।

এমনিধারা হালকাভাবে এ-কথা সে-কথা চলেছে, এমন সময় কথার মাঝখানে অস্থির ব'লে উঠল, দেখ্ স্থবরে, এই বুড়োটাকে চিনিস?

—কে রে! কে বুড়ো?

—ওই যে আলমারির পাশে ব'সে রয়েছে।

অস্থিরের শয্যার পাশে প্রায় পায়ের কাছে একটা আলমারি ছিল, আমি সেটার আশেপাশে বেশ ক'রে দেখলুম, কিন্তু কিছুই দেখতে পেলুম না। অস্থির বললে, আজ দু দিন ধ'রে লোকটা দিনরাত ওইখানে ব'সে আছে ভাই। আমি এত চেষ্টা করছি, কিন্তু কিছুতেই চিনতে পারছি না—তুই চিনতে পারলি ?

বললুম, কই ভাই, আমি তো কারুকে দেখতেই পাচ্ছি নে।

—দেখতেই পাচ্ছিস নে—কি আশ্চর্য !

পরের দিনই অপ্রত্যাশিতভাবে অস্থিরের অসুখ সঙ্গিন অবস্থায় দাঁড়াল—ঠিক দু দিন পরে সে চ'লে গেল।

এরা সত্যিই কি সে সময় কারুকে দেখতে পেয়েছিল, না, সবই রোগার্ত মস্তিষ্কের বিকৃত কল্পনা-মাত্র ! কে এ প্রশ্নের জবাব দেবে ?

পরের দিন ডাক্তার এসে বেশ ক'রে পরীক্ষা ক'রে ব'লে গেলেন, রোগিণীর বুকের দু দিকেই সর্দি জমেছে বটে ; কিন্তু দু-একদিনের মধ্যে কিছু হবে ব'লে মনে হয় না। এই ভাবে রোগ বৃদ্ধি পেতে থাকলে সাত-আট দিন পরে মারা যাবার সম্ভাবনা।

পরদিন থেকে মার সেই আচ্ছন্ন ভাবটা খুবই বেড়ে গেল। দিনে রাতে প্রায় সমস্তক্ষণই সেইভাবে প'ড়ে থাকতেন। যতক্ষণ পরেশদা বাড়ি না থাকতেন, ততক্ষণ আমরা তিন জনেই পালা ক'রে তাঁর কাছে থাকতুম। সুকান্ত ও জনার্দন বিকেলে বেড়াতে যেত ব'লে সেই থেকে রাত্রি অবধি আমাকেই রোগিণীর কাছে থাকতে হ'ত।

আজ অতীতের সেই সব ছবি ধীরে ধীরে মানসপটে ফুটে উঠছে। সেই শীতের সন্ধ্যাগুলি, সেই ছোট ঘরে পাছে একতলার ধোঁয়া এসে ঢোকে, তাই জানলাগুলো ভাল ক'রে বন্ধ করা, ঘরের এক কোণে সন্ত-জ্বালা হ্যারিকেনটা রাখা হয়েছে। তার শিখাকে যতদূর সম্ভব নাবিয়ে দেওয়া হয়েছে, তা থেকে আবার যেটুকু আলো বেরুচ্ছে তাও একখানা বইয়ের ছেঁড়া মলাট দিয়ে আড়াল

করা হয়েছে। সামনেই চৌকির ওপর যে রোগিণী নিঃসাড় অবস্থায় প'ড়ে রয়েছে, তার জীবন-প্রদীপও ওই দীপশিখারই মত স্তিমিত।

নিস্তব্ধ সন্ধ্যাকালে আমি সেই চৌকিতে ব'সে ব'সে ভাবতে থাকি—আমার স্মৃতিকে নামিয়ে দিতে থাকি বিস্মৃতির গভীরে, জন্ম-জন্মান্তরের পারে। মৃত্যুপথযাত্রী কে এই নারী, যাকে আমি আজ মা ব'লে ডাকছি, যাকে সেবা করছি—বিনা দ্বিধায় যিনি আমার সেবা গ্রহণ করছেন! এঁর সঙ্গে কি আমি জন্ম-জন্মান্তরের কোনও সম্বন্ধে বাঁধা আছি, না, সমস্তটাই অকস্মাতের খেলা! অকস্মাতের খেলাও তো সুসম্বদ্ধ নিয়ম মেনে চলে—এমনি সব কল্পনায় সময়টা হু-হু ক'রে কেটে যায়।

এমনি একদিন সন্ধ্যেবেলা মার মুখের দিকে চেয়ে ব'সে আছি, হঠাৎ চোখ চেয়ে তিনি যেন কাকে খুঁজতে লাগলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, মা, কিছু বলছেন?

তিনি একখানা হাত তুলতেই আমি হাতখানা ধ'রে আস্তে আস্তে নামিয়ে দিলুম। মা খুব ধীরে ধীরে বললেন, এইখানে ব'স্, আমার খাটে—এই আমার পাশে।

আমি সেই অপরিসর জায়গায় কোনও রকমে কুঁকড়ে বসলুম। মা ধুঁকতে ধুঁকতে বলতে লাগলেন, তোদের হাতের এই সেবাটুকু পাবার জন্যে এতদিন অপেক্ষা করছিলুম—তা না হ'লে অনেক আগেই আমি ম'রে যেতুম। এই মাকে মনে থাকবে বাবা? হঠাৎ এই কথা শুনে আমি অশ্রু রোধ করতে পারলুম না। জিজ্ঞাসা করলুম, তোমার সঙ্গে কি আমার জন্ম-জন্মান্তরের সম্বন্ধ? কি সে সম্বন্ধ আমায় বল না মা?

একটুখানি সম্মতিসূচক হাসিতে সেই রোগক্লিষ্ট বিবর্ণ মুখখানা উদ্ভাসিত হয়ে উঠল—হতে পারে সে আমার দৃষ্টিবিভ্রম।

সেই রাত্রে আহারাদি সেরে ঘরে আমরা ঘুম দিচ্ছি, বোধ হয় রাত্রি তখন বারোটা—পরেশদা দরজা ধাক্কা দিয়ে আমাদের তুলে বললে, মা মারা গেলেন।

পরেশদাদের বাড়ি থেকে শ্মশান বোধ হয় চার মাইল দূরে, যমুনার ধারে। সেই শীতের রাত্রে আমরা চারজনে মৃতদেহ সেই চার মাইল দূরের শ্মশানে নিয়ে গিয়ে দাহ করলুম—আমার জীবনে এই প্রথম শববাহন।

পরের দিন থেকেই পরেশদার মধ্যে একটা অদ্ভুত পরিবর্তন লক্ষ্য করতে লাগলুম। মায়ের মৃত্যুতে তাকে এক ফোঁটা চোখের জল ফেলতে দেখি নি। নীরবে সে আমাদের সঙ্গে শব বহন ক'রে শ্মশানে গেল, মুখাগ্নি ও অন্যান্য কৃত্য যা কিছু ক'রে ফিরে এল। কোনও রকম হা-হুতাশ বা শোকের কোনও প্রকাশ তার মধ্যে দেখতে পেলুম না। আমাদের সঙ্গে কথাবার্তা হাসি আগেও যেমন করত তেমনি করতে লাগল—তবুও যেন মনে হ'তে লাগল, সে আমাদের কাছ থেকে অনেক দূরে স'রে গিয়েছে। শ্মশান থেকে ফিরে আসবার কিছু পরে আমাদের সেই ব্রাহ্মণী এসে রাঁধবার ব্যবস্থা করতেই সুকান্ত তাকে বললে, আজ আর রান্না ক'রে কাজ নেই, আমরা বাজার থেকে কিছু আনিয়ে খেয়ে নেব 'খন—কি বলেন পরেশদা?

পরেশদা আমাদের তিনজনকেই ওপরে মা যে ঘরে মারা গিয়েছিলেন সেই ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললেন, দেখ ভাই, তোমাদের একটা কথা বলি। আমার মার স্বাস্থ্য কোনদিনই ভাল ছিল না, বিশেষ ক'রে এই শেষ দশ বছর তিনি মুমূর্ষু অবস্থাতেই ছিলেন বললে হয়। কিন্তু এবারকার বন্ধন মোচন হতে দেরি হচ্ছিল কেন জান?

—কেন দাদা?

—তোমাদের জন্যে। তোমরা ছিলে তাঁর পূর্ব পূর্ব জন্মের সন্তান। কেন তা বলতে পারি না, তবে কোন বিশেষ কারণে তোমাদের জন্যেই তাঁর এতদিন মৃত্যু হয় নি। তোমরা আসবে, তোমাদের সেবা নিয়ে তবে তাঁর প্রাণ বেরুবে—এই ছিল নির্দিষ্ট বিধান। আমার ইচ্ছা, আমার সঙ্গে তোমরাও তাঁর জন্যে অশৌচ গ্রহণ কর। এতে তাঁর শান্তি হবে।

তারপরে হেসে বললে, ভাই, জানই তো মেয়েদের সংস্কার। আমার সঙ্গে তোমরাও যদি তাঁর শ্রাদ্ধ কর, তা হ'লে তিনি হাল্‌কা হবেন—মুক্তি পাবেন।

আমার বেশ মনে আছে, পরেশদা বিশেষ ক'রে ওই 'হাল্‌কা' শব্দটি ব্যবহার করেছিল।

পরেশদার অনুরোধে আমরা তখুনি আমাদের পূর্বজন্মের মায়ের আত্মার তৃপ্তির জন্য অশৌচ ধারণ করলুম। রাঁধুনী ব্রাহ্মণীকে তার প্রাপ্য চুকিয়ে দিয়ে বলা হ'ল, শ্রাদ্ধশান্তি হয়ে যাবার পর সে যেন দেখা করে। তখুনি সবাই বাজারে গিয়ে নতুন ধুতি কেনা হ'ল। পরেশদা আমাদের তিনজনকে তিনখানা গরম ধোশা কিনে দিলে—পরদিন থেকে শ্রাদ্ধের যোগাড়ে মন দেওয়া গেল।

মায়ের সম্পত্তির মধ্যে দু-তিনটে থানধুতি ও একখানা অতিছিন্ন গরম গায়ের কাপড় ছিল। ভিখিরী ডেকে পরেশদা একে একে সেগুলো বিলিয়ে দিলে। কাঠের তৈরী একখানা ডালাভাঙা বাক্স ছিল মায়ের ঘরে—বিয়ের পর বাপের বাড়ি থেকে সেটা এনেছিলেন। সংসার-খরচের পয়সাকড়ি যখন যা পেতেন তাতে রেখে দিতেন। এই বাক্সটা ঝাড়া-মোছা করতে করতে এক জোড়া সোনার মাকৃড়ি পাওয়া গেল—সেই পুরনো দিনের বাংলা পাঁচের মতন আকৃতি মাকৃড়ি।

পরেশদা বললে, মায়ের বিয়ের সময় বাপের বাড়ি থেকে দেওয়া এই মাকৃড়ি। কিন্তু বাবার হাত থেকে এ দুটোকে তিনি রক্ষা করলেন কি ক'রে! নিশ্চয় তাঁর মনে ছিল না।

পরেশদাই হবিষ্যান্ন রেঁধে আমাদের ভাগ ক'রে দিয়ে নিজেও বসতেন। রাত্রিবেলা দুধ আর মিষ্টি খাওয়া হ'ত। প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা শীতের অন্ধকার বেশ ঘনিয়ে ওঠার পর পরেশদা আমাদের নিয়ে যে ঘরে মা মারা গিয়েছিলেন, সেই ঘরে গিয়ে বসতেন। মায়ের শূন্য চৌকিখানার ওপরে একটা রেড়ির

তেলের প্রদীপ জ্বলত, আর আমরা সেটার সামনেই পরেশদার চৌকিখানায় বসতুম—পরেশদা মায়ের গল্প করতে থাকত। পরেশদা বলত, মা আমার চিরদুঃখিনী ছিলেন। আট-ন বছর বয়সে বিয়ে হয়ে যাবার পর ঠাকুরদা মাকে নিয়ে এসেছিলেন। ঠাকুরদার সংসারে কোনও স্ত্রীলোক ছিল না—সেই অল্পবয়সে মা আমার বাংলা দেশ থেকে সুদূর পশ্চিমে এসে সংসারের হাল ধরেছিলেন। ঠাকুরদা যতদিন বেঁচে ছিলেন, ততদিন এক রকম চলেছিল, কিন্তু তিনি মারা যাবার পরই বাবা নিজমূর্তি ধারণ করলেন। দিল্লীর যত গুণ্ডা বদমায়েস ছিল তাঁর বন্ধু। দিনরাত মদ, ভাং প্রভৃতি নানা রকমের নেশা করতেন—বলতে গেলে কোন সময়েই তিনি প্রকৃতিস্থ থাকতেন না। শুধু তাই নয়, সংসারের প্রতি তাঁর আদৌ মন ছিল না। কি ক'রে যে সংসার চলে অথবা চলবে, সে বিষয়ে কোনও হুঁশই তাঁর ছিল না। ঠাকুরদার কিছু টাকা ছিল—বাবা তা দু দিনেই ফুঁকে দিলেন। তারপরে তাঁর নজর পড়ল মায়ের গয়নাগুলোর দিকে। সেজন্যে প্রতিদিন মারধোর চলত—এক-একদিন মায়ের সঙ্গে সঙ্গে আমার ওপরেও প্রহার চলত। আমরা মায়ে-পোয়ে কতদিন যে অনাহারে ব'সে ব'সে কেঁদে দিন কাটিয়েছি, তা আর কি বলব!

পরেশদা প্রতিদিনই অত্যন্ত দরদ দিয়ে মায়ের কথা বলতে থাকত। মা যে কত সহ্য করতেন, তাঁর যে কত গুণ ছিল, সে কথা বলতে বলতে কখনও কখনও অশ্রুতে তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে যেত, আর কথা বলতে পারত না। দুঃখে ও সহানুভূতিতে আমাদের বুকের ভেতরটা মোচড় দিতে থাকত, কোনও প্রশ্ন করতে পারতুম না, চুপ ক'রে অশ্রু রোধ করবার চেষ্টা করতুম। এক-একদিন এমনও হয়েছে, আমরা দু পক্ষই চুপ ক'রে ব'সে আছি, ওদিকে সেই ক্ষীণপ্রভ প্রদীপশিখাও নিবে গিয়েছে, অন্ধকারের মধ্যে আমরা চারজন চুপচাপ ব'সে আছি। শেষকালে পরেশদাই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ ক'রে উঠে গিয়ে বাতিটা জ্বালিয়ে দিত।

ক্রমে শ্রাদ্ধের দিন এগিয়ে আসতে লাগল। পরেশদার আপিসের দুই-

একটি বন্ধু, তার বাড়িওয়ালা—এরা সব এসে পরামর্শ দিতে লাগল। সেখানে যে দু-চারজন বাঙালী ছিলেন, পরেশদার সঙ্গে তাঁদের পরিচয় ছিল না। এই সময় তাঁদের শরণাপন্ন হওয়ার কথায় পরেশদা বললে, এখানকার এই বন্ধুরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে যখন তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছে, তখন আমাদের এদের মতেই চলা উচিত। বাঙালীরা এসেই এখন পাঁচ শো রকমের ফ্যাকড়া তুলবে—এটা কর, ওটা ক'রো না, এ কি করছ হে! ইত্যাদি। এদের মতের সঙ্গে তাদের মতের মিল হবে না, মাঝে থেকে আমার মাতৃশ্রাদ্ধ পণ্ড হবে। দিল্লীতে দেখেছি কিনা! দুই তরফ রক্ষা করতে গিয়ে অনেক শ্রাদ্ধই সেখানে পণ্ড হয়েছে—দিল্লীতে থাকলে এদের কাছে ঘেঁষতেই দিতুম না।

যা হোক, শেষে ঠিক হ'ল ওই দেশেরই দ্বাদশটি ব্রাহ্মণকে খাওয়ানো হবে এবং এখানকারই ভাল ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতকে দিয়ে শ্রাদ্ধ করানো হবে।

মাতৃশ্রাদ্ধ যতই এগিয়ে আসতে লাগল, পরেশদা ততই ব্যস্ত হয়ে পড়তে লাগল। সে বাইরে গেলেই আমরা তিনজনে পরামর্শ করতে থাকতুম—মায়ের শ্রাদ্ধ হয়ে গেলে এখানে থাকা আর আমাদের সমীচীন হবে কি না! যদি এখান থেকে চ'লেই যেতে হয়, তা হ'লে আমরা আগ্রা থেকেই চ'লে যাব ব'লে স্থির করলুম। দিল্লীতে যাবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সেখানে আমাদের তিন জনেরই জানাশোনা লোক থাকায় যেতে মন সরছিল না। যদি পরেশদার ওখান থেকে স'রে পড়তেই হয় তো কবে নাগাদ যেতে হতে পারে, তা জানা দরকার। শ্রাদ্ধের ঠিক দিন দুই আগে সন্ধ্যের পর আমরা রোজ যেমন মায়ের ঘরে গিয়ে বসি, সেদিনও তেমনি বসেছি। এ-কথা সে-কথা চলেছে, এমন সময় একটু ফাঁক পেতেই আমি পরেশদাকে জিজ্ঞাসা ক'রে ফেললুম, হ্যাঁ দাদা, মায়ের শ্রাদ্ধ হয়ে গেলেই কি আমরা চ'লে যাব?

আমার প্রশ্ন শুনে পরেশদা অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বললে, না, তোমরা চ'লে যাবে কেন? হয়তো আমাকেই চ'লে যেতে হবে।

রহস্যটা আরও গভীর হয়ে উঠল বুঝতে পেরে পরেশদা বললে, ব্যাপারটা

তোমাদের খুলে বলাই উচিত, এর আগে এক মা ছাড়া এ কথা আর কেউ জানত না।

পরেশদা বলতে আরম্ভ করলে, তোমাদের তো আগেই বলেছি আমার বাবা মার ওপরে ভয়ানক অত্যাচার করতেন। একটি পয়সাও তিনি রোজগার করতেন না, অথচ তাঁর নেশা ইত্যাদির জন্যে রোজ পয়সা চাই। মার কিছু গহনা ছিল, কিছু বাপের বাড়ি থেকে পেয়েছিলেন আর ঠাকুরদাও অনেক কিছু করিয়ে দিয়েছিলেন। এই গয়নাগুলোর জন্যে বাবা প্রায়ই মাকে মারধোর ক'রে একটা একটা নিয়ে যেতেন। মার কান্না আমি সহ্য করতে পারতুম না, আমিও কাঁদতে থাকতুম। মার সঙ্গে কাঁদছি দেখলে আমার ওপরেও বাবার রাগ হ'ত, আর সেই সঙ্গে আমাকেও নিদ্দম ঠেঙানি দিতেন।

বাবা যখন মারা গেলেন, আমার বয়স তেরো কি চোদ্দ। কয়েক দিন পরেই পাওনাদারেরা এসে আমাদের বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিলে। পাড়ার একজনেরা আমাদের একখানা ঘর ছেড়ে দিলে, বললে, ভাড়া লাগবে না, থাক তোমরা।

সেই সময়ে মা যে কি ক'রে দিন চালাতেন জানি না। মাকে রোজই দেখতুম, একলা ব'সে ব'সে কাঁদছেন। আমি ঠিক করলুম, চাকরি করলে মার দুঃখ কিছু ঘুচতে পারে। কিন্তু দিল্লী শহরে কে আমায় চাকরি দেবে? ঠিক করলুম, কলকাতায় গিয়ে লোকের বাড়িতে চাকরি করলেও তো দু পয়সা পাব। মাইনের টাকাটা মাকে পাঠিয়ে দিলে তবু তিনি দু বেলা খেতে পাবেন। পৈতের সময় আমি গোটা তিনেক সোনার আংটি পেয়েছিলুম—সেইগুলো মার বাক্স থেকে চুরি ক'রে এক সোনারকে বেচে গোটা পঁচিশেক টাকা পাওয়া গেল। এই টাকা ভরসা ক'রে একদিন সন্ধ্যাবেলায় কলকাতাযাত্রী এক ট্রেনে বিনা টিকিটে সওয়ার হওয়া গেল।

কিন্তু গাড়ি ছাড়বামাত্র আমার ভয়ানক কান্না পেতে লাগল। এতক্ষণে মা আমার দেখা না পেয়ে কি রকম উতলা হয়েছেন ভেবে আমার ভয়ানক কষ্ট

হ'তে লাগল। ভেবে-চিন্তে ঠিক করলুম, একটা কোন বড় জায়গায় নেমে মাকে একখানা চিঠি লিখে আবার যাত্রা শুরু করা যাবে।

পরদিন গয়া স্টেশনে নেমে পড়লুম। সেখানে এক পাণ্ডার বাড়িতে উঠে মাকে চিঠি লিখে ডাকবাক্সে ফেলে দিয়ে স্টেশনে যাবার উদ্যোগ করছি, এমন সময় পাণ্ডাজী বললেন, সে হ'তে পারে না, গয়াতে এসে মৃত বাপের পিণ্ডি না দিলে মহাপাপ হবে।

তার পরে ভাই, সেই মহাপাপ থেকে উদ্ধার পাবার জন্যে পঁচিশ টাকা থেকে পাঁচটি টাকা খরচ ক'রে বাপের পিণ্ডি দিলুম—যে বাপ শিশু-বয়স থেকে উঠতে বসতে আমাকে ঠেঙিয়েছে, আমার আত্মীয়স্বজনহীনা রুগ্না মায়ের ওপর অকথ্য অত্যাচার করেছে। স্বামী, পিতা কিংবা পুত্র কোন হিসাবেই যে কখনও কোনও কর্তব্য পালন করে নি তাকে স্বর্গে পাঠাবার ব্যবস্থা ক'রে গয়া থেকে স'রে পড়ব, এমন সময় এক সুবিধা জুটে গেল।

আমি আসবার আগের রাত্রে পাণ্ডাদের বাড়িতে একটি ভদ্রলোক এসেছিলেন। ইনি পাণ্ডাদের পুরনো যজমান, অনেকদিন থেকেই জানাশোনা—বাবা-মার পিণ্ডি দিতে গয়ায় এসেছিলেন। ভদ্রলোক আমার সঙ্গে গায়ে প'ড়ে আলাপ করলেন। কোথায় বাড়ি, কি বৃত্তান্ত ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করায় আমি অকপটে তাঁকে আমার সব কথা ব'লে ফেললুম। আমার কথা শুনে তাঁর দয়া হ'ল। তিনি বললেন, ভাই, তুমি আমার সঙ্গে কলকাতায় চল। সেখানে আমার বাড়িতে তুমি থাকবে, আমি তোমার লেখাপড়ার ব্যবস্থা ক'রে দেব। তোমার মাকেও কিছু ক'রে পাঠাবার বন্দোবস্ত করা যাবে—যদি তাঁর দিক দিয়ে কোন বাধা না থাকে, তবে তাঁকেও কলকাতায় নিয়ে আসা যেতে পারে। কি বল? আমি তখুনি রাজী হয়ে গেলুম। তিনি বললেন, তাঁরা রাজগীরে বেড়াতে এসেছেন। তাঁর স্ত্রী অসুস্থ ছিলেন, এখন ভাল হয়ে উঠেছেন, আর দিন পনেরো বাদেই কলকাতায় যাবেন।

আমরা আরও দিন দুই গয়াতে কাটিয়ে পাটনায় এলুম। সেখান থেকে

অনেক ঘোরপ্যাঁচ খেয়ে রাজগীরে পৌঁছলুম। ভদ্রলোকের গিন্নীটি তাঁর চাইতেও ভাল মানুষ। আমাকে পেয়ে খুবই খুশি হলেন। তাঁদের সন্তানাদি ছিল না, ভদ্রমহিলা দুঃখ ক'রে বলতে লাগলেন, পরের ছেলে মানুষ করতেই পৃথিবীতে এসেছিলুম—

যাই হোক, রাজগীর জায়গাটি আমার বড় ভাল লাগল। সুন্দর নির্জন জায়গা, কাছে দূরে—যত দূর দেখা যায় পাহাড়ের পর পাহাড়। দুপুরবেলা বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে আমি এই সব পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়াতুম, বড় ভাল লাগত। মার জন্যে মন-কেমন করলেও শীগগিরই আমাদের ভাল একটা কিছু হবে—এই আশায় মনটা খুবই উৎফুল্ল থাকত। এই সব পাহাড়ে মাঝে মাঝে অনেক সন্ন্যাসী, যোগী, ফকির ইত্যাদি দেখতুম। ছেলেবেলা থেকে কেন জানি না, ফকির-সন্ন্যাসীদের ওপর আমার প্রবল ভক্তি ছিল। আমার ঠাকুরদার এক সন্ন্যাসী-গুরু ছিলেন, ঠাকুরদার এক ভাই সন্ন্যাসী হয়ে সংসার ত্যাগ করেছিলেন। মার কাছে শুনতুম, ঠাকুরদার এই গুরু মাঝে মাঝে আমাদের বাড়িতে আসতেন—তিনি নাকি অনেক অলৌকিক ক্রিয়া করতেন। ঠাকুরদা মারা যাবার পর তিনি আর আসেন নি। মার কাছে সন্ন্যাসীদের সম্বন্ধে আরও অনেক গল্প শুনে তাঁদের ওপর ভক্তির মাত্রা আমার আরও বেড়ে গিয়েছিল। এই সব পাহাড়ে সন্ন্যাসী-ফকির দেখলেই তাঁদের কাছে গিয়ে বসতুম। কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করতেন, কেউ চুপ ক'রে থাকতেন, কিছুক্ষণ ব'সে ব'সে আমিও উঠে যেতুম। আমি মনে করতুম, এই রকম বসতে বসতেই হয়তো কোনদিন অলৌকিক ক্রিয়া কিছু দেখবার সৌভাগ্য হয়ে যাবে।

একদিন আমার আশ্রয়দাতা ও তাঁর স্ত্রী পাটনায় তাঁদের এক আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা করতে চ'লে গেলেন। কথা হ'ল, তাঁরা পাটনায় তিন-চারদিন থেকে ফিরে আসবার দু-তিনদিন পরেই আমরা কলকাতায় যাব। রাজগীরে তাঁদের দুটি চাকর আর আমি রইলুম বাড়িতে পাহারা দেবার জন্যে।

সেদিন বেলা নটা বাজতে না বাজতে আমি বেরিয়ে পড়লুম। আমাদের বাড়ি থেকে অনেক দূরে একটা পাহাড় দেখা যেত। আমি ঠিক করলুম, সেদিন সেই পাহাড়টাতে যাব। এর আগে কয়েক দিন সেটাতে যাবার চেষ্টা করেছি, কিন্তু সন্ধ্যা হয়ে যাবার ভয়ে তাড়াতাড়ি ফিরে আসতে হয়েছে। সেদিন বাড়ি থেকে বেরিয়ে কিছুক্ষণ চলতে না চলতেই আমি বুঝতে পারলুম, কি যেন একটা শক্তি আমার দেহ-মনে সঞ্চারিত হয়েছে। আমি যেন দৌড়ে চলতে লাগলুম সেই পাহাড়টার দিকে। মনে পড়ে, রাস্তায় একবার কি দুবার বিশ্রামের জন্যে বসতে হয়েছিল, কিন্তু বেলা একটা বাজবার আগেই আমি পাহাড়টার তলায় গিয়ে উপস্থিত হলুম।

পাহাড়ে অনেক ঘুরে ঘুরে ওপরে উঠতে লাগলুম। এক জায়গায় একটা গুহার মতন দেখে দাঁড়ালুম। সেটার মধ্যে যে কেউ থাকে তা বাইরে থেকে দেখেই বোঝা যায়। আমার যেন মনে হ'ল, ভেতর থেকে একটু একটু ক'রে ধোঁয়া বাইরে বেরিয়ে আসছে। জায়গাটা ভারি সুন্দর। গুহার সামনেই অনেকখানি পরিচ্ছন্ন সমতল জায়গা দেখে সেখানে গিয়ে বসলুম। ঠাণ্ডা বাতাস বইছিল, অতক্ষণ হাঁটা ও পাহাড়ে ওঠার জন্যে পরিশ্রান্তও হয়েছিলুম—কিছুক্ষণ ব'সে থেকে হাতে মাথা রেখে সেইখানেই লম্বা হয়ে পড়লুম। শরীর ছিল ক্লান্ত, যেমনি শোয়া অমনি ঘুম।

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ভাই স্বপ্ন দেখছিলুম, আমি যেন কলকাতায় গিয়ে ব্যবসা ক'রে অনেক অর্থ উপার্জন করছি—মা সেখানে রয়েছেন, তিনি যেন কাকে কি বলছেন আর হাসছেন। সেদিন স্বপ্নে সেই প্রথম দেখলুম মার মুখে হাসি আর সেই শেষ। বেশ আনন্দে সময়টা কাটছিল, এমন সময় আসরে উদয় হলেন এক সন্ন্যাসী। তাঁর যেমন লম্বা-চওড়া চেহারা, তেমনি লম্বা জট মাথায়, চোখ দিয়ে যেন করুণা ঝ'রে পড়ছে। কিছুক্ষণ সেই দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে থেকে অতি স্নিগ্ধ ও স্নেহার্দ্র স্বরে সন্ন্যাসী বললেন, বেটা পরেশনাথ, আ গয়া তুম্!

তখুনি ঘুম ভেঙে গেল। ধড়মড় ক'রে উঠেই দেখি, স্বপ্নে-দৃষ্ট সেই সন্ন্যাসী সামনে দাঁড়িয়ে আমার দিকে চেয়ে মৃদু মৃদু হাসছেন। প্রথমটা হকচকিয়ে গিয়েছিলুম, সম্বিত ফিরতেই আমি একেবারে ভূমিষ্ঠ হয়ে তাঁকে প্রণাম করলুম।

সন্ন্যাসী আমাকে তুলে তাঁর বুকে জড়িয়ে ধরলেন, তার পরে আমার হাত ধ'রে সেই অন্ধকার গুহার মধ্যে নিয়ে গেলেন। অনেকখানি সরু পথ দিয়ে গিয়ে একটা ঘরের মতন জায়গা—গুহার পক্ষে সেই স্থানটুকুকে বেশ বড়ই বলা যেতে পারে। সূর্যের আলো সেখানে সামান্যই পৌঁছয়। এক কোণে কাঠ জ্বালিয়ে ছোট একটি ধুনি করা হয়েছে। গুহার মধ্যে হ'লেও কিন্তু জায়গাটা ঝুপ্সি নয়। সেখানে বেশ হাওয়া বইছিল, কারণ দেখলুম ধুনি থেকে যে ধোঁয়া উঠছে তা বাইরের দিকে উড়ে যাচ্ছে—তবে কোথা দিয়ে যে বাতাস আসছে তা বুঝতে পারলুম না।

এক জায়গায় রোঁয়া-ওঠা একটা চামড়া প'ড়ে ছিল। সন্ন্যাসী সেই আসনে ব'সে আমাকে আদর ক'রে পাশে বসিয়ে বললেন, আমি আশা করেছিলুম, তুমি এর আগেই এখানে এসে উপস্থিত হবে। তুমি গয়াতে এলে, তারপর রাজগীরে এসেছ, তাও জানতে পেরেছিলুম।

আমি মনে মনে ভাবলুম, কে ইনি? কি ক'রেই বা আমার সব খবর জানতে পারলেন?

আমি চুপ ক'রে আছি দেখে সন্ন্যাসী বললেন, বাবা পরেশনাথ, তুমি বোধ হয় আমাকে চিনতে পারছ না?

পরেশদা ব'লে চললেন, তোমাদের আগেই বলেছি যে, আমার ঠাকুরদারা দুই ভাই ছিলেন। আমার ঠাকুরদার নাম ছিল নরনাথ বাঁড়ুজ্জে, তাঁর বড় ভাইয়ের নাম ছিল দীননাথ। এই দীননাথ কিশোর বয়সেই গৃহত্যাগ ক'রে সন্ন্যাসী হয়ে চ'লে গিয়েছিলেন। সন্ন্যাসী হবার পর ইনি দুবার বাড়িতে এসেছিলেন। মার মুখে তাঁর চেহারার যে বিবরণ শুনেছিলুম তা অনেকটা এঁর

সঙ্গে মেলে। এঁর কথা শুনে চট ক'রে আমার সেই সন্ন্যাসী ঠাকুরদার কথা মনে প'ড়ে গেল। জিজ্ঞাসা করলুম, আপনি কি আমার দীনুদাদা ?

সন্ন্যাসী অপূর্ব মধুর হাসি হেসে বললেন, নেহি বেটা, ম্যয় তুম্‌হারা দীনদাদা নেহি হুঁ।

সন্ন্যাসী বললেন, আমি তোমার পূর্বজন্মের গুরু—ভাল ক'রে মনে করবার চেষ্টা কর।

পরেশদা আমাদের বলতে লাগলেন, একবার ভেবে দেখ আমার অবস্থা। সেই বিদেশে, অপরিচিত জায়গায়, চারিদিকে পাহাড় আর পাহাড়, তারই এক গুহায় সন্ন্যাসীর সামনে ব'সে আছি, বয়স চোদ্দ কি পনেরো। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, আমার কিছুই ভয় হচ্ছিল না, বরং মনে হতে লাগল—এখানে আমার কোন অনিষ্ট হবে না, আমি যেন অতি আপনার লোকের কাছে রয়েছি।

সন্ন্যাসী আবার ধীর মধুর হেসে বললেন, বেটা, মনে করবার চেষ্টা কর।

আমি যতদূর সম্ভব মনকে একাগ্র করবার চেষ্টা করতে লাগলুম, কিন্তু কিছুই মনে পড়ল না। সন্ন্যাসী আবার জিজ্ঞাসা করলেন, কিছু মনে পড়ছে ?

বললুম, কই, না, কিছুই তো মনে করতে পারছি না।

তখন তিনি আমাকে আরও কাছে এসে বসতে বললেন। আমি ঘেঁষে ঘেঁষে তাঁর কাছে এগিয়ে গেলুম। তিনি বললেন, চোখ বন্ধ কর।

চোখ বন্ধ করতেই তিনি তাঁর প্রকাণ্ড একখানা হাত দিয়ে আমার চোখ দুটো কিছুক্ষণের জন্যে ঢেকে রেখে হাত তুলে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, এবার কিছু দেখতে পাচ্ছ ?

—পাচ্ছি প্রভু।

রুদ্ধ নিশ্বাসে আমরা তিনজনেই ব'লে উঠলুম, কি দেখলে !!!

আমাদের প্রশ্ন শুনে পরেশদা কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইল। তারপর বললে, সে কথা থাক্। তবে এইটুকু শুনে রাখ যে, আমি আমার পূর্বজন্মের রূপ

দেখলুম, বাড়িঘর দেখলুম, আর দেখলুম একটা নির্জন জায়গায় এই সন্ন্যাসীই আমাকে দীক্ষা দিচ্ছেন।

গুহার এক কোণে এতক্ষণ একটা লোক ব'সে ছিল। লোকটার মাথা মুখ সব একটা ময়লা কাপড়ে ঢাকা, শুধু চোখ দুটো আর নাকটা বার করা—ঠিক ধুনির পাশেই সে ব'সে ছিল। দেখলুম, পূর্বজন্মে আমার দীক্ষার সময়েও সেই লোকটা দূরে ব'সে আছে। যে জায়গাটাতে আমার দীক্ষা হয়েছিল, তার একটু দূরেই একটা বড় নদী দেখতে পেলুম।

অল্পক্ষণ পরেই দৃশ্যপট বদলে গেল। চোখের সামনে ফুটে উঠল সেই গুহা, সেই অর্ধনিবস্ত ধুনি, আমার সামনে ব'সে আছেন সেই সন্ন্যাসী, অদূরে সেই মুখ-ঢাকা লোকটি।

সন্ন্যাসী বললেন, বৎস, যদিও তোমার আসল দীক্ষা হয়ে গেছে, তবুও জন্মে জন্মে দীক্ষার অনুষ্ঠান করতে হয়। আজই তোমাকে আমি সেই দীক্ষা দেব—প্রস্তুত হও।

তোমরা হয়তো বিশ্বাস করবে না, সন্ন্যাসীদের ওপরে আমার যতই ভক্তি-শ্রদ্ধা থাকুক না কেন, সেই চোদ্দ-পনেরো বছর জীবনের মধ্যে কোনদিনই সন্ন্যাসী হবার আকাঙ্ক্ষা মনের মধ্যে জাগে নি। অজ্ঞাত মানসলোকের কোন আহ্বানও কখনও জানতে পারি নি। কিন্তু গুরু যখন বললেন—বৎস, প্রস্তুত হও, তখন আমার সুপ্ত মন হঠাৎ জেগে উঠে বললে, আমি প্রস্তুত।

তারপরে গুরু আমাকে একখানা ছোট গেরুয়া রঙের কাপড় দিলেন পরতে। আমার অঙ্গে একটা পিরান ছিল, তার পকেটে সেই আংটি-বেচা টাকাগুলো ছিল, সব গুরুর হাতে তুলে দিলুম। তিনি সেগুলো নিয়ে সামনের দিকে হাত বাড়াতেই সেই লোকটা ধুনির পাশ থেকে উঠে এসে সেগুলো তাঁর হাত থেকে নিয়ে গুহার আর এক কোণে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

আমাকে সামনে বসিয়ে গুরু কিছুক্ষণ মন্ত্র পড়ালেন। শেষকালে একটি নাম দিয়ে বললেন, পাঁচশো বার একাগ্র হয়ে ওই নাম জপ কর।

আমি গুরুর সামনে থেকে উঠে গিয়ে একটা আলো-আঁধারি জায়গায় ব'সে নাম জপ করতে আরম্ভ ক'রে দিলুম। কিন্তু কিছুক্ষণ জপ করতে না করতে আমি সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লুম। কতক্ষণ সেইভাবে ছিলুম বলতে পারি না; তবে জ্ঞান ফিরে আসবার পর অনুভব করতে লাগলুম যে, একটা অপূর্ব আনন্দে আমার মন কাণায় কাণায় ভ'রে উঠেছে। গুরুদেব কাছেই ব'সে ছিলেন, তাঁরই একটু দূরে সেই লোকটা—আমি উঠে গুরুকে প্রণাম ক'রে গুহার বাইরে চ'লে গেলুম।

বাইরে এসে যে দৃশ্য দেখলুম, তা জীবনে এর আগে কখনও দেখি নি। দেখলুম, তখন রাত্রির অন্ধকার নেমেছে পৃথিবীতে, কিন্তু দূরে কাছে সব গাছগুলো জ্বলছে। দাউ দাউ ক'রে জ্বলছে না—প্রতিটি পাতা ঘিরে একটা সরু আলোর রেখা। কখনও প্রত্যেক পাতা থেকে বিদ্যুৎ বিচ্ছুরিত হচ্ছে, কখনও বা সেই আলো স্নিগ্ধ স্থির হয়ে যাচ্ছে। সে দৃশ্য বর্ণনা করা তো দূরের কথা, কল্পনা করা যায় না।

খুব ধীরে ধীরে বাতাস বইছিল। বাতাসের মধ্যে যেন গান শুনতে পেতে লাগলুম। ক্রমে আমার চারিদিকের গাছ, পাথর, বাতাস সবই যেন জীবন্ত হয়ে উঠে বিশ্বনিয়ন্তার প্রশস্তি গাইতে আরম্ভ ক'রে দিলে। আমারও ইচ্ছা করতে লাগল, তাদের সঙ্গে ঈশ্বরের নামগান করি, কিন্তু আমি মোটেই গান জানতুম না। আমাদের ইস্কুল বসবার আগে ছাত্রেরা সুর ক'রে একটা সংস্কৃত স্তোত্র পড়ত, আমি সেইটেই গাইতে আরম্ভ ক'রে দিলুম। আনন্দে আমার শরীরটা থেকে থেকে থরথর ক'রে কাঁপতে আরম্ভ করল।

সে রাত্রি এমনি ক'রেই কাটল।

তার পরে রোজ সকাল সন্ধ্যায় প্রায় এক ঘণ্টা ক'রে গুরুর কাছে উপদেশ শুনতে হ'ত আর বিকেলে ঘণ্টাখানেক নামজপ—এই ছিল কাজ। আমি কোথা থেকে এসেছি, কে আমি, আমার নাম কি—কিছুই মনে নেই। আমার অতীত সম্পূর্ণরূপে মন থেকে মুছে গেল।

একদিন গুরু তাঁর সেই লোকটিকে বললেন, ওরে জুগ্নু, এবার আশ্রমটা পরিষ্কার-ঝরিষ্কার কর্, আমাদের ফেরবার সময় হ'ল। বরফ পড়া আরম্ভ হয়েছে কি না দেখিস।

জুগ্নু চুপ ক'রে রইল।

গুরুদেবের এই জুগ্নু লোকটি ছিল অদ্ভুত। আমি যে কদিন সেখানে ছিলুম, তাকে একদিনও কথা বলতে শুনি নি, কোনদিন তাকে স্নান করতে কিংবা খেতেও দেখি নি। দিনরাত গুরুদেবের সামনে ব'সে থাকত, কখনও ঘুমুতেও দেখি নি। গুরুদেব যদি তাকে কোন কাজে পাঠাতেন, সে চ'লে গিয়ে তখুনি ফিরে এসে তাঁর সামনে দাঁড়াতেই তিনি বুঝতে পারতেন, জুগ্নু কি বলছে।

প্রতিদিন জুগ্নু আমাদের খাবার নিয়ে আসত, কোথা থেকে আনত কে জানে! যেত আর দশ-পনেরো মিনিটের মধ্যেই কাঁচা শালপাতায় জড়িয়ে খাবার আনত, একেবারে গরম। অথচ সেখানে চার-পাঁচ মাইলের মধ্যে লোকালয় ছিল না। সকালবেলা একটি বড় কমণ্ডলু-ভরা দুধ, বোধ হয় দু সের হবে—কোথা থেকে এসে উপস্থিত হ'ত, তা জানি না। তারপরে বেলা প্রায় একটা দেড়টার সময় জুগ্নু নিয়ে আসত গরম পুরি ও তরকারি। রাত্রেও তাই, কখনও কখনও ওর সঙ্গে কিছু মিঠাই বা চাটনিও থাকত।

এই রকম কতদিন কেটে গেল, তার সঠিক জ্ঞান ছিল না। পরে হিসাব ক'রে দেখেছি, এক মাস সাতাশ দিন আমি গুরুর কাছে ছিলুম।

একদিন পাহাড়ে এক জায়গায় ব'সে আছি। পশ্চিমে সূর্য ঢ'লে পড়েছে। আকাশটা অসম্ভব রকমের লাল হয়ে উঠেছে, সেই দিকে একমনে চেয়ে আছি, হঠাৎ আমার বিস্মৃতির আবরণ ভেদ ক'রে মার কণ্ঠস্বর কানে এসে লাগল। স্পষ্ট শুনতে পেলুম, মা যেন আমায় ডাকছেন—ও বাবা পরু রে!

নিমেষের মধ্যে স্মৃতিপটে সব ফুটে উঠতে লাগল। আমি তো ভয়ানক উতলা হয়ে উঠলুম—ভাবতে লাগলুম, মার দুঃখ দূর করবার জন্যে বাড়ি থেকে

বেরিয়েছিলুম, আর আমি কি করছি! আমার মনে হতে লাগল, মার প্রতি কর্তব্য সবার আগে। সেখান থেকেই উঠে চ'লে যাব, না, গুরুকে জিজ্ঞাসা ক'রে যাব ভাবছি, এমন সময় দেখলুম গুরু আমার সামনেই দাঁড়িয়ে রয়েছেন। আশ্চর্য! তাঁকে আমার কোন কথা বলতেও হ'ল না। তিনি আমার কাছে এসে সস্নেহে বললেন, কি বেটা, মার কথা মনে পড়ছে?

বললুম, আমার মা বড় দুঃখিনী, আমি ছাড়া তাঁর আর কেউ নেই।

গুরু বললেন, সে কি বেটা! তুমি যখন জন্মাও নি, তখন মার কে ছিল? সবার চাইতে বড় মা যিনি, তিনি তোমাকে আমাকে তোমার মাকে—সবাইকে দেখছেন। তাঁর ওপর নির্ভর কর, তাঁর ওপর বিশ্বাস রাখ।

কিন্তু গুরুর কথায় কোনও সান্ত্বনাই পেলুম না, শেষকালে আমি কাঁদতে আরম্ভ ক'রে দিলুম।

সেদিন সন্ধ্যার পরে নাম জপ করতে অসুবিধা হতে লাগল। যতবার একাগ্র হবার চেষ্টা করি, মার বিষণ্ণ মুখখানা চোখের সামনে ভেসে উঠতে থাকে, শেষকালে জপ বন্ধ ক'রে ব'সে রইলুম।

পরের দিন আবার গুরুকে আমার মনের অবস্থার কথা বললুম, তিনি কোনও কথা না ব'লে চুপ ক'রে রইলেন। গুরুর কাছেই একটা বড় হরিণের চামড়ায় আমি শুতুম। সে রাত্রে শোবার আগে গুরুদেব হাসতে হাসতে জুগনুকে বললেন, জুগনু, পরেশনাথের জামা কাপড় নিয়ে এসে ওকে দিয়ে দে, কাল সকালে ও চ'লে যাবে।

জুগনু অদৃশ্য হতেই গুরু বললেন, বেটা পরেশনাথ, কাল সকালে তুমি মার কাছে চ'লে যেয়ো। কিন্তু যাবার আগে তোমাকে একটি প্রতিজ্ঞা করতে হবে। তুমি পরমাত্মার কাছে নিবেদিত, সংসার তুমি করতে পাবে না। মার মৃত্যুর পরে তোমাকে আবার এই জীবনে ফিরে আসতে হবে।

আমি গুরুদেবকে বললুম, প্রভু, সংসারে মা-ই আমার একমাত্র বন্ধন। মাকে সুখে রাখব—এ ছাড়া আমার অন্য কাম্য নেই। মার মৃত্যুর পর সেখানে

আমার কোনও আকর্ষণই থাকবে না। আমি প্রতিজ্ঞা করছি, তাঁর মৃত্যু হ'লেই আমি চ'লে আসব, কোথায় আপনার দেখা পাব ব'লে দিন।

গুরুদেব বললেন, সে তোমায় ভাবতে হবে না, দেখা ঠিক পাবে।

পরের দিন সকালবেলায় গুরু আমাকে আমার জামা কাপড় ও টাকা কটা দিয়ে বললেন, আমি তোমাকে যে মন্ত্র দিয়েছি তা প্রতিদিন রাত্রে শোবার সময় জপ্ করবে। খুব বিপদে পড়লে আমাকে ডেকো, আমি দেখা দেব।

গুরু আমাকে যে কাপড় দিয়েছিলেন তা ছেড়ে নিজের ধুতি জামা পরলুম, তারপর তাঁকে প্রণাম ক'রে বেরিয়ে পড়লুম। রাত্রেই মনে মনে স্থির ক'রে রেখেছিলুম, আর কলকাতায় না গিয়ে সিধে দিল্লীতে মার কাছে চ'লে যাব। তবুও যাবার আগে আমার সেই আশ্রয়দাতার সঙ্গে দেখা ক'রে যাই মনে ক'রে প্রথমেই সেখানে গিয়ে দেখলুম যে, সে বাড়িতে অন্য ভাড়াটে এসেছে। কাছেই এক মুদির দোকানের মালিকের সঙ্গে আমার আলাপ-পরিচয় হয়েছিল। তার কাছে গিয়ে জানতে পারলুম যে, আমার সেই আশ্রয়দাতা ভদ্রলোক কদিন ধ'রে আমার অনেক খোঁজ ক'রে অত্যন্ত নিরাশ হয়ে কলকাতায় ফিরে গিয়েছেন। হিসাব ক'রে দেখলুম, সন্ন্যাসীর কাছে এক মাস সাতাশ দিন ছিলুম—এই সময়ের কোন জ্ঞানই আমার ছিল না।

সেই দিনই বিকেলের ট্রেনে পাটনায় এসে রাত্রি এগারোটার ট্রেনে চ'ড়ে দিল্লী রওনা হলুম।

এই অবধি ব'লেই পরেশদা চুপ করল।

কিছুক্ষণ কি যেন চিন্তা ক'রে পরেশদা আবার শুরু করলে, সে আজ দশ বছর কি তারও কিছু বেশি হবে। এই দশ বছর মাকে ছেড়ে আর কোথাও যাই নি। মা চ'লে গেলেন, পৃথিবীর সমস্ত বন্ধন থেকে আমাকে মুক্ত ক'রে দিয়ে গেছেন। আমি বিয়ে-থা করলুম না ব'লে মার মনে ক্ষোভ ছিল। কাল রাতে তিনি এসে আমায় ব'লে গেছেন, তাঁর আর কোনও ক্ষোভ নেই।

জিজ্ঞাসা করলুম, শ্রাদ্ধের পর কি তুমি চ'লে যাবে ?

—কোথায় যাব ?

—তবে ?

—গুরুদেব বলেছিলেন, সে বিষয়ে তোমায় কিছু ভাবতে হবে না। তবে আমাকে সর্বদা প্রস্তুত হয়ে থাকতে হবে। আমায় যে যেতে হবে সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত। আজ কাল কি হয়তো দুদিন দেরি হতে পারে—এই অনিশ্চয়তার মধ্যে আমি কি ক'রে আর তোমাদের ভরসা দিতে পারি বল ? তোমাদের যখন প্রথম নিয়ে আসি, সেই দিনই এ কথা ব'লে রেখেছিলুম—কিন্তু আমার আশা ছিল, মা আরও কিছুদিন বাঁচবেন। তিনি আর বছরখানেক বাঁচলেও তোমাদের স্থিতি ক'রে দিয়ে যেতে পারতুম, কিন্তু ঈশ্বরের তা ইচ্ছা নয়।

এবার পরেশদা মিনতির সুরে বললে, তোমাদের কাছে আমার একটি অনুরোধ এই যে, আমার কিছু একটা হেস্তনেস্ত হয়ে না যাওয়া পর্যন্ত তোমরা এইখানেই থাক। এবারের যাত্রায় যিনি আমার মা ছিলেন, পূর্ব পূর্ব কোন জন্মে তিনি তোমাদেরও মা ছিলেন। সেই সম্বন্ধে তোমরা আমার ভাই হও—তোমাদের কাছে আমার এইটুকু জোর নিশ্চয় খাটবে, কি বল ?

প্রতিজ্ঞা করলুম, তোমার কিছু না হওয়া পর্যন্ত আমরা এইখানেই থাকব।

পরেশদা হেসে হেসে বললে, আশা করি, বেশি দিন তোমাদের ধ'রে রাখব না।

শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা হতে লাগল। কথা হ'ল ওই-দেশীয় ব্রাহ্মণেরা যখন ভোজনে বসবেন তখন আমরা অর্থাৎ ম্লেচ্ছ মছলি-খোর বাঙালী ব্রাহ্মণেরা কাছে আসতে পারব না। দূর থেকে ভোজনপর্বের তদারক করলে অবিশ্যি তাঁরা কোনও আপত্তি করবেন না। সেখানকার শ্রাদ্ধভোজী ব্রাহ্মণদের খবর দেবার ভার নিলেন পরেশদার ওই-দেশীয় দুজন বন্ধু।

পরেশদা যাঁর বাড়িতে থাকত, অর্থাৎ তার বাড়িওয়ালার কাছাকাছিই আর একটা বড় বাড়ি ছিল—সেই বাড়িটা খালি ছিল। ঠিক হ'ল সেইখানেই শ্রাদ্ধ, ব্রাহ্মণভোজন ও খাবার-দাবার তৈরি সবই হবে। খাবারের মধ্যে পুরি, একটা আলু-কুমড়োর ঘ্যাঁট, হিং দিয়ে কাঁচা তেঁতুলের খাট্‌-মিঠ্‌ঠা চাটনি আর লাড্ডু।

লাড্ডু কি রকমের হবে তাই নিয়ে কয়েক ঘণ্টা ধ'রে কি আন্দোলন! লাড্ডু তৈরি সম্বন্ধে অনেকগুলি বিশেষজ্ঞ এসে উপস্থিত হলেন। কারু বাড়ি আগ্রা, কেউ বা দিল্লীর ওস্তাদ, কেউ বা মথুরার, কেউ বা সাণ্ডিলার কারিগর—লক্ষ্ণৌয়ের কাছে সাণ্ডিলা ব'লে জায়গা আছে, সেখানকার লাড্ডু ভারতবিখ্যাত। যা হোক, সবাই মিলে অনেক তর্কাতর্কি আলাপ-আলোচনা ক'রে স্থির হ'ল যে, এক পোয়া ওজনের এক হাজারটি লাড্ডু তৈরি হবে। এতে সওয়া শো থেকে দেড় শো টাকা খরচ হবে। লাড্ডু কি রকম হবে তার নমুনা একদিন ব্রাহ্মণেরা এসে বাড়িতে তৈরি ক'রে আমাদের খাইয়ে গেল।

শ্রাদ্ধের আগের দিন পরেশদা মাথা নেড়া করলে। বললে, তোমাদের আর মাথা কামাতে হবে না, শুধু শ্রাদ্ধ করলেই চলবে।

সেই রাত্রে সারারাত্রি ধ'রে আমরা পালা ক'রে ভিয়েনের কাছে ব'সে রইলুম। পরদিন খুব সকালে যমুনায় স্নান ক'রে আসা গেল। বেলা যখন আটটা—তখনও শ্রাদ্ধের ক্রিয়াকর্ম শেষ হতে অনেক দেরি, তখন থেকেই ব্রাহ্মণেরা একে একে আসতে আরম্ভ করলেন। সাড়ে নটা দশটার মধ্যেই বারোটি বিরাট মনুষ্য-পর্বত এসে হাজির হলেন।

কিছুক্ষণ পরেই ব্রাহ্মণেরা ভোজনে ব'সে গেলেন। তাঁরা আমাদের বলতে লাগলেন, আমরা অতি উদার মতাবলম্বী। তোমরা কাছে এলে আমাদের খাওয়া পণ্ড হবে না, অক্লেশে কাছে এসে আমাদের ভোজন দেখতে পার—তবে বাপু খাদ্যদ্রব্যে হাত-টাত দিও না যেন!

ব্রাহ্মণদের পরিবেশন করবার জন্যে আগে থাকতেই অন্য ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করা হয়েছিল, তারা পরিবেশন করতে লাগল, আর আমরা দূর থেকে স্পর্শ বাঁচিয়ে তদারক করতে লাগলুম।

ঘণ্টা দুয়েক কেটে গেল, কিন্তু তখনও ব্রাহ্মণেরা সমান উৎসাহে লাড্ডু ওড়াতে লাগলেন। বাংলা দেশে কে কবে আধ মণ খেতে পারত ব'লে যাঁরা সেকালের গৌরব করেন, তাঁরা দয়া ক'রে একবার এখানকার ব্রাহ্মণদের খাওয়া দেখে আসবেন—বেশি খোঁজাখুঁজি করতে হবে না, খাওয়াবেন শুনলে তাঁরা আপনিই এসে হাজির হবে।

পরেশদার কাজ শেষ হয়ে গেলে সেও আমাদের পাশে এসে দাঁড়াল। ব্রাহ্মণেরা খেতে খেতে নিজেদের মধ্যে গল্প করতে লাগলেন—খালি খাওয়ার গল্প। মথুরার চোবেরা কি রকম খেতে পারে, কোন্ কোন্ চোবে খেতে খেতে আসনে ব'সেই দেহত্যাগ করেছিলেন—সেই সব মহাত্মাদের চরিত্র-কথা।

একদিকে পুরি তরকারি, বিশেষ ক'রে লাড্ডু মণ মণ উড়তে লাগল, অথচ তাঁদের ক্ষুন্নিবৃত্তির কোনও লক্ষণই নেই। বেলা প্রায় দুটো বাজল, তখনও তাঁরা খেয়েই চলেছেন—বোধ হয় তিন-চার শো লাড্ডু চেখেই মেরে দিলেন। যদি খাবার কম প'ড়ে যায়—সেই ভয়ে কাছেই এক হালওয়াইকরের দোকানে কি কি মিষ্টান্ন মজুত আছে তার খোঁজ নিয়ে আসা গেল।

খাওয়া চলেছে—বেলা তখন প্রায় তিনটে। শীতের বেলা, রোদের ঝাঁজ ক'মে এসেছে। নিমন্ত্রিতদের কাছে বেইজ্জত হবার আশঙ্কায় আমরা সব কাঁটা হয়ে আছি। এমন সময় দেখা গেল দরজা দিয়ে মাথা নীচু ক'রে এক সন্ন্যাসী প্রবেশ করলেন। সন্ন্যাসীর বিরাট দেহ, বোধ হয় সাত ফুট উঁচু ও সেই অনুপাতে দেহের পরিধি, তার ওপরে মাথায় প্রকাণ্ড জটা। সন্ন্যাসীর পেছনে আর একজন ঢুকল—যার মুখখানা একটা কাপড় দিয়ে পেঁচিয়ে বাঁধা, শুধু চোখ দুটো খোলা রয়েছে।

এই লোকটাকে দেখেই আমি বুঝতে পারলুম—এই হচ্ছে সেই জুগ্‌নু, যার কথা পরেশদার মুখে আগেই শুনেছি। পরেশদা আমার পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল। তার দিকে চেয়ে দেখলুম, ঠিক সম্মোহিত ব্যক্তির মতন দৃষ্টিহীন চোখে সে চেয়ে রয়েছে। সন্ন্যাসী চারিদিকে চেয়ে অতি মধুর কণ্ঠে বললে, কাঁহা হয় মেরা বেটা পরেশনাথ ?

পরেশদা ধীরপদক্ষেপে এগিয়ে গিয়ে সন্ন্যাসীকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করলে। তার পরে সে উঠে দাঁড়াতেই সন্ন্যাসী দু হাত বাড়িয়ে তাকে আলিঙ্গন ক'রে আমাদের দিকে পেছন ফিরে দাঁড়ালেন, তারপরে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন—জুগ্‌নুও তাঁদের পেছু পেছু বেরিয়ে গেল। জুগ্‌নুর চলন দেখে মনে হ'ল, সে যেন একটু খুঁড়িয়ে চলে।

উঠোন ভর্তি লোক থ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, কারুর মুখ দিয়ে টুঁ শব্দ পর্যন্ত বেরুল না।

ব্রাহ্মণভোজন তখনও চলেছে। আরও ঘণ্টাখানেক ধ'রে খেয়ে সমস্ত খাবার নিঃশেষ ক'রে পান চিবোতে চিবোতে যখন তাঁরা বেরুলেন, তখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে।

এ-বাড়ির কাজকর্ম মিটিয়ে ও-বাড়ি অর্থাৎ পরেশদা যেখানে থাকতেন সেখানে গিয়ে দেখি, সব ভোঁ-ভাঁ—কেউ কোথাও নেই। আমরা আলো জ্বালিয়ে বাজার থেকে খাবার এনে খেলুম। আশা করেছিলুম যে, পরেশদা তার গুরুকে নিয়ে এখানেই এসেছে—অন্তত মাতৃশ্রাদ্ধের দিনটাতে সে চ'লে যাবে না। কিন্তু কোথায় সে ? রাত্রি দ্বিপ্রহর অবধি অপেক্ষা ক'রে আমরা শুয়ে পড়লুম।

ভোর হতেই বাড়িওয়ালার সঙ্গে পরামর্শ করবার জন্যে তাকে ডাকা হ'ল। পরেশদা যখন সন্ন্যাসীর সঙ্গে বেরিয়ে যায়, সেও সেখানে উপস্থিত ছিল। আমরা তাকে বললুম, এবার আমরাও চলি। কারণ আমরা ছিলুম পরেশদার আশ্রিত লোক। সে-ই যখন চ'লে গেছে, তখন আর আমাদের এখানে থাকার কোনও মানে হয় না।

বাড়িওয়ালা জিজ্ঞাসা করলে, পরেশবাবু কি আর আসবেন না? আপনারা ঠিক জানেন?

—ঠিক জানি।

বাড়িওয়ালা বললেন, আচ্ছা, আপনারা আজকের দিনটা তো থাকুন এখানে।

সেদিন বাড়িওয়ালা আপিস থেকে ফিরে আসবার পর তাঁকে ডেকে পরেশদার সমস্ত মালপত্র জিম্মা ক'রে দিয়ে পরদিন সকালে আমরাও সেখান থেকে বেরিয়ে পড়লুম।

বেরিয়ে তো পড়লুম, এখন যাই কোথায়? যে বাড়িখানা আমরা ভাড়া নেব ব'লে ঠিক করেছিলুম, দেখলুম তখনও সেটার দরজায় তালা দেওয়া রয়েছে। বাড়িওয়ালার কাছে চাবি চাইতে গেলে এবারে সে আর সহজে ছাড়লে না, একটি মাসের ভাড়া আগাম নিয়ে নিলে। যা হোক, আমরা বাড়িতে গিয়ে ধোওয়া-মোছা ক'রে তিনজনের জন্যে তিনখানা দড়ির খাটিয়া কিনলুম। সেদিন আর রান্নাবান্নার হাঙ্গামা না ক'রে একটা দোকানে কচুরি-জিলিপি মেরে সারাদিন তাজমহলে কাটিয়ে দেওয়া গেল। সন্ধ্যার একটু আগে পরেশদার বাড়িতে খবর নিয়ে জানা গেল, সে এখনও ফেরে নি। বাড়ির দিকে যেতে যেতে এক জায়গায় দেখলুম, একটা লোক রাস্তার ওপরেই একটা টেবিল পেতে তাতে চায়ের কাপ, বোতল-ভর্তি বিস্কুট প্রভৃতি সাজিয়ে রেখেছে।

আগ্রায় এসে অবধি চা পেটে পড়ে নি। এ সব জায়গায় সে সময়ে চা-খাওয়ার তেমন চলন ছিল না। শীতকালে কোনো কোনো ইংরেজী-ভাবাপন্ন শৌখিন মাঝে-সাঝে চা খেতেন বটে, কিন্তু রাস্তাঘাটে চায়ের দোকান বড় একটা পাওয়া যেত না। সে সময়ে কলকাতা শহরেই দু-চারটে মাত্র চায়ের দোকান দেখতে পাওয়া যেত। চা দেখে আমাদের মহাপ্রাণী উল্লসিত হয়ে উঠল। তখুনি দোকানদারকে তিন কাপ চায়ের হুকুম ক'রে চেয়ারে ব'সে

পড়া গেল। একটু পরেই দোকানদার ঝকঝকে পাত্রে আমাদের চা এনে দিলে। বেশ আরাম ক'রে চা খাচ্ছি ও রাস্তার নানারকম ফেরিওয়ালার মজাদার বুকনি শুনছি—এমন সময় এক বাঙালী ভদ্রলোককে দেখলুম গট্ গট্ ক'রে হেঁটে যাচ্ছেন। ভদ্রলোক কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে আবার ফিরে সোজা আমাদের কাছে এসে বললেন, মশাই, আপনাদের দেখে তো বাঙালী হিন্দু ব'লে বোধ হচ্ছে!

আমরা বললুম, হ্যাঁ, আপনার অনুমান ঠিকই হয়েছে।

ভদ্রলোক কণ্ঠস্বরে একটু ধমকের রেশ মিশিয়ে বললেন, আপনারা করছেন কি? উঠে আসুন—উঠে আসুন—

বললুম, এখনও চা খাওয়া শেষ হয় নি যে!

—তা হোক, চলুন আমাদের বাড়িতে, সেখানে চা খাবেন।

এই ব'লে ভদ্রলোক পকেট থেকে চারটে পয়সা বের ক'রে দোকানদারকে দিয়ে চোস্ত উর্দুতে তাকে বললেন, মাপ ক'রো ভাই, এরা আমার আপনার লোক, এদের নিয়ে যাচ্ছি ব'লে কিছু মনে ক'রো না।

আমরা পুরো কাপ শেষ করতে পারি নি—প্রত্যেকের কাপেই অর্ধেকটা চা তখনও রয়েছে।

আমরা শশব্যস্ত হয়ে উঠে পড়লুম। দোকানদার অবাক হয়ে একবার আমাদের দিকে আর একবার সেই ভদ্রলোকের দিকে চাইতে লাগল।

লোকটি দেখতে খুবই মোটা, লম্বাও মন্দ নয়। বয়স পরে শুনেছি ত্রিশ বৎসর, কিন্তু প্রথম দৃষ্টিতে চল্লিশের কম মনে হয় না। মাথার চুল উঠতে আরম্ভ করেছে। মুখে খুব বড় একজোড়া গোঁফ, দাড়ি কামানো। ধুতি মালকোঁচা ক'রে পরা, কিন্তু দৈহিক স্থূলত্বের দরুন তা প্রায় হাঁটুর ওপরে উঠেছে। গায়ে গেঞ্জির ওপরে খুব পাতলা মসলিনের মতন সাদা কাপড়ের ঢিলে-হাতা পাঞ্জাবি। জামাও কুঁচকে-কাঁচকে নানা স্থানের মাংসপিণ্ডের চাপে—মনে হয় ছোট হয়েছে। এর ওপরে পাট-করা একখানা সিল্কের চাদর

পৈতের মতন ক'রে বুকে বাঁধা। সেই পশ্চিমের শীতে ভদ্রলোকের অঙ্গে র‍্যাপার তো নেইই, বরং দেখলুম তাঁর কপাল ও মুখ বিন্দু বিন্দু ঘামে ভর্তি। এক মুখ পান রয়েছে—গালফোলা সে অবস্থা দেখলেই বুঝতে পারা যায় যে, দোক্তা টানার অভ্যেস আছে।

ভদ্রলোকের সঙ্গে কিছুদূর এগিয়ে যাবার পর তিনি বললেন, আপনাদের দেখে মনে হচ্ছে এখানকার লোক নন। যা হোক, ওখানে চা খেতে আছে! জানেন লোকটা মুসলমান '

তখন হিন্দু পানি-পাঁড়ে ও মুসলমান-ভিস্তির যুগ। আমাদের দেশোদ্ধার-কল্পে নেতারা হিন্দু-মুসলমান-মিলনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কতই গলাবাজি করুন না কেন, প্রকাশ্যে মুসলমানের দোকানে ব'সে পানাহার চালানো তাঁরাও তখন কল্পনা করতে পারেন নি। বিশেষ ক'রে যুক্তপ্রদেশের মতন জায়গায় হিন্দুরা সুদূরভবিষ্যতেও এ ব্যাপার সম্ভব হবে ব'লে মনে করতে সাহসী হ'ত না। ভদ্রলোকের কথা শুনে আমরা বললুম, তাতে কি হয়েছে মশায়! আমরা হিন্দু-মুসলমানে ভেদাভেদ মানি না। এই ক'রেই তো আমাদের দেশ উচ্ছন্নে গেল।

আমাদের মুখ থেকে এমন উত্তর ভদ্রলোক আশা করেন নি। তিনি কিছুক্ষণ আমতা আমতা ক'রে বললেন, খুব সত্যি কথা, আপনারা যা বলছেন তা খুবই সত্যি কথা। কিন্তু আমি বেশ ভাল ক'রে জানি যে, ওই দোকানদার বিলিতী চিনি ব্যবহার করে। আপনারা বিলিতী চিনি নিশ্চয় ব্যবহার করেন না!

—নিশ্চয়ই না।

—যাক্ গে, যা দু-এক ঢোক পেটে গিয়েছে তার আর কি হবে! অজানতে খেলে কোন দোষ নেই।

আরও কিছুদূর এগিয়ে ভদ্রলোক বললেন, চলুন আমাদের বাড়িতে, সেখানে চা খাবেন।

চলতে চলতে ভদ্রলোকের বাড়ি গিয়ে পৌঁছনো গেল। সেখানে পরস্পরের পরিচয় গ্রহণ করা হ'ল। ভদ্রলোক তাঁর নাম বললেন, শ্রীসত্যসেবক চক্রবর্তী। তাঁর বাবা সরকারী উচ্চ কর্মচারী ছিলেন। তাঁরা পুরুষানুক্রমে পশ্চিমেই বাস করেন। কাশীতে বাড়ি-ঘর আছে কিন্তু এ জায়গাটা বাবার ভাল লাগে আর জিনিসপত্রও কাশীর চেয়ে সস্তা, তাই এইখানেই তাঁরা বাস করেন। তাঁরা তিন-চারটি ভাই, কেউ এম. এ., কেউ বি. এ., ত্বজন এখানেই চাকরি করেন, তিনি কিন্তু কিছুই করেন না।

কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর বুঝতে পারলুম অর্থাৎ তিনি বুঝতে দিলেন, আপাতত তিনি পরের উপকার ক'রে বেড়ান, স্বদেশসেবাও কিছু কিছু ক'রে থাকেন, তবে গোপনে। আমরা নেহাৎ সগু বাংলা দেশ থেকে আসছি আর তিনি লোক দেখলেই চিনতে পারেন—এই কারণেই 'স্বদেশসেবা'র কথাটি আমাদের কাছে প্রকাশ করলেন।

কথাবার্তার মধ্যে ভদ্রলোক একবার বললেন, আপনারা আমার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট, আমি আপনাদের 'তুমি'ই বলব—অবিশ্যি যদি কোন আপত্তি না থাকে।

এতে আমাদের আর কি আপত্তি থাকতে পারে! তখন থেকেই আমরা তাঁকে 'সত্যদা' ব'লে ডাকতে আরম্ভ ক'রে দিলুম, আর তিনি আমাদের নাম ধ'রে ডাকতে লাগলেন।

কিছুক্ষণ বাদেই চা আর তার সঙ্গে কিছু মিষ্টি এল। খাবার খেতে খেতে পরেশদার কথা উঠল—দেখলুম, পরেশদার সঙ্গে সেখানকার কোন বাঙালীর পরিচয় না থাকলেও তার বিস্ময়কর অন্তর্ধানের খবরটি সকলেই জানে। যা হোক, আহারাদির পর আমরা তখনকার মতন বিদায় নিলুম। কথা রইল কাল বেলা সাড়ে তিনটের সময় আমরা তাঁর কাছে আসব, তিনি আমাদের সেখানকার কোন কোন বাঙালী বাসিন্দার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবেন।

পরের দিন সত্যদা আমাদের একটি আড্ডায় নিয়ে গেলেন। এখানে

আগ্রা শহরের প্রায় অধিকাংশ বাঙালীই সন্ধ্যাবেলা এসে জমায়েত হন। সেদিন কি একটা ছুটি থাকায় আড্ডায় জনসমাগম অন্য দিনের চেয়ে বেশি হয়েছে। আমরা যখন উপস্থিত হলুম, তখন তাঁদের মধ্যে সন্ন্যাসীর সঙ্গে পরেশদার অন্তর্ধান নিয়ে খুব জোর আলোচনা চলেছে। আমরা যাবার একটু পরেই সে আলোচনা থেমে গেল।

সেই সভায় উপস্থিত প্রায় সকলেই সত্যদার চেয়ে বয়সে অনেক বড়, কিন্তু সত্যদা তাঁদের সঙ্গে বেশ সমানভাবেই কথাবার্তা বলতে লাগলেন। একটু পরেই একজন মুরুব্বী-গোছের ভদ্রলোক আমাদের দেখিয়ে সত্যদাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তার পরে সত্য, এই বালখিল্যদের যোগাড় করলে কোথা থেকে ?

সত্যদা বেশ রহস্যপূর্ণ হাসি হেসে বললেন, অনেক দিন থেকেই এদের এখানে চ'লে আসবার জন্যে লেখালেখি করছিলুম, কিন্তু বাবুরা আর সময় ক'রে উঠতে পারছিলেন না। সম্প্রতি শ্বশুরবাড়ির লোকেরা বড়ই জ্বালাতন আরম্ভ করায় দিনকতক একটু গা-ঢাকা দেবার প্রয়োজন হয়েছে। লিখলুম, এখানে কোন শালা কিছু করতে পারবে না, পত্রপাঠ চ'লে এস। তাই চ'লে এসেছে। এখন কিছুকাল থাকবে এখানে।

সত্যদার কথায় উপস্থিত সকলে—আমরা সুদ্ধু—চনমনিয়ে উঠলুম। আড্ডার যাঁরা এতক্ষণ আমাদের উপস্থিতি সম্বন্ধে পরম উদাসীন হয়ে বসেছিলেন, তাঁরাও বিস্ফারিত লোচনে আমাদের দেখতে লাগলেন। সত্যদা গোপনে অথচ সশব্দে পাশের লোকটিকে বলতে লাগলেন, ওদের কথা তো আগে কতবার বলেছি তোমাদের। কি সব ছেলে! এক-একটি হীরের টুকরো বললেই হয়। যেমন ঘোড়ায় চড়তে পারে, তেমনি সাঁতারে ওস্তাদ। বন্দুক দাও—একশোর মধ্যে একশোটাই 'বুল'স আই'-এ হিট করবে। তেমনি তীরধনুক বল, তলোয়ার বল—কিছুতেই কম যাবে না। ওই যে সেদিন—ব'লে সত্যদা কণ্ঠস্বর একটু নামিয়ে বলতে লাগল, একজন পুলিস অফিসার খুন হ'ল—ব'লেই সে চুপ ক'রে আকাশের দিকে চেয়ে রইল।

সকলে বিস্ময়মিশ্রিত সম্ভ্রমের সঙ্গে আমাদের দেখতে লাগলেন। বোধ হয় তাঁরা আমাদের চেহারা ও বয়সের সঙ্গে সত্যদা-বর্ণিত গুণাবলীর মিল খুঁজতে লাগলেন। আড্ডার দু-একজন লোক একটু একটু ক'রে আমাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে আরম্ভ করলেন। একজন জিজ্ঞাসা করলেন, হ্যাঁ মশায়, শুনেছিলুম যে কোন্ একজন বাঙালীর নায়কত্বে এক লক্ষ নাগা সন্ন্যাসী নাকি অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে একেবারে তৈরী হয়ে আছে—এ কি সত্যি কথা ?

সত্যদা একটু দূরে ব'সে আর একদলের সঙ্গে কি সব বলাবলি করছিলেন, সেই নাগা সৈন্যদের কথা কানে যাওয়া-মাত্র তিনি সেখান থেকেই ব'লে উঠলেন, ওদের কোনও কথা জিজ্ঞাসা ক'রো না, কারণ কোনও কথা প্রকাশ করা ওদের বারণ আছে। আমাকে জিজ্ঞাসা কর। তারপর বললেন, হ্যাঁ, নাগা সন্ন্যাসীদের কথা যা শুনেছ, তার সবটা সত্যি না হ'লেও বারো আনা সত্যি—যা রটে তার কিছু বটে।

একটু চুপ ক'রে থেকে সত্যদা ব'লে উঠলেন, কিন্তু তোমাদেরও সব তৈরী হতে হবে। ঘরে ব'সে আরাম করলে আর চলবে না।

সবাই চুপ ক'রে রইলেন।

সত্যদা সেদিন সেখানে ব'সে আমাদের সম্বন্ধে এমন সব গাল-গল্প ছড়াতে লাগলেন যে, তাঁর উদ্ভাবনী-শক্তির প্রচণ্ড বিস্ফোরণে আমরা চম্‌কে চম্‌কে উঠতে লাগলুম। যা হোক, পরের দিন বিকেলবেলা আবার দেখা করতে ব'লে সেদিন তিনি বিদায় নিলেন।

যত দিন যেতে লাগল, সত্যদার আসল পরিচয় পেয়ে আমরা ততই মুগ্ধ হতে লাগলুম। এমন সার্থকনামা ব্যক্তি ইতিপূর্বে অন্তত আমার চোখে আর পড়ে নি। নাম ছিল তার সত্যসেবক, কিন্তু সত্যের ত্রিসীমানার মধ্যে সে চলাফেরা করত না। শুধু তাই নয়, এমন সবজান্তা ব্যক্তিও সংসারে দুর্লভ। সত্যদাকে যখন যা জিজ্ঞাসা করা যেত, অমনি সঙ্গে সঙ্গে তার উত্তর পাওয়া যেত। একটা দৃষ্টান্ত দিই, আগ্রার কেল্লার চারিদিকে গভীর পরিখা আছে। তার

পরেই খানিকটা ঘাসওয়ালা জমি ও তার পরে রাস্তা। পরিখার পরেই যে জমি আছে সেখানে এক জায়গায় লাল পাথরের একটা ঘোড়ার মূর্তি আধখানা পোঁতা আছে—এখন আছে কি না তা বলতে পারি না, অন্তত সে সময় ছিল। একদিন সত্যদাকে জিজ্ঞাসা করলুম, এই ঘোড়ার মূর্তিটা এখানে কেন সত্যদা?

সঙ্গে সঙ্গে সত্যদা উত্তর দিলেন, সম্রাট আকবর প্রতিদিন সকালে কেল্লার ছাত থেকে ঘোড়ায় চ'ড়ে লাফ মেরে নীচের রাস্তায় প'ড়ে বেড়াতে যেতেন। ঘোড়া একেবারে পরিখার এ পারে প'ড়ে মারত দৌড়—তার পরে পঞ্চাশ মাইল ঘুরে আবার তিনি কেল্লায় ফিরে আসতেন। একদিন এই রকম লাফ মারতে গিয়ে ঘোড়াটা আর পরিখা পার হতে পারলে না। পরিখার মধ্যে ছিল পাঁক, ঘোড়াটা সেই পাঁকের মধ্যে ডুবে ম'রে গেল আর সম্রাট তার ওপরে ছিলেন ব'লে বেঁচে গেলেন। বিশ্বাসী ঘোড়ার স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ তার পাথরের প্রতিমূর্তি তৈরি ক'রে তিনি ওইখানে স্থাপন করেছেন।

সত্যদা বলতেন, আমি প্রতিদিন সকালবেলা ছাতের ওপর ব'সে সূর্যের দিকে চেয়ে যোগ করি—সূর্যের দিকে চেয়ে আমার গুরুর দেওয়া মন্ত্র উচ্চারণ করতে থাকি। অনেকক্ষণ মন্ত্র পড়তে পড়তে আমার মনে হয়, আমি যেন একটা বিন্দুতে পরিণত হয়েছি। তার পরে হু-হু ক'রে উড়তে উড়তে একেবারে চ'লে যাই সূর্যের কাছে। কখনও বা সূর্যটাই একটা বিন্দুর মত হয়ে ছুটতে ছুটতে চ'লে আসে আমার কাছে।

একদিন সুকান্ত ন্যাকা সেজে ব'লে ফেললে, আচ্ছা সত্যদা, সূর্যটা কি রকম?

সত্যদা অমনি সঙ্গে সঙ্গে ব'লে উঠলেন, ওঃ, সে একেবারে জবাকুসুম সংকাশং—!

সত্যদা বলতেন, আগে আমাদের দেশে সূর্যে যাওয়ার ব্যাপারটা খুবই চলতি ছিল—তা না হ'লে কি সূর্যসিদ্ধান্তের মতন বই লেখা যায়?

সে সময় তাজমহল ও কেল্লার পরিচর্যার জন্ম একজন উচ্চশ্রেণীর কর্মচারী নিযুক্ত হতেন। সে সময়ে এই কাজে একজন ইংরেজ নিযুক্ত ছিলেন। তাজমহলের বাগানটি তাঁর দেখাশোনার ফলে খুবই সুন্দর হয়ে উঠেছিল। সে বাগানের গাছের ফুল ফল বা পাতা ছেঁড়া বারণ ছিল। যে সব জায়গায় গাছ ছিল না, সেখানকার ঘাস সর্বদা এমন পরিষ্কার ও সমান ক'রে ছাঁটা থাকত যে, সেদিকে চেয়ে দেখতে হ'ত। আমাদের দেশীয় লোকেরা তাজ দেখতে গিয়ে দলে দলে এই সব ঘাস-জমিতে বসত আর ঠোঙা, পাতা, শিশুদের ময়লায় জায়গাগুলো অত্যন্ত নোংরা ক'রে দিয়ে চ'লে যেত। সেই ইংরেজ পরিদর্শক এই সব নোংরামিতে আপত্তি করত এবং মাঝে মাঝে চাবুক হাতে লোক তাড়া করত—কখনো কখনো বা এর তার ঘাড়ে দু-এক ঘা চাবুক বসিয়েও দিত।

একদিন সত্যদা বললেন, কাল তোমাদের রিভলভার দেব। এই লোকটা রোজ সন্ধ্যেবেলা যমুনার পোলের ওপর বেড়াতে আসে, ব্যাটাকে সাবড়ে দাও।

সত্যদার প্রস্তাব শুনে বুকের মধ্যে টিপটিপ করতে লাগল। মনে হ'ল, বেশ তো নাগা সন্ন্যাসী নিয়ে দিন কাটছিল—কিন্তু এ সব আবার কি! বললুম, অনেক দিন রিভলভার চালানো অভ্যেস নেই যে দাদা!

সত্যদা বললেন, আচ্ছা, আগে দিনকয়েক ভাল ক'রে অভ্যেস ক'রে নাও। কাল রিভলভার নিয়ে যাওয়া যাবে প্র্যাকটিস করতে।

সেদিন বাড়ি ফিরে গিয়ে নিজেদের মধ্যে রিভলভার সম্বন্ধে পরামর্শ করি আর ভয়ে গায়ে কাঁটা দিতে থাকে। ভাবতে থাকি যে, আমরা কি মনে ক'রে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলুম আর কি হ'ল! দিব্যি চাকরি-বাকরি করব, সুখে শান্তিতে খাব-দাব জীবনযাত্রা নির্বাহ করব, তা নয়—রিভলভার কি রে বাবা! খুন-খারাপি রক্তপাত এ সবের প্রতি আমাদের কারোরই কোন আকর্ষণ ছিল না। মনে মনে আমরা যে খুব অহিংস অথবা বৈষ্ণবভাবাপন্ন ছিলুম তা নয়। আমরা কল্পনা করতুম, যুদ্ধের পোশাক প'রে, বন্দুক ঘাড়ে নিয়ে দল বেঁধে 'বন্দে মাতরম্' গাইতে গাইতে যুদ্ধে চলেছি, মেয়েরা এসে গলায় মালা পরিয়ে দিচ্ছে—দেশের জন্যে সে রকম ভাবে মরার মধ্যে সমারোহ আছে, মাদকতাও আছে। কিন্তু রিভলভার নিয়ে লুকিয়ে একজনকে হত্যা ক'রে পলায়ন করা, তারপরে ধরা প'ড়ে ফাঁসিকাঠে ঝোলা—সে কথা যে কল্পনা করতেও ভয় লাগে। অবিশ্যি অন্য কেউ সে কর্ম করলে তাকে প্রাণ খুলে তারিফ করতে পারি—কিন্তু নিজের হাতে হত্যা! বাস্ রে!

সত্যি কথা বলতে কি, রাত্রে বার বার ফাঁসির স্বপ্ন দেখে চমকে উঠতে লাগলুম।

পরের দিন ভয়ে ভয়ে সত্যদার বাড়িতে গেলুম। কিন্তু কোথায় কি? কালকের রিভলভার আজ গাঁজার কল্কেতে পরিণত হয়েছে। সত্যদার সে কথা মনেও নেই—আমরাও খুঁচিয়ে আর তা মনে করিয়ে দিলুম না।

দিনকতক চেপে থেকে একদিন জিজ্ঞাসা ক'রে ফেললুম, সত্যদা, সেই রিভলভারের কি হ'ল?

সত্যদা অমনি বললে, দেখ হে, ব্যাটার আয়ু কিছু বেড়ে গেছে। গুরুদেব রিভলভার চালাতে বারণ করেছেন। ওদের মারবার একটা নতুন কায়দা তিনি ব'লে দিয়েছেন। শুধু আগ্রায় নয়, সারা ভারতবর্ষে যেখানে যত ইংরেজ ও সাদাচামড়া আছে তাদের বাবুর্চীদের যোগাড় করতে হবে।

ব্যাটাদের খাবারের সঙ্গে বাঘের গোঁফ মিশিয়ে দিলে রক্ত-আমাশা হয়ে ঠিক তিন দিনে সব সাফ হয়ে যাবে—শিবের বাবাও রক্ষা করতে পারবে না।

যুদ্ধের এই অভিনব অস্ত্রের কথা শুনে আমরা যে কি পর্যন্ত আশ্বস্ত হলুম তা কি বলব! যাক, রিভলভারের হাত থেকে আপাতত উদ্ধার পাওয়া গেল।

সত্যদা বলতে লাগলেন, ভারতবর্ষের সমস্ত দেশীয় রাজ্যে খবর পাঠানো হয়েছে—বাঘের গোঁফ যোগাড় হচ্ছে। ওদিকে কলকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ ইত্যাদি জায়গায় বড় বড় হোটেলের বাবুর্চীদের সঙ্গে শলা-পরামর্শ চলেছে—দেখ না কি হয়!

রিভলভার না পাওয়ার কারণ শুনে আমরা যে খুবই নিশ্চিন্ত ও আশ্বস্ত হলুম, তা বোধ হয় বুঝিয়ে বলবার দরকার হবে না। সত্যদা বলতেন, তিনি গুরুর আদেশ ছাড়া কোন কাজই করেন না। গুরুদেব থাকেন হিমালয় পাহাড়ের কোন শিখরে, নিভৃত এক গুহার মধ্যে। সে স্থান এতই দুর্গম, মানুষ তো দূরের কথা—এমন কি পিঁপড়ে পর্যন্ত সেখানে পৌঁছতে পারে না। কিন্তু গুরুর কৃপায় সত্যদার যখনই দরকার হয় তখনই এক নিমেষে সেখানে পৌঁছে যান—অবিশ্যি সূক্ষ্ম শরীরে। গুরু নাকি মাঝে মাঝে স্বপ্নে তাঁকে দেখা দিয়ে থাকেন। তিনি এ কথাও ব'লে দিয়েছেন যে, ভারতবর্ষ স্বাধীন হতে আর দেরি নেই।

ওখানকার বাঙালীরা ছাড়া ওই দেশবাসী অনেক লোকও সত্যদাকে চিনত এবং অনেক ধনী ব্যক্তি তাকে খাতিরও করত। আমি এ পর্যন্ত অনেক বাঙালীকে ভাল উর্দু বলতে শুনেছি, কিন্তু সত্যদা যখন ওই-দেশীয় লোকদের সঙ্গে হৈ-হৈ ক'রে কথা বলতেন তখন বুঝতে পারা যেত না যে, উর্দু তাঁর মাতৃভাষা নয়।

ওই-দেশীয় লোকদের নানা আড্ডায় সত্যদা আমাদের নিয়ে গিয়ে আলাপ-পরিচয় করিয়ে দিতেন। কোথাও বলতেন—সরকারী কলেজের ইংরেজ অধ্যাপক ঠেঙিয়ে আমরা পালিয়ে এসেছি, কোথাও বা বলতেন—লেফটেন্যাণ্ট গবর্নর

ফুলারকে সেলাম করি নি ব'লে ইস্কুল থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। মোট কথা, আমরা যে কেওকেডা লোক নই সে কথা অনেকেই জেনে গেল। সত্যভাষণ সম্বন্ধে সত্যদার মনোভাব যাই হোক না কেন, এমনিতে তাঁর ব্যবহার ছিল খুবই মিষ্টি ও অমায়িক। তা ছাড়া, আমাদের বড় ভালবাসতেন—কাজেই কয়েক দিনের মধ্যেই আমরাও তাঁর খুবই অনুগত হয়ে পড়লুম।

আমাদের মতনই ওই-দেশীয় দুটি যুবক ছিল সত্যদার মহাভক্ত, তারা দুজনেই ছিল কলেজের ছাত্র। একজনের নাম বিরিজনাথ আর একজনের নাম হোতিলাল। এরা যেদিন আসত, সেদিন আমরা অন্য কোথাও না গিয়ে সত্যদার বৈঠকখানাতেই আসর জমাতুম।

সে সময়ে বাংলা দেশের বাইরে বাঙালীদের খুবই খাতির ছিল। বিশেষ ক'রে 'স্বদেশী'র কোন কিছুতে যুক্ত ব্যক্তিকে লোকে খুবই সম্ভ্রমের চোখে দেখত। সত্যদার কাছে আমাদের ওই রকম পরিচয় পেয়েই হোক কিংবা বয়সের ধর্মেই হোক, প্রথম দিনেই বিরিজনাথ ও হোতিলালের সঙ্গে আমাদের খুবই ভাব জ'মে গেল। আলাপের দু-তিন দিন পরেই একদিন বিরিজনাথ আমাদের জিজ্ঞাসা করলে, আচ্ছা, বাঙালীরা তো বোঙা (বোমা) তৈরি করতে খুবই ওস্তাদ—বলি, কিছু জানা-টানা আছে ?

সুকান্ত বললে, জানা নেই, তবে তোমার দরকার থাকে তো ফরমূলা আনিয়ে দিতে পারি।

তারপরে শোনা গেল বিরিজনাথ বোমা তৈরি করতে একজন ওস্তাদ। শোনা গেল বিরিজনাথরা ছোটখাট জমিদার। শহরে বোমা তৈরি ক'রে দেশে নিয়ে গিয়ে তার পরীক্ষা করে। তার তৈরী বোমায় একটা ছোট খোলার ঘর একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। বিরিজনাথ কথায় কথায় বলত, মার্ দুঙ্গা শালেকো এক বোঙা ইত্যাদি।

ব্যাপার দেখে তো আমরা মনে মনে পরমাদ গুনতে লাগলুম। আগ্রা শহরে কেল্লা ও তাজমহলের মাঝামাঝি জায়গায় একটা চমৎকার বাগান

আছে—বাগানটি সে সময় তৈরি হচ্ছিল। বাগানটির নাম ছিল ভিক্টোরিয়া গার্ডেন্‌স্। ভারতবর্ষের অনেক শহরেই তখন ভিক্টোরিয়া গার্ডেন্‌স্ ছিল। এখনকার কথা বলতে পারি না, কিন্তু সে সময় আগ্রার ভিক্টোরিয়া গার্ডেন্‌সে চমৎকার একটি ভিক্টোরিয়ার প্রতিমূর্তি ছিল। প্রতিমূর্তির চারিদিকে ফোয়ারা, তারই মাঝখানে জলের মধ্যে মূর্তিটি খাড়া করা ছিল। একদিন বিরিজনাথ কোথা থেকে হন্তদন্ত হয়ে এসে বললে, আজ রাত্রে বোঙা মেরে ভিক্টোরিয়ার ওই মূর্তিটি সে উড়িয়ে দেবে। সে কোথা থেকে বোমা তৈরি করবার একটা নতুন ফরমুলা পেয়ে বোমা তৈরি করেছে, আজ রাত্রে তার পরীক্ষা হবে।

সর্বনাশ! বিরিজনাথের সঙ্কল্প শুনে তো আমাদের চক্ষু চড়কগাছে উঠল। সত্যদা আধ মিনিট-টাক্ চোখ বুজে থেকে বললেন, গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা না ক'রে আমি হাঁ কিংবা না কিছুই বলতে পারি না।

হোতিলাল কিন্তু মহা আপত্তি করতে লাগল। সে বললে, মিছিমিছি এ সব জিনিস নষ্ট ক'রে কি হবে? কারণ একদিন না একদিন এখানকার সব ছেড়ে-ছুড়ে ব্যাটাদের লম্বা দিতেই হবে—তখন এ সব তো আমাদেরই হবে।

বিরিজনাথ প্রায়ই বলত, আজ হাসপাতাল উড়িয়ে দেব, কাল স্টেশন উড়িয়ে দেব, ইত্যাদি। যমুনার ওপরে দোতলা পোলটার ওপর তার আক্রোশ ছিল সব থেকে বেশি। কিন্তু হোতিলাল তাকে বাধা দিয়ে বলত, আরে ইয়ার, যানে দো—

আজ মনে হচ্ছে, হোতিলালের দূরদৃষ্টি ছিল প্রখর। কারণ সাজা হুঁকো হাতে পেয়েও কর্তারা যা লঙ্কাকাণ্ড বাধিয়েছেন তাতে মনে হয়, ঢেলে সাজতে হ'লে না জানি এঁরা কি কেলেঙ্কারিই না করতেন! কিন্তু দূরদৃষ্টি প্রখর থাকলেও বন্ধু হোতিলালের নিকটদৃষ্টি কম ছিল, কারণ কয়েক বছর পরেই বিপ্লবীদের সঙ্গে মিশে কোথায় বোমা মেরে সে ধরা পড়ে, এবং ফলে তার দ্বীপান্তর না ফাঁসি হয়েছিল তা ঠিক মনে পড়ছে না।

সত্যদার কল্যাণে আমাদের মান ইজ্জৎ ও যশের মাত্রা যেমন বাড়তে লাগল, সেই অনুপাতে তবিলের সিকি-দুয়ানির সংখ্যা কমতে লাগল। বিস্কুটের টিন খালি হয় হয়—এমন অবস্থায় সত্যদাকে একদিন ব'লে ফেললুম, এবার অর্থ উপায়ের একটা সুরাহা না করলে তো চলে না দাদা।

আমাদের কথা শুনে সত্যদা বললেন, এর আর কি! তোমরা কিছু ভেবো না, আমি সব ঠিক ক'রে দিচ্ছি।

সত্যদা পরামর্শ দিলেন, আগে তোমরা বাড়িটা ছেড়ে দাও। আমি একটা ডেরা তোমাদের ঠিক ক'রে দিচ্ছি, আপাতত সেখানে গিয়ে ওঠ। মাস পোয়ালেই বাড়ি ভাড়ার ভাবনাটা তো আর ভাবতে হবে না। তার পরে ধীরে সুস্থে একটা ব্যবসা-ট্যাবসা লাগিয়ে দিচ্ছি।

পরদিন সত্যদা আমাদের নিয়ে গেলেন তাঁর এক বন্ধুর বাড়ি। বন্ধুটি ওই-দেশীয় লোক, একজন ধনী ব্যবসাদার। সত্যদা প্রথমে ভদ্রলোকের কাছে আমাদের খুব তারিফ ক'রে শেষকালে বললেন, এরা এখন কিছুকাল এ দেশে থাকবে। তোমার বাড়ির পেছন দিকে—সেই অমুক ব্যক্তি যেখানটায় থাকত—সেটা খালি আছে?

ভদ্রলোক বললেন, খালি নেই, কিন্তু তাতে কি! তোমার বন্ধুরা থাকবেন—এ তো আমার ভাগ্যের কথা। আমি এখুনি খালি করিয়ে দিচ্ছি।

দিন দুই পরে আমরা ভাড়াটে বাড়ি ছেড়ে দিয়ে নতুন ডেরায় উঠে এলুম। একটা বড় ঘর। রাস্তার দিকে অর্থাৎ ঘরের সামনেই খানিকটা বারান্দা আছে। বাড়ির ভেতর থেকে এ ঘরে আসবার দরজাটা বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়েছে। একতলায় খানিকটা উঠোন ও একটা ছোট মতন ঘর, সেটাতে আমরা রান্নাঘর করলুম। বাড়িতে ঢোকবার দরজা, সিঁড়ি সবই আলাদা। আসল বাড়ির খানিকটা অংশ হ'লেও ব্যবস্থা সবই আলাদা।

আমাদের অর্থ ফুরিয়ে আসছে দেখে আমরা শুধু ঘি দিয়ে ভাত আর আলু-ভাতে খেতে আরম্ভ ক'রে দিলুম। কথায় বলে—বড়লোকের এবং

সেই বড়লোক যদি ভদ্রলোক হয় তবে তার আওতায় থাকলে মানুষের অনেক কষ্টের লাঘব হয়। আমরা আসবার পর প্রায়ই আমাদের জন্যে কখনো মিঠাই, কখনো নানা রকমের আচার, কখনো পুরি প্রভৃতি আসতে লাগল। সত্যদার কল্পিত আমাদের অশেষ গুণের কথা সে বাড়ির অন্তঃপুর অবধি পৌঁছেছিল এবং সেখান থেকে করুণার নির্ঝর খাদ্যে রূপান্তরিত হয়ে আমাদের কাছে এসে পৌঁছতে লাগল। মাঝে মাঝে আমরা মালিকের বৈঠকখানায় গিয়ে বসতুম। তিনি আমাদের খুব খাতির করতেন ও কলকাতার স্বদেশী আন্দোলনের ঘটনাবলী শুনতে চাইতেন। মধ্যে মধ্যে আমরা তাঁকে 'বন্দে মাতরম্' গান আবৃত্তি ক'রে শোনাতুম। ভদ্রলোক বড় বড় দুটি চোখ বার ক'রে সেই ধ্বনি শুনতেন আর বলতেন—সাবাস্!

আমরা যে ঘরে বাস করতুম ঠিক তার পাশের ঘরখানিতে দুপুরবেলা বাড়িওয়ালা শেঠদের বাড়ির মেয়েদের মজলিস বসত। পাঁচ-সাতটি মেয়ে দুপুরবেলা কলরোল ক'রে আমাদের দিবানিদ্রাটি মাটি করত। আমরা তাদের কথাবার্তা কিছু বুঝতে পারতুম, কিছু বুঝতুম না। তাদের দেখতে পেতুম না, কিন্তু তাদের কণ্ঠস্বর ধ'রে আন্দাজ করতুম কে কি রকম দেখতে—কার কত বয়স হয়েছে! এই অদৃশ্য কুলবালাদের নামকরণও করেছিলুম একটা একটা ক'রে। কেউ খন্‌খনে, কেউ ঝড়্‌ঝড়ে, কেউ বাজর্খাই, কারুর নাম বা মিষ্টিগলা। মধ্যে মধ্যে বাড়িওয়ালাদের বাড়ির মেয়েরা দল বেঁধে বাড়ি থেকে বেরিয়ে বেড়াতে যেত—আমাদের চোখে পড়লে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতুম, কোন্‌টি কে? সে ঘরে মাঝে মাঝে মেয়েরা দশ-পঁচিশ খেলতে বসত। মনে পড়ে সেই সব দিনে গোলমালের আর মাত্রা থাকত না। এই সময় কখনো কখনো খন্‌খনের সঙ্গে বাজর্খাইয়ের যেত ঝগড়া লেগে আর মিষ্টিগলা তাদের মাঝে প'ড়ে থামিয়ে দেবার চেষ্টা করত—সুরে আর বেসুরে মিলে বিচিত্র ধ্বনির তরঙ্গ উঠত সেদিন। কোন কোন দিন

ঘরখানা নিঃশব্দে প'ড়ে হা-হা করতে থাকত—সেদিন মনে হ'ত, আজ দুপুরটা বৃথাই কাটল।

একদিন অনেক রাত্রে জনার্দন আমাকে ঠেলে ঘুম থেকে তুলে দিয়ে ফিস্ ফিস্ ক'রে বললে, কিছু শুনতে পাচ্ছ ?

কিছুক্ষণ কান খাড়া ক'রে থেকে কিছুই শুনতে না পেয়ে বললুম, কই, কিছুই তো শুনতে পাচ্ছি না—বাতিটা জ্বালাও না।

জনার্দন বললে, না, বাতি জ্বালিও না। কান পেতে থাক, এখুনি শুনতে পাবে।

কি আর করি! অন্ধকারে সজাগ হয়ে ব'সে রইলুম। কিছুক্ষণ বাদেই জনার্দন আমার গা টিপে বললে, ওই শোন।

সত্যি কথা বলতে কি, আমি এতক্ষণ মনে করছিলুম হয়তো কোনো চোরের পদধ্বনি কিংবা সিঁদ-কাটা বা বাক্স-ভাঙার আওয়াজ পাব। কিন্তু সেই নিরন্ধ্র অন্ধকারের বুক ফুঁড়ে অতি ক্ষীণ নারীকণ্ঠের রোদনধ্বনি এল আমার শ্রবণে! অতি মৃদু,—কখনো শোনা যায় কখনো শোনা যায় না এমন সুরে কোন নারী তার বুকের ব্যথা উজাড় ক'রে দিচ্ছে। একটু পরেই বুঝতে পারলুম যে, কান্নার শব্দটা আসছে আমাদেরই পাশের ঘর থেকে—দিনের বেলায় কলহাস্যে যে ঘর মুখরিত হয়ে ওঠে। ব'সে ব'সে কিছুক্ষণ কান্না শুনে শুয়ে পড়া গেল। তখনো কান্না থামে নি, এক-একবার সে শব্দ বেড়ে উঠে করুণ ঘুমপাড়ানি ছড়ার মতন মনে হতে লাগল—সেই একঘেয়ে করুণ সুর শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়লুম।

তার পরের রাত্রে সজাগ হয়ে রইলুম, কিন্তু কোনও শব্দ শুনতে পেলুম না।

আগ্রায় রাত্রে শীতের ঠেলায় প্রায়ই আমার ভাল ক'রে ঘুম হ'ত না। ভাল বিছানা তো দূরের কথা, বিছানা বলতে আমাদের কিছুই ছিল না বললেই হয়। যদিও সে সময় আগ্রায় অতি সামান্য খরচেই লেপ তোষক তৈরি করা যেত, কিন্তু আমরা তা করি নি। কারণ আমাদের কখন কোথায় যেতে হয়,

কোথায় আশ্রয় পাই বা না পাই, বিছানার মত অত বড় লটবহর বাড়াবার দরকার কি! আমাদের তিন জনের জন্যে তিনটে মাথার বালিশ ও একটা পাতলা লাল কম্বল ছিল। কিন্তু ধরণীর বুকে আগুন আছে ব'লে ভূতাত্ত্বিকেরা যতই প্রচার করুন না কেন, প্রতি রাত্রে সেই পাথরের মেঝে ফুঁড়ে যে জিনিসটি উঠে আমাদের নিদ্রার ব্যাঘাত করত তা আগুন নয়, আগুনের উল্‌টো পিঠ। ঠাণ্ডা থেকে বাঁচবার জন্যে আমরা মেঝেতে ধুতি জামা কাগজ ইত্যাদি পেতে বিছানা গরম করবার চেষ্টা করতুম। ভাগ্যে পরেশদা তিন জনকে তিনটে ধোসা কিনে দিয়েছিল—তাই চাপা দিয়ে শুয়ে পড়া যেত। প্রথম রাত্রে বয়সের ধর্মে ঘুমিয়ে পড়তুম বটে, কিন্তু রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শীতের ঠেলায় ঘুম ভেঙে যেত, বিশেষ ক'রে পাশ ফেরবার সময়।

এই রকম এক রাত্রে শীতের চোটে উশখুশ করছি, জনার্দন ও সুকান্ত দিব্যি ভোঁস ভোঁস ক'রে ঘুমুচ্ছে, এমন সময় আবার সেই নারীর কান্নার আওয়াজ কানে এল। বন্ধুদের না তুলে আমি দরজার ফাঁক দিয়ে কারুকে দেখা যায় কি না তার চেষ্টা করতে লাগলুম, কিন্তু অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই দেখা গেল না।

ওদিকে কান্না কখনো থামছে, কখনো বাড়ছে, কখনো বা একেবারে থেমে যাচ্ছে। একবার কানে এল—ও আমার প্রাণের রাজা, ও আমার একমাত্র 'তুই'—আমায় ছেড়ে কোথায় আছিস! একবার কি ভুলেও মনে পড়ে না!

মনে মনে হিসাব ক'রে ঠিক করলুম, এ নারী নিশ্চয় পতিহারা বিধবা। কিন্তু দিন কয়েক চেষ্টা ক'রে সন্ধান নিয়ে জানতে পারলুম যে, ও-বাড়িতে বিধবা কেউ নেই। এদিকে একদিন দুদিন অন্তর দু-তিন দিন উপরি উপরি সেই কান্না শুনতে পাই। কোনো দিন খুবই মৃদু, কোনো দিন ওরই মধ্যে একটু জোরে।

তারপরে একদিন শুনলুম—হে পরমাত্মা! সে যে মা ছাড়া আর কারুকেই জানত না—তুমি তাকে দেখো—

এবার স্পষ্ট বুঝতে পারলুম, সন্তান-শোকে আকুলা জননী এই নারী। সন্ধান নিয়ে জানতে পারা গেল, আমার অনুমান ঠিক। বছর দুয়েক আগে শেঠের একমাত্র ছেলে মারা গিয়েছে—অনেক পুজো, হোম, যজ্ঞ ক'রে, অনেক সন্ন্যাসীকে গাঁজা খাইয়ে মাদুলী যোগাড় ক'রে নাকি সেই ছেলে হয়েছিল। দেবতা সন্তান দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু সে কেবল পুত্রশোক দেবার জন্যে। ছেলেটি চার বছরের হয়ে মারা গিয়েছে।

এই সংবাদ পাওয়ার পর কি জানি কেন সেই অজানা অদেখা নারীর প্রতি সমবেদনায় আমিও ব্যথিত হয়ে উঠলুম—সেই রোদনের সুরে আমিও বাঁধা প'ড়ে গেলুম। নিশীথ রাত্রে সেই নির্দিষ্ট সময়ে তার কান্না শোনা আমার যেন একটা নেশার মতন হয়ে দাঁড়াল। যেদিন কান্নার সুর শুনতে পাওয়া যেত না, সেদিন আমার অস্বস্তি বোধ হ'ত। মনে হ'ত, বিশ্বনিয়ন্তার রচিত একখানি করুণ কাব্য শুনতে শুনতে হঠাৎ যেন ছন্দপাত হ'ল। এক-একদিন এমনও হয়েছে—আমি আগে উঠে সেই বন্ধ দরজার কাছে গিয়ে বসেছি তার কিছুক্ষণ পরে কান্না আরম্ভ হয়েছে। পুত্রশোকবিধুরা সেই জননীর রোদন-ধ্বনির মধ্যে আমি যেন আমার নিজের জননীর রোদনধ্বনির আভাস পেতুম। আমার মনে হ'ত, আমার মাও নিশীথ রাত্রে তাঁর পলাতক পুত্রের জন্য এমনি ক'রে অশ্রু বিসর্জন করছেন। সে কথা মনে হওয়া মাত্র চোখে জল ঠেলে আসত—সেই অন্ধকারে ব'সে ব'সে আমিও অশ্রুপাত করতুম। এমনি ক'রে কেউ কারুকে না দেখে, বন্ধ দরজার দুপাশে দুজনে ব'সে কত রাত্রি আমরা কেঁদে কাটিয়েছি তার হিসাব প্রকৃতির ভাণ্ডারে জমা হয়ে আছে।

এই ভাবে আমাদের আগ্রায় দিন কাটতে লাগল। একদিন দুদিন অন্তর আমরা পরেশদার সেই বাড়িওয়ালার কাছে গিয়ে পরেশদার খবর করি। সে ভদ্রলোক বলতে থাকে, পরেশনাথ আমাকে মজিয়ে গিয়েছে। তার জিনিসপত্র প'ড়ে রয়েছে এখানে, বাড়িখানা ভাড়া দিতে পারছি না। জিনিসগুলো নিয়ে কি করব তাও বুঝতে পারছি না। দিল্লীতে তার কেউ

নেই, কার কাছে এখন এ সব জিনিস জিম্মা ক'রে দিই—এ রকম ফ্যাসাদে আজ পর্যন্ত কোনও বাড়িওয়ালা পড়ে নি।

আমরা তাকে কতবার বুঝিয়ে বললাম যে, পরেশদা আর ফিরবে না। সে কথা লোকটি কিছুতেই বিশ্বাস করতে চায় না। সে বললে, তা হ'লে পরেশনাথ অন্তত একটা চিঠি লিখেও আমাকে জানিয়ে দিত।

একদিন সত্যদা বললেন, ওহে, সুখবর আছে। এখানকার একজন ধনী জমিদার, আমার বন্ধুলোক সে—কয়েক পুরুষ ধ'রে লগ্নীর কারবার ক'রে অনেক টাকা করেছে। লোকটা কিছুদিন থেকে একটা ব্যবসা করবার তালে ঘুরছে। কাল সন্ধ্যেবেলা সে আমার কাছে এসেছিল। তোমাদের কথা বলতেই সে লাফিয়ে উঠল। বললে—এই রকম লোকই আমি খুঁজছি; এদের যদি পাই তা হ'লে আমি কারবারে নামতে রাজী আছি। আমি বলেছি, তাদের যদি লাভের অংশ দাও তা হ'লে তোমার খাতিরে তাদের ব'লে-ক'য়ে তোমার সঙ্গে ব্যবসায় নামতে রাজী করাতে পারি।

প্রস্তাব শুনে তো আমরা আশায় উৎফুল্ল হয়ে উঠলুম। সত্যদা বললেন, কথা হয়েছে কাল সন্ধ্যেবেলা তোমাদের নিয়ে আমি তার কাছে যাব। কথাবার্তাও হবে আর রাত্রের আহারও ওইখানেই হবে।

সেদিন বিদায়ের সময় সত্যদা বিশেষ ক'রে ব'লে দিলেন, ওহে, কাল একটু তাড়াতাড়ি এসো। সে আবার এখান থেকে অনেক দূরে, এক্কা না হ'লে যাওয়া যাবে না।

মোটা মানুষ হ'লেও সত্যদা অসম্ভব হাঁটতে পারতেন—পাঁচ-সাত মাইল যাওয়া ও আসা তাঁর কাছে কিছুই ছিল না বললেই হয়।

আশায় ও আনন্দে সারারাত্রি ভাল ক'রে ঘুমই হ'ল না আমাদের। পরদিন দুপুরেই সত্যদার ওখানে গিয়ে হাজির হলুম। তারপরে দুখানা এক্কা ক'রে প্রায় দু-ঘণ্টা বাদে আমরা এক গ্রামে, সেই জমিদারের বাড়িতে গিয়ে হাজির হলুম। জমিদার সাহেব মোটা-সোটা লোক, রাস্তার ওপরেই বড় তক্তাপোশের

ওপর ব'সে ছিলেন, দু-চার জন মোসাহেবও তাঁকে ঘিরে রয়েছেন, দেখলুম। জমিদার সাহেব বললেন, আপনাদেরই অপেক্ষায় ব'সে আছি। দু-পক্ষ থেকে আদর-আপ্যায়ন হবার পর সকলেই সেই চৌকিতে আসন নিলুম।

প্রথম দর্শনে জমিদার সাহেবকে ক্যাবলা ভোলা লোক মনে হ'লেও তাঁর কথাবার্তা শুনে মনে হ'ল, বেশ চতুর লোক। বিশেষ ক'রে অর্থের লেন-দেন ব্যাপারে ভব্যতার সীমা লঙ্ঘন না ক'রেও বেশ সাবধানী। নিজের প্রাপ্য কড়ির ষোল আনা বুঝে নেবেন বটে, তবে অন্যের প্রাপ্য কড়ির এক পয়সাও তঞ্চকতা করবেন না ধরনের। ভদ্রলোক ইংরেজী জানেন এবং একখানা ইংরেজী দৈনিকও নিয়ে থাকেন। আগ্রা শহরেও কাউকে কলকাতার কোন ইংরেজী দৈনিক নিতে দেখি নি।

জমিদার সাহেব আমাদের সঙ্গে অত্যন্ত নম্রভাবে কথা বলতে আরম্ভ করলেন। আমাদের বয়স তখন সতেরো এবং জমিদারবাবুর বছর পঁয়ত্রিশ হবে। কিন্তু তিনি আমাদের তারিফ করবার জন্যে বলতে লাগলেন, আপনারা আমার চেয়ে বয়সে অনেক বড়—তা ছাড়া আপনাদের বুদ্ধি জগদ্বিখ্যাত, ইত্যাদি।

অন্যকে বড় বলা ও মান দেওয়া উর্দু কৃষ্টির একটা লক্ষণ। যেমন—আপকা দৌলতখানা—

যা হোক, সত্যদা আমাদের জন্য জমি তৈরী ক'রেই রেখেছিলেন। আমরা যে দেশ-ভক্তি ও সততার অবতারবিশেষ, সে সম্বন্ধে দেখলুম জমিদার সাহেবের সন্দেহ-মাত্র নেই। যদিও সঙ্গে-সঙ্গেই তিনি প্রকাশ করলেন, বাবু সাহেব, টাকা বড় খারাপ জিনিস—টাকার লোভে অতি বড় সাধুকেও আমি পাকা চোরে পরিণত হতে দেখেছি।

অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে এ কথাও তিনি প্রকাশ করলেন যে, তাঁর সাত পুরুষ জমিদারিই ক'রে এসেছেন—ব্যবসার মত হীনবৃত্তি তাঁদের বংশে কখনও কেউ অবলম্বন করেন নি। অবিশ্যি বিষয় অথবা অলঙ্কারাদি বন্ধক রেখে সুদে টাকা

খাটানোর ব্যবসাও তাঁরা ক'রে থাকেন। টাকা মারা যাবার সম্ভাবনা তাতে নেই বললেই চলে। কিন্তু আজকাল দুনিয়ার ঢং ফিরেছে। অনেক বড় বড় জমিদার ব্যবসায় নামছেন, এবং তাতে দেশের উপকারও হচ্ছে দেখে তিনিও ব্যবসা-রূপ হীনবৃত্তি অবলম্বন করবেন ব'লে স্থির করেছেন। এতে ওষুধ ও পথ্য অর্থাৎ একাধারে অর্থবান হওয়া এবং দেশের কাজ করা—এক ঢিলে দুটি পাখিই মারা হবে।—ব'লেই নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে ফেললেন।

অতি বিনয়সহকারে জমিদার সাহেব আমাদের আবার বললেন, আপনারা গুণী এবং জ্ঞানী, বলুন, আমার এই খেয়াল ঠিক আছে কি না!

আমরাও তাঁর তারিফ ক'রে বললুম, আপনার এই খেয়াল খুবই ঠিক আছে। আপনি একজন এত বড় জমিদার হয়ে সামান্য ব্যবসাদারী করতে যে রাজী হয়েছেন, এতে আপনার মহানুভবতাই প্রকাশ পাচ্ছে। এখন কি ব্যবসা করবেন সে বিষয়ে কিছু চিন্তা করেছেন কি?

ভদ্রলোক একটু রহস্যপূর্ণ হাসি হেসে সত্যদার দিকে একবার চেয়ে বললেন, নিশ্চয়। সে একটা কিছু না ভেবেই কি আপনাদের এত কষ্ট দিয়েছি! দেখুন, আপনাদের দেশে বয়কট চালু হবার আরম্ভ থেকেই আমি এ বিষয়ে চিন্তা করছি। অনেক ভেবে স্থির করেছি, আপাতত মোজা ও গেঞ্জির কল আনিয়ে এখানে সেই সব তৈরি করবার ব্যবস্থা করা যাক। এই ব্যবসা চালাবার ভার থাকবে আপনাদের ওপর। আপনারা যদি এ ব্যবসাকে লাভবান ক'রে তুলতে পারেন, তা হ'লে পরে আমরা ব্যবসা আরও বাড়াব ও অন্যান্য ব্যবসার জন্যেও টাকা ঢালব—আপনারাও তাতে থাকবেন।

আমরা বললুম, খুবই ভাল কথা। কলকাতায় কয়েক জায়গায় মোজা-গেঞ্জির কল বসেছে দেখেছি, কিন্তু তারা এখনও পর্যন্ত কেউ কিছু ক'রে উঠতে পারে নি।

আমাদের কথা শেষ করতে না দিয়ে ভদ্রলোক হাঁ-হাঁ ক'রে উঠলেন। বললেন, বাবু সাহেব, সে সবই আমি জানি এবং তারা কেন যে কিছু ক'রে

উঠতে পারে নি তাও জানি। ও-রকম দু-একটা কল কিনে ব্যবসা হয় না। এ সম্বন্ধে আমি জাপান, জার্মানি, আমেরিকা প্রভৃতি জায়গায় চিঠি লিখে ক্যাটালগ আনিয়েছি। সেখানকার অনেক কোম্পানির এজেণ্ট আছে কলকাতা ও বোম্বাই শহরে। তারা বলেছে, কল বসিয়ে আমাদের লোককে শিখিয়ে দিয়ে যাবে। এখনও বাজারে অন্য কেউ আসে নি, আমার বিশ্বাস, এই সময়ে যদি আমরা বাজারে নামতে পারি তো কেল্লা ফতে করতে পারব। আমি ঠিক করেছি, প্রথম দফায় দশ হাজার টাকা ফেলব। এই টাকায় যন্ত্রপাতি কেনা হবে এবং কিছু টাকা অন্যান্য কাজের জন্যে রেখে দেওয়া হবে। ব্যবসা যদি ভাল চলে, ধরুন মাস ছয় পর থেকে এই দশ হাজার টাকার শতকরা সাড়ে বারো টাকা ক'রে সুদ এবং বছরে আড়াই হাজার টাকা ক'রে আমাকে শোধ দিয়ে দিতে হবে। টাকা ক্রমে ক্রমে শোধ হয়ে গেলে তখন লাভের শতকরা পঞ্চাশ টাকা আমার আর পঞ্চাশ টাকা আপনাদের। অবশ্য যতদিন আমার টাকা শোধ না হচ্ছে ততদিন সমস্ত সম্পত্তির মালিক থাকব আমি। অর্থাৎ আপনারা যদি ব্যবসা চালাতে না পারেন, তবে আমি আপনাদের সরিয়ে দিয়ে আবার অন্য লোকের সঙ্গে বন্দোবস্ত করতে পারি কিংবা যন্ত্রপাতি বিক্রয় ক'রে যতখানি সম্ভব আমার টাকা তুলে নিতে পারি। আপনারা এখুনি জবাব দেবেন না—তিন দিন ভেবে দেখুন, তার পরে এই শর্তে যদি রাজী থাকেন তা হ'লে বাবুজীকে অর্থাৎ সত্যদাকে জানিয়ে দেবেন, তা হ'লেই আমি টের পেয়ে যাব।

সেদিন আর কোনও কথা হ'ল না। আমরা সেখান থেকে উঠে অন্য একটা বাড়িতে খেতে গেলুম। শুনলুম, এই বাড়িটাই নাকি জমিদার সাহেবের আসল বৈঠকখানা।

কিছুক্ষণ রহস্যালাপের পর আমাদের খেতে দেওয়া হ'ল।

এর আগে সত্যদার কল্যাণে ও-দেশীয় দু-তিনজন ধনীর বাড়িতে নিমন্ত্রণ খাবার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছিল। বলা বাহুল্য, যাঁরা নিমন্ত্রণ করেছিলেন

তাঁরা সকলেই ছিলেন হিন্দু। লোকের বাড়িতে খেয়ে নিন্দে করতে নেই, তবুও সত্যের খাতিরে বলতে হয় যে, সেই আমিষ-বর্জিত খানা খেয়ে আমাদের তৃপ্তি হ'ত না। তার ওপরে তরকারি, আচার ও মিষ্টি নামে পাতে যা পড়েছিল তা আমাদের রসনায় খুব স্বাদু ব'লে মনে হয় নি। এখানেও সেই রকম আহার্যেরই আয়োজন হয়েছে ব'লে মনে হয়েছিল, কিন্তু দেখলুম আমাদের এই জমিদার সাহেব হিন্দু হ'লেও আহার সম্বন্ধে খুবই উদার ও শৌখিন। দেখা গেল, তিনি আমাদের জন্য ভূরি-ভোজনের আয়োজন করেছেন। ছাগ-মাংসের বিরিয়ানি ও কাবাব, পরোটা ও সুখা মুরগীর মাংস, তা ছাড়া রাবড়ি ইত্যাদি মিষ্টি।

অনেক দিন পরে মাংস পেয়ে তো খুব ঠাসা গেল। খেতে ব'সে নানারকম গালগল্প হতে লাগল। সত্যদা বললেন, বিরিয়ানি জিনিসটি মুসলমানদের আমদানি।

শেঠজী সত্যদার এই কথার ভীষণ প্রতিবাদ ক'রে বললেন, এ জিনিসটি আমাদের শাস্ত্রীয় খাদ্য। আমাদের পুরাতন ধর্মগ্রন্থে এই খাদ্যের উল্লেখ আছে—আপনি খোঁজ ক'রে দেখবেন। হ্যাঁ, তবে 'বিরিয়ানি' শব্দটা হয়তো মুসলমানদের, এ বিষয়ে ঠিক ক'রে কিছু বলতে পারব না।

জমিদার সাহেবের এই উক্তি আমি ভুলি নি। কারণ বিরিয়ানির মতন অমন একটা সুখাদ্য ভারতের বাইরের কোন জায়গা থেকে আমদানি হয়েছে এমন কথা সেই 'স্বদেশী' যুগে শুনে আমাদের দেশাত্মবোধে আঘাত লেগেছিল। তাই কোন্ শাস্ত্রে বিরিয়ানির উল্লেখ আছে সারাজীবন তার খোঁজ করেছি, পাই নি। শেষকালে বিরিয়ানি খাওয়া যখন শরীরে আর সহ্য হয় না, তখন তা আবিষ্কার করেছি। পাঠকদের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্যে এখানে তা উল্লেখ করছি।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য এক স্থানে কি রকম আহারের ফলে কি রকম সন্তান হবে উপদেশচ্ছলে তার অবতারণা করেছেন। এইখানে এক জায়গায় তিনি বলেছেন—অথ য ইচ্ছেৎ পুত্রো মে পণ্ডিতো বিগীতঃ সমিতিঙ্গমঃ

শুশ্রূষিতাং ভাষিত জায়েত সর্বান বেদান অনুব্রুবীত সর্বমায়ুরিয়াত ইতি মাংসৌদনং পাচয়িত্বা সর্পিষ্মন্তম্ আশ্নীয়াতাম্।

অর্থাৎ যদি কেউ ইচ্ছা করেন যে তাঁর পুত্র পণ্ডিত এবং মীটিং-মারায় ওস্তাদ হবে, প্রিয় অথচ মিষ্টভাষী, সর্ববেদে পারদর্শী অর্থাৎ সবজান্তা এবং এর ওপরেও দীর্ঘায়ু হবে, তা হ'লে তিনি মাংসের সঙ্গে চাল ও ঘৃত (ডালদা অথবা ওই জাতীয় কোন স্নেহপদার্থও চলতে পারে) মিশ্রিত ক'রে পাক ক'রে আহার করুন।

এই খাদ্যটি যে আধুনিক বিরিয়ানির পূর্বপুরুষ, তাতে সন্দেহ নেই।

যাই হোক, সেদিন আহারাদির পর একটু গল্পগুজব ক'রে জমিদার সাহেব আমাদের বিদায় দিলেন। বিদায়ের সময় ব'লে দিলেন, আমার প্রস্তাব যদি আপনাদের মনোনীত হয় তা হ'লে বাবুজীকে অর্থাৎ সত্যদাকে জানাবেন, তাঁর সঙ্গে আমার কথা হবে।

ফেরবার সময় সত্যদা বললেন, আর কি, এবার ভগবানের নাম ক'রে ঝুলে পড়।

আমরা বললুম, নিশ্চয়, সে কথা আর বলতে! একেবারে কথা দিয়ে এলেই হ'ত। এমনিতেই তো জিনিসপত্র আনা ইত্যাদিতে দেরি হবেই, তার ওপরে—

আমাদের বাধা দিয়ে সত্যদা বললেন, না হে না, বোঝ না। সব দিক ভাল ক'রে বিবেচনা না করলে শেষকালে পস্তাতে হতে পারে। তোমরাও প্রস্তাবটা নিজেদের মধ্যে আলোচনা ক'রে দেখ, আমিও ভেবে-চিন্তে দেখি।

আমরা মাঝে মাঝে আমাদের আশ্রয়দাতা বাড়িওয়ালা শেঠের বৈঠকখানায় গিয়ে বসতুম। আমরা গেলে ভদ্রলোক ভারি খুশি হতেন এবং অনেক রাত্রি অবধি উঠতে দিতেন না, বাড়িতে ফিরে আবার রান্না-বান্নার হাঙ্গামা করতে হবে ব'লে এক রকম জোর ক'রেই উঠে আসতে হ'ত। পরের দিন আমরা

বাড়িওয়ালার বৈঠকখানায় গিয়ে বসতেই তিনি হাসতে হাসতে বললেন, কাল আপনারা অমুক জায়গায় নিমন্ত্রণে গিয়েছিলেন শুনলুম।

জিজ্ঞাসা করলুম, তাঁকে চেনেন না কি?

—খুব চিনি। সে যে আমাদের আত্মীয় হয়। হঠাৎ সে আপনাদের নেমন্তন্ন করলে কোন্ সুবাদে?

বললুম, তাঁর সঙ্গে মিলে আমরা ব্যবসা করব। সেই সম্পর্কে কথাবার্তা বলতে গিয়েছিলুম।

আমাদের কথা শুনে বাড়িওয়ালা দেখলুম দস্তুরমতন উৎসাহী হয়ে উঠলেন। আমাদের সঙ্গে কি রকম শর্তে সে ব্যবসায় নামতে রাজী হয়েছে, কথায় কথায় সে প্রসঙ্গও এসে পড়ল। সব শুনে ভদ্রলোক বললেন, আপনারা এই শর্তে ব্যবসায় নামতে রাজী হয়েছেন?

বললুম, হ্যাঁ, এক রকম রাজী হয়েছি বইকি।

এবার তিনি বেশ গম্ভীর হয়ে বললেন, বাবুজী, আমি তোমাদের ভালর জন্যেই বলছি, ওর সঙ্গে কোনো ব্যবসা ক'রো না। তোমাদের ভালমানুষ ও অনভিজ্ঞ পেয়ে ও তোমাদের দিয়ে নিজের ব্যবসাটি জমিয়ে নেবার চেষ্টা করছে। এই যে ব্যবসায় ও টাকা দিচ্ছে, তার সুদ নিচ্ছে টাকায় দু আনা ক'রে। ব্যবসা যতই চলুক, আমার বিশ্বাস এত সুদ দিয়ে কোনদিনই তার টাকা শোধ করতে আপনারা পারবেন না। তর্কের খাতিরে যদি ধ'রেই নেওয়া যায় যে, আপনারা সুদ দেবেন আসলও শোধ করবেন; কিন্তু এই সময়টিতে আপনাদের খরচ কি ক'রে চলবে, সে কথা ভেবে দেখেছেন কি? শেষকালে ব্যবসাটি যখন বেশ চালু হয়ে যাবে, তখন টাকা শোধ করতে পারছেন না ব'লে দেবে আপনাদের তাড়িয়ে।

সত্যি কথা বলতে কি, টাকা সম্পূর্ণ শোধ হয়ে যাবার আগে পর্যন্ত আমাদের চলবে কি ক'রে, সে কথাটা আমরা ভাবিই নি। এতদিন পরে একটা কিছু যে জুটল, সেই আনন্দেই একেবারে অভিভূত হয়ে গিয়েছিলুম। তা ছাড়া আমাদের মুরুব্বী সত্যদাও যখন প্রকাশ করলেন যে, তোমাদের বরাত খুবই ভাল, নইলে গায়ে প'ড়ে লোকটা ব্যবসা করতে চাইবে কেন? তখন এই প্রস্তাবের মধ্যে কোনও গলদ থাকতে পারে, তা ধারণাই করতে পারি নি।

কিন্তু সত্যদাকে যখন আমরা ব্যাপারটা খুলে বললুম, তখন তিনিও হাঁ হয়ে গেলেন এবং বললেন, আজই গিয়ে লোকটার সঙ্গে একটা ফয়সাল্লা ক'রে ফেলছি।

ইতিমধ্যে আমাদের বাড়িওয়ালা শেঠ একদিন ডেকে বললেন, তোমরা যদি ব্যবসা করতে চাও তো আমি একটা প্রস্তাব তোমাদের দিতে পারি, তোমরা ভেবে-চিন্তে দেখ।

তিনি বললেন, দিল্লীতে তাঁর একটা বড় বাড়ি আছে, সেখানে আপাতত দশটা মোজা ও দশটা গেঞ্জির কল বসানো যাক। এর জন্যে মূলধন যা লাগে তা তিনি দেবেন। লাভের শতকরা পঞ্চাশ টাকা তিনি নেবেন আর শতকরা পঞ্চাশ টাকা আমরা পাব। পরে ব্যবসা ভাল চলতে থাকলে তিনি আরও টাকা ফেলবেন। এই ভাবে তিনি লক্ষ টাকা ফেলবেন। এর মধ্যে যদি ব্যবসা উঠে যায় কিংবা বিক্রি করতে হয়, তবে দেনা মিটিয়ে উদ্বৃত্ত টাকা [illegible] ভাবে ভাগ ক'রে নেওয়া হবে। আর বরাবর আমাদের তিন জনকে খাবার ও অন্যান্য খরচের জন্যে একত্রে মাসে এক শো টাকা ক'রে দিয়ে যাবেন। ভদ্রলোক বললেন, আপনারা ভেবে-চিন্তে নিজেদের মধ্যে পরামর্শ ক'রে দেখুন।

হাতে চাঁদ পাওয়া আর কাকে বলে! এই প্রস্তাব শুনে তো আমরা একেবারে লাফিয়ে উঠলুম। আমাদের এত দিনকার পাথর-চাপা বরাত যে এবার পাপড়ি বিস্তার করতে আরম্ভ করেছে, সে বিষয়ে একেবারে নিঃসন্দেহ

হওয়া গেল। নিজেদের মধ্যে পরামর্শ ক'রে ঠিক করা গেল যে, আমাদের আশ্রয়দাতা শেঠের প্রস্তাবের কথা সত্যদাকে এখন আর ব'লে কাজ নেই। আগেকার প্রস্তাবটার ফলাফল কি হয়, তাই দেখা যাক। আনন্দের আতিশয্যে সে রাত্রে এক দোকান থেকে কিছু রান্না-মাংস কিনে আনা গেল। কিন্তু একসঙ্গে অত সুখ সহ্য হ'ল না, কারণ ঝালের চোটে সে মাংস মুখে তুলতে পারলুম না। প্রসঙ্গক্রমে একটা কথা এখানে ব'লে রাখি যে, ঝাল খাওয়া সম্বন্ধে পূর্ববঙ্গের লোকের বৃথাই বদনাম হয়েছে—দিল্লী, আগ্রা ও পাঞ্জাবের লোকেরা যা ঝাল খায়, তার কাছে চট্টগ্রামের লস্করদেরও শিশু বলা চলতে পারে।

যা হোক, মাংসের হাঁড়ি আবার কোঁচায় লুকিয়ে বাড়ি থেকে অনেক দূরে এক জায়গায় ফেলে আসতে হ'ল।

পরের দিন সত্যদার ওখানে যেতেই তিনি বললেন, কাল তোমাদের শেঠের ওখানে গিয়েছিলুম। লোকটাকে যত সিধে মনে হয়েছিল মোটেই তা নয়। তোমাদের কথা তুলতেই বললে, এখন ও-সব থাক্, পরে হবে। ব্যাটা ন্যাজে খেলাচ্ছে ব'লে মনে হ'ল।

দিন দুই পরে সত্যদা আবার বললেন, না হে, লোকটাকে যত খারাপ মনে করেছিলুম সে তা নয়। কাল এসে সে বললে—আমি ভেবে দেখলুম, যতদিন না আমাদের কারবারে লাভ হচ্ছে ততদিন বাবুদের জন্যে একটা মাসোহারা ঠিক ক'রে না দিলে তাঁদের দিন চলবে কি ক'রে! আমাকেও তোমাদের এই কারবারে টানবার চেষ্টায় আছে—আজ আমার এক বন্ধু উকিলের কাছে যাব পরামর্শ করতে।

ওদিকে আমাদের বাড়িওয়ালা শেঠ ডেকে বললেন, আমাদের এস্টেটের উকিলকে ব্যবসা সম্বন্ধে লেখাপড়ার একটা খসড়া তৈরি করতে বলেছি। খসড়া তৈরি হ'লে সেটা তোমাদের উকিলকে দেখিয়ে একটা পরামর্শ ক'রে লেখাপড়ার তারিখটি ঠিক ক'রে ফেলা যাবে।

সব দেখে শুনে আমরা তো আনন্দে ক্ষিপ্তপ্রায় হয়ে উঠলুম। জনার্দন আনন্দের চোটে মাতৃভাষায় কথা বলাই ছেড়ে দিলে। সে বলতে লাগল— এবার বরাতসে পাথর হট্ গিয়ে ডেফিনিটলি বরাত খুল্ গিয়া।

আমাদের পাথর-চাপা বরাত যে সত্যিই খুলে গিয়েছে সে সম্বন্ধে সেদিন আমাদের তো কোন সন্দেহই ছিল না—সত্যদা, যিনি সব প্রস্তাবকেই সন্দেহের চোখে দেখতেন, তাঁরও ছিল না। এই জাতক যাঁরা পড়ছেন তাঁদের মনে এ সম্বন্ধে যদি কোনও সন্দেহ জেগে থাকে—এবার তবে তারই নিরাকরণ করি।

কাশী প্রভৃতি ভারতবর্ষের অন্যান্য আরও অনেক শহরের মতন আগ্রা শহরেও বাঁদরের উৎপাত অত্যন্ত বেশি। সমস্ত দিনই পালে পালে বাঁদর ছাতে ছাতে ঘুরছে। ছাতে কিছু রাখবার জো নেই। চাল, ডাল, কাপড়, বড়ি, আচার বা জিনিসপত্র যাই কিছু রাখা হোক না কেন, সেখানে লাঠি হাতে কোনও পুরুষ যদি না থাকে তা হ'লে বাঁদরে তা নষ্ট ক'রে ফেলবেই। মজা এই যে, তারা একজন স্ত্রীলোক বা দু-চারজন বালক-বালিকাকে গ্রাহ্যই করে না—বিশেষ যদি তাদের হাতে লাঠি না থাকে। আমাদের ঘরের সংলগ্ন একটু ছোট ছাত ছিল, কিন্তু বাঁদরের অত্যাচারে সেখানে কিছু রাখবার জো ছিল না। সুকান্ত বাঁদর দেখলেই তাড়া করত—একদিন বাগে পেয়ে সে একটা বাঁদরকে লাঠি দিয়ে এমন মেরেছিল যে, বাঁদরটা দোতলা থেকে রাস্তায় প'ড়ে গিয়ে একেবারে মৃতপ্রায় হয়েছিল। ভাগ্যে কেউ দেখে নি! পাড়ার লোকেরা কিছুক্ষণ হৈ-চৈ ক'রে সকলে বাঁদরের পরিচর্যায় মন দিলে। এত অত্যাচার করা সত্ত্বেও বাঁদরকে মারবার উপায় ছিল না। ওখানকার লোকেরা বলত যে, বাঁদর তো বাঁদরামি করবেই।

একদিন সুকান্ত ভুলক্রমে ঘরের বাইরে জুতো রাখায় এক পাটি জুতো বাঁদরে তুলে নিয়ে দিলে চম্পট। কি আর করা যাবে—একটুক্ষণ দেখে বাঁদরের হাত থেকে জুতো উদ্ধার করা অসম্ভব বুঝে সুকান্তর জন্যে সদলবলে জুতো কিনতে বেরুনো গেল।

আগ্রায় জুতো জামা তখন কলকাতার তুলনায় অসম্ভব রকমের সস্তায় পাওয়া যেত। পাঁচ সিকে দেড় টাকায় যে জুতো পাওয়া যেত, কলকাতায় তার দাম ছিল অন্তত সাড়ে তিন টাকা। সে কথা যাক, আমরা একটা বড় দোকানে ঢুকে নানা রকমের জুতো দেখছি, ট্রায়ার করছি—দোকানে আরও দু-তিনজন খদ্দের এখানে-ওখানে ব'সে জুতো পরছে। আমাদের পাশেই মাথায় গোল টুপি পরা এক ভদ্রলোক জুতো পরীক্ষা করছিল, এমন সময় আমাদের মুখে বাংলা কথা শুনে ফিরে দেখেই ছাড়লে—কেডা রে, ছোট্‌কা নাকি! তুই এখানে কি করশ?

সুকান্ত একমনে জুতো দেখছিল, সে মুখ ফিরিয়ে বললে, কে বাবা, রাশনাম ধ'রে ডাক ছাড়লে!

লোকটি মাথার গোল টুপিটা খুলে বললে, কি রে, আমারে চেনশ না!

সুকান্ত তখনও তার দিকে হাঁ ক'রে চেয়ে আছে দেখে সে বললে, আমি তোর দাদা সন্তোষের বন্ধু রণদা।

সুকান্ত বললে, ও, এবার বুঝতে পেরেছি।

লোকটা আমাদের সঙ্গে গল্প জুড়ে দিলে। সুকান্ত আমাদের ফিসফিস ক'রে বললে, তার দূরসম্পর্কের এক পিসতুতো ভাইয়ের বন্ধু সে। রণদার কথাবার্তায় জানতে পারা গেল যে, বার তিনেক বি. এস-সি. ফেল মেরে এবার তিনি আগ্রা কলেজের মুখোজ্জ্বল করতে এসেছেন।

আমাদের জুতো কেনা হয়ে গেলে রণদাও আমাদের সঙ্গে চলল। কথায়-বার্তায় তাকে বেশ মাইডিয়ার লোক ব'লে মনে হ'ল। সে বলতে লাগল, ভাই, কলকাতা ছেড়ে এই নির্বান্ধব পুরীতে এসে যে কি মুশকিলেই পড়েছি তা আর কি বলব! এমন একটা লোক পাই না যে মাতৃভাষায় দুটো প্রাণের কথা কই। তোমাদের দেখে বড় ভাল লাগল। এখানে কি করতে এসেছ?

সুকান্ত বললে, আমরা বেড়াতে এসেছি। দিন দশেক পরে দিল্লী যাব। সেখানে যা দেখবার তা দেখে কলকাতায় ফিরব।

কথা বলতে বলতে রণদা একেবারে আমাদের বাড়িতে এল। সে খুব আত্মীয়তা দেখিয়ে বলতে লাগল, যে কটা দিন এখানে আছিস, মাঝে মাঝে এসে বিরক্ত করব।

তারপর কিছুক্ষণ ব'সে কলকাতার সব খবরাখবর নিয়ে সেদিনের মতন সে বিদায় নিলে। পরদিন বিকেলবেলা বাড়ি থেকে বেরুবার উদ্যোগ করছি, এমন সময় রণদা এসে হাজির। সে বললে, ওরে ছোট্কা, কাল এখান থেকে ফেরবার পথে আমি সন্তোষকে তার করেছিলুম—ছোট্কারা এখানে রয়েছে, কি করব? আজ সকালে সে টেলিগ্রামের জবাব এসেছে। ব'লে একখানা টেলিগ্রাম আমাদের দিলে। তাতে লেখা আছে—ওদের গ্রেপ্তার কর, আমরা আজই দিল্লী এক্সপ্রেসে রওনা হচ্ছি, পরশু এগারোটায় আগ্রা ফোর্ট স্টেশনে পৌছব, স্টেশনে এসো।

টেলিগ্রামখানি পাঠ ক'রে একেবারে ম্যাড্ হয়ে যাওয়া গেল। প্রথম থেকেই এই রণদা লোকটিকে আমার পছন্দ হয় নি, তার গায়ে-পড়া ভাব দেখে। তার এই সব কাণ্ড দেখে আমার এত রাগ হয়ে গেল যে, আমি আর থাকতে না পেরে ব'লে ফেললাম, আপনি আবার ওস্তাদি ক'রে কলকাতায় তার করতে গেলেন কেন?

নির্লজ্জের মতন হাসতে হাসতে রণদা বললে, তার করব না? তোমরা পলায়ন করার পর থেকে সেখানে কি শুরু হয়েছে জান? মারপিট খুনোখুনি চলেছে প্রত্যহ—কাগজে কাগজে আলোচনা ঝগড়ার আর শেষ নেই। সকলেই বলছে—তোমাদের ছেলেধরায় ধ'রে নিয়ে গিয়ে বলি দিয়েছে। এই সব ব্যাপার আমি আগেই কাগজে পড়েছিলুম। তোমাদের সঙ্গে দেখা হবার অনেক আগেই আমি জানতুম যে, তোমরা বাড়ি থেকে লম্বা দিয়েছ। যা হোক, যা হবার তা তো হয়েই গিয়েছে, এখন ভালয় ভালয় ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও সুড়সুড় ক'রে।

রণদা আমাদের ওখানে ব'সে প্রায় রাত্রি আটটা অবধি আড্ডা দিলে।

যাবার সময় বললে, দেখ, কাল বেলা এগারোটার গাড়িতে ওরা আসছে। আমি এই বেলা দশটা নাগাদ এখানে এসে স্টেশনে নিয়ে যাব তোমাদের। ওরা বোধ হয় জন তিনেক আসছে, তোমাদের এখানে এসেই উঠবে। আগ্রায় আসছে, অন্তত সপ্তাহ খানেক ওদের ধ'রে রাখতে হবে, কি বল ?

আমরা বললাম, নিশ্চয়, নিশ্চয়, সে কথা আর বলতে !

সুকান্ত বললে, কাল তা হ'লে আপনিও আমাদের এইখানেই খাবেন। অত বেলায় আর কোথায় যাবেন—

রণদা বললে, বেশ বেশ, সে ভালই হবে। দেখ, আগ্রা শহরে খুব চমৎকার বালুসাহি (টিক্‌রি) হয়, কিছু আনিয়ে রেখো তো।

বললাম, বেশ, আমাদের চেনা দোকান আছে, সেখানে খুব ভাল বালুসাই তৈরি করে।

রণদা আমাদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে গলির মোড় পেরোতে না পেরোতে সুকান্ত উঠে কম্বলটা পাট করতে আরম্ভ ক'রে দিলে।

—কি হচ্ছে ?

—এই বালুসাহির অর্ডার দিচ্ছি।

তখনকার মত তাকে থামিয়ে পরামর্শ করা গেল, আগে স্টেশনে গিয়ে দেখা যাক, সুবিধা মতন ভাগবার ট্রেন কখন আছে! তখুনি দরজায় তালা দিয়ে স্টেশনে গিয়ে জানলুম, ভোর পাঁচটায় একটা ট্রেন ছাড়বে ভরতপুরের দিকে। ঠিক করা গেল, ওই ট্রেনেই স'রে পড়া যাবে।

স্টেশন থেকে ফিরে এসে বাড়িওয়ালা শেঠকে বলা গেল, বিশেষ একটা গোপনীয় কথা আপনাকে বলব, কিন্তু কারুকে বলবেন না।

বাড়িওয়ালা বললেন, সে কি কথা! গোপনীয় কথা যখন, তখন প্রাণ গেলেও কারুকে বলব না।

বললুম, কলকাতা থেকে আমাদের কাছে এই মাত্র খবর এল যে, আমরা অবিলম্বেই যেন আগ্রা থেকে স'রে পড়ি।

আমাদের কথা শুনে ভদ্রলোকের চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে পড়বার উপক্রম হ'ল। বললুম, উপস্থিত আমরা এলাহাবাদে যাচ্ছি; কিন্তু কোনও লোক, সে পুলিসের হোক আর যেই হোক, যদি আমাদের কথা জিজ্ঞাসা করে তো বলবেন, তারা দিল্লী হয়ে পাঞ্জাবের দিকে যাবে ব'লে গেছে।

ভদ্রলোক বললেন, কোন ফিকির করবেন না, তাই ব'লে দেব।

একটু দম নিয়ে ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন, আপনারা কি আর ফিরবেন না?

—নিশ্চয় ফিরব। কিন্তু কবে ফিরব, তা এখন ঠিক ক'রে বলতে পারছি না। কাল বেলা দশটার গাড়িতে আমরা যাব, ফেরবার সময় হ'লেই আপনাকে জানাব।

দুঃসময়ে আশ্রয় দেওয়ার জন্যে যথেষ্ট ধন্যবাদ দিয়ে শেঠজীর কাছ থেকে বিদায় নিলুম। সেই রাত্রেই একবার পরেশদার খোঁজ নিতে যাওয়া গেল। সেখানে গিয়ে শুনলুম যে, এখনও পর্যন্ত তার কোনও খবর পাওয়া যায় নি। পরেশদার বাড়িওয়ালা বললেন যে, তিনি পুরো এক বছর দেখে তারপর যা হয় করবেন। আবার একবার তাঁকে পরামর্শ দিলুম—যা করবার এখুনি তা ক'রে ফেলতে পারেন, এক বছর অপেক্ষা করবার কিছু দরকার নেই।

সত্যদার কাছে বিদায় নিয়ে যাবার ইচ্ছা হতে লাগল। ভদ্রলোক বিনা স্বার্থে আমাদের জন্যে অনেক করেছেন। কিন্তু তাঁকে জানাতে গেলে হিতে বিপরীত হতে পারে ভেবে সেদিকে আর অগ্রসর হলুম না। সে রাত্রে আর রান্নাবাড়ার হাঙ্গামা নেই। বাজার থেকে খাবার খেয়ে বাড়িতে এসে যখন গা এলিয়ে দেওয়া গেল, তখন বারোটা বেজে গিয়েছে।

সারারাত্রি আধ-ঘুম ও জাগরণেই কাটল। তখন বোধ হয় রাত্রি চারটে, চারিদিক ঘোর অন্ধকার। শেষ রাত্রের শীতে আগ্রা নগরী তখনও সুষুপ্তির কোলে প'ড়ে স্বপ্ন দেখছে, চারিদিক ঘন কুয়াশার জালে আচ্ছন্ন—সেই কনকনে ঠাণ্ডায় আমরা তিনজন রাস্তায় বেরিয়ে পড়লুম।

সেখান থেকে ইষ্টিশান অনেক দূরের পাল্লা। জামা, কাপড়, বালিশ, শতরঞ্চি ইত্যাদি নিয়ে তিনটি বোঁচকা তিন জনের কাঁধে ঝুলছে। বোঝার ভারে হেলে-দুলে সরু সরু গলিপথ দিয়ে আমরা চলেছি কখনও আস্তে, কখনও জোরে, কখনও দৌড়ে—চল্—চল্, পালা—পালা—পূর্বজন্মের কোন্ খাতক কোথায় আত্মগোপন ক'রে আছে, তার কাছ থেকে যতখানি আদায় ক'রে নিতে পারা যায়। কোন্ জন্মের কোন্ মাতৃঋণে বাঁধা আছি কোন্ নারীর সঙ্গে—কোন্ ভাই, কোন্ দাদা, কোন্ বোন কে কোথায় ছড়িয়ে আছে কে জানে, সে বন্ধন অক্ষয়। দৌড়—দৌড়—দৌড়—কোথায় কোন্ সন্তান-শোক-বিধুরা জননী গভীর নিশীথে ব'সে অশ্রুমোচন করছে তার সঙ্গে অশ্রু মেলাতে হবে, চল্—চল্—এরই মধ্যে ধরা পড়লে চলে! জানি, নিশ্চয় জানি, আমার ভাগ্যাকাশে আজ যে মেঘসঞ্চার হয়েছে সৌভাগ্যের অরুণোদয়ে কালই তা অপসারিত হবে। কণ্টকময় অন্ধকার বিপদসঙ্কুল পন্থ বালারুণরশ্মিপাতে আবার ঝলমল ক'রে উঠবে, ভবিষ্যতের আকাশে দিক্‌বধূরা রামধনুর রঙের ওড়না উড়িয়ে আবার হোরিখেলায় মেতে উঠবে, আবার অতর্কিতে যতদিন না অশনি এসে পড়ে। পালা—পালা—দৌড়—দৌড়। অন্ধকারে কখনও মনে হয়, পুলিসে তাড়া করেছে—দূরে কোন গৃহস্থের ঘরে মিটিমিটি প্রদীপ—আমাদেরই মনের আশার মতন কখনও জ্বলছে, কখনও নিবছে—এমনি করতে করতে স্টেশনে এসে দেখলুম, আমাদের ট্রেনখানা দাঁড়িয়ে আমাদেরই মতন ধুঁকছে—টিকিট করবার আর অবসর নেই—একখানা খালি কামরায় ঢুকে 'যা হবার তাই হবে' ব'লে এলিয়ে পড়া গেল।

ভরতপুর স্টেশনে গিয়ে যখন নামলুম, তখনও সূর্যাস্ত হতে প্রায় ঘণ্টা তিনেক দেরি আছে। আমাদের সঙ্গে আরও কয়েকজন যাত্রী নেমে স্টেশনের দরজা পার হয়ে চ'লে গেল। কিন্তু আমাদের কাছে টিকিট নেই ব'লে সেদিকে

না গিয়ে অন্য কোনও রাস্তা দিয়ে স্টেশনের বাইরে বেরুতে পারা যায় কি না তারই ঘোঁৎ-ঘাঁৎ খুঁজতে লাগলুম। কিন্তু বৃথাই আমরা ভয় পেয়েছিলুম, কারণ একটু পরেই বুঝতে পারলুম যে, টিকিট-চেকার ব'লে কোনও লোক সেখানে উপস্থিত নেই। সেই আমাদের প্রথম পাপ ব'লে এত ভয় পেয়েছিলুম। কিছুদিন পরেই জানতে পারলুম, আমরা যাকে পাপ মনে করেছিলুম, সে পাপের প্রচলন ও-অঞ্চলে খুবই বেশি। সে যুগে ও-সব জায়গায় বিনা টিকিটে রেলে যাতায়াত করাকে বিশেষ অন্যায় ব'লে মনে করা হ'ত না। সরকার তার প্রজাদের জন্যে রেল তৈরি ক'রে দিয়েছে, তাতে চ'ড়ে যাতায়াত করব, তা'র আবার পয়সা দেব কি—এই রকম একটা মনোভাব সাধারণ অশিক্ষিতদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। কত লোক যে সে সময় বিনা-টিকিটে রেলে যাতায়াত করত তার আর ঠিকানা নেই। অনেক বিনা-টিকিটের যাত্রীকে রেলের কর্মচারীরা যখন ধরত তখন তাদের মুখ দেখে মনেই হ'ত না যে, টিকিট-কাটার মতন কোন অন্যায় ও অসঙ্গত বিধান সম্বন্ধে তাদের কোনও জ্ঞান আছে। প্রায় ক্ষেত্রেই রেলের লোকেরা বিনা-টিকিটের যাত্রীদের তখনকার মতন কিছুক্ষণ আটকে রেখে শেষে ছেড়ে দিত। সাধু-সন্ন্যাসী অর্থাৎ যাদের অঙ্গে গেরুয়া-বসন অথবা হাতে কমণ্ডলু থাকত, তারা তো খোলাখুলিভাবে জোর ক'রে বিনা টিকিটে যাতায়াত করত। রেলকর্মচারীরা তাদের কাছে টিকিট চাইত না, আর যাত্রীরাও তাদের খাতির ক'রে বসবার, এমন কি শোবার, জায়গা পর্যন্ত ক'রে দিত।

আমরা তো বিনা বাধায় স্টেশনের ফটক পার হয়ে এলুম। সুকান্ত বললে, যা হোক, এতদিনে রেলভাড়া সমস্যার একটা সমাধান হ'ল।

সকাল থেকে আহারাদি কিছুই হয় নি। স্টেশনের হদ্দোর মধ্যেই এক ফেরিওয়ালার কাছ থেকে বগি-থালার মত বড় আর পাতলা চাপাটি এক পয়সায় একটা ক'রে আর এক পয়সায় মহাশের মাছের ইয়া বড় দাগা ও তৎসহ ঝোল কিনে পেট ভ'রে খাওয়া হ'ল। বাড়ি থেকে বেরিয়ে অবধি মৎস্য-মুখ

করা হয় নি। খেতে খেতে জনার্দন বললে, ওরা বোধ হয় এতক্ষণ বালুসাহি খেয়ে দিবানিদ্রা উপভোগ করছে।

জনার্দনের কথায় অনেকক্ষণ পরে প্রাণ ভ'রে হাসা গেল। যা হোক, অনেক কাল পরে পেট ভ'রে স্ব-খাদ্য ও সুখাদ্য খেয়ে পা বাড়ানো গেল অজানার পথে।

শহরের মধ্যে ঢুকে দেখলুম, সমস্ত জায়গাটা যেন থমথম করছে—নির্জীব, প্রাণহীন—শীতে যেন সব কুঁকড়ে গেছে। পথে অত্যন্ত ধূলো, লোকজন যা দু-একটা চলছে তাদের মাথা থেকে পা অবধি ধূলোয় ধূসরিত। লোকগুলো বেশ লম্বা-চওড়া, দেখলেই মনে হয় শক্তিমান। প্রায় সকলেই মাথা মুখ পেঁচিয়ে থুত্‌নি দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে সাদা কাপড়ের পাগড়ি বেঁধেছে—অবিশ্যি পাগড়ির কাপড় সাদা কোনকালে ছিল, এখন ধূলি-মলিন। কারুর পায়ে ছেঁড়া জুতো, এত ছেঁড়া যে তাকে আর জুতো বলা চলে না। বাড়িগুলোও সব ধূলোয় আচ্ছন্ন, উঁচু বাড়ি নেই বললেই হয়, বাড়িগুলোর অবস্থাও খারাপ। বাড়িগুলোর ওপরে এমন ধূলোর প্রলেপ পড়েছে যে, সেগুলো ইটের না পাথরের তৈরী তা বোঝাই মুশকিল। বড় বড় আকাশচুম্বী গাছ, তাদেরও ওই দুর্দশা —পাতাগুলো সব শুকনো ধূলোমাখা, ডালগুলোর অবস্থাও তাই। পথে দু-চারটে ছাগল দেখতে পাওয়া গেল, আকারে ও প্রকারে তারা আমাদের দেশের ছাগলের চেয়ে বড়, দুধও বোধ হয় দেয় বেশি, কিন্তু দেহ তাদের ধূলোয় ধূসরিত। আগেই বলেছি, চলতে চলতে মনে হতে লাগল, জায়গাটা যেন ধূলো মেখে কুঁকড়ি-সুঁকড়ি মেরে প'ড়ে রয়েছে। বেলা তখন সাড়ে তিনটে কি চারটে হবে, কিন্তু তখনই মনে হ'ল যে পুরবাসীরা দোরতাড়া লাগিয়ে সব শুয়ে পড়েছে। ধর্মশালার খোঁজে খানিকটা ঘুরে বেড়ালুম, কিন্তু খুঁজে পেলুম না। দু-একজনকে জিজ্ঞাসা ক'রেও কিছু সন্ধান করতে পারলুম না। তারা কি যে বললে, কোন্ ভাষায় বললে, তাও বোধগম্য হ'ল না। মনে হতে লাগল, আচ্ছা জায়গায় এসে পড়েছি যা হোক!

এদিকে বোঁ-বোঁ ক'রে বেলা প'ড়ে আসতে লাগল, তখনও মাথা গোঁজবার জায়গা ঠিক করতে পারলুম না, ওদিকে বোঁচকা বইতে বইতে প্রাণান্ত হবার উপক্রম।

এমনি ক'রে ঘুরতে ঘুরতে প্রায় শহরের প্রান্তে এসে পড়া গেল। এক জায়গায় দেখলুম, একটা বড় ভাঙা একতলা বাড়ির সামনে গোটা তিন-চার দড়ির খাটিয়া প'ড়ে আছে। গোটা পাঁচ-ছয় কুকুর তাদের অসংখ্য বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে কাছেই শুয়ে ছিল, আমাদের দেখে তারা চেঁচাতে আরম্ভ ক'রে দিলে। কুকুরগুলোর কিছু দূরেই একটা লোক সেই রকম পাগড়িতে মাথা-মুখ ঢেকে কতকগুলো ছাগলের বাচ্চাকে ধ'রে দাঁড়িয়ে ছিল। তারই অদূরে দেখলুম, আর একটা লোক একটা বড় ছাগলের দুধ দুইছে—আর এক পাশে কয়েকটা ধাড়ী ছাগল মিলে এক আঁটি শুকনো ঘাস নিয়ে টানাটানি করছে।

আমাদের দেখে কুকুরগুলো চেঁচিয়ে উঠতেই যে লোকটা ছাগলের বাচ্চাগুলোকে ধ'রে ছিল, সে সচকিত হয়ে ফিরে কটমট ক'রে আমাদের দেখতে লাগল। আমরা দাঁড়িয়ে ভাঙা বাড়িটা দেখছি—প্রকাণ্ড দরজা, তার পেছনে বিরাট ধ্বংসস্তূপ প'ড়ে রয়েছে একেবারে পাহাড়ের মতন উঁচু—ইতিমধ্যে যে লোকটা দুধ দুইছিল সে উঠে দাঁড়াতেই এ লোকটা বাচ্চাগুলোকে ছেড়ে দিলে। এবারে বুঝতে পারা গেল, যে ছাগল দুইছিল সে স্ত্রীলোক। দুধের পাত্রটা নিয়ে সে সম্মুখের সেই প্রকাণ্ড দরজা দিয়ে ভেতরে গেল, আর এ লোকটা এগিয়ে এসে আমাদের জিজ্ঞাসা করলে, তোমাদের দেশ কোথায়?

—আগ্রা শহরে।

কিছুক্ষণ আমাদের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ ক'রে লোকটা আবার জিজ্ঞাসা করলে, এখানে কি চাই?

বললুম, আমরা এখানে নতুন এসেছি, ধর্মশালা খুঁজে বেড়াচ্ছি। ধর্মশালা কোথায় বলতে পার?

লোকটা আবার একবার বেশ ক'রে আমাদের দেখে বললে, এই তো ধর্মশালা—এইখানে থাকতে পার।

জিজ্ঞাসা করলুম, এই ধর্মশালার মালিক কি তুমি ?

সে বললে, হ্যাঁ।

—তোমার নাম কি ?

—রামসিং।

বললুম, কোথায়, ঘর দেখাও তো।

সে আমাদের ডেকে সামনের সেই প্রকাণ্ড ভাঙা ঘরে নিয়ে গেল। মাঠের মতন বড় ঘর। দেড়শো দুশো বছর আগে সেখানে হয়তো কোনও রাজদপ্তর ছিল, কারণ বাস করবার জন্যে মানুষ অত বড় ঘর কখনও বানায় না। ঘরের দেওয়ালের মাঝে মাঝে গর্ত। কোনও গর্ত পাথর, কাঠ, পাতা ইত্যাদি দিয়ে ভরাট করবার চেষ্টা করা হয়েছে, কোনও গর্ত এমনিই হাঁ হয়ে আছে। শেয়াল, বাঘ, নেকড়ে, গরু, মোষ ও যে হাতী হস্তীমূর্খ নয় সেও কায়দা ক'রে অনায়াসে সে গর্ত দিয়ে ঘরের বাইরে যাতায়াত করতে পারে। ঘরের এক দিকে দুটো দড়ির খাটিয়া, তার ওপর কতকগুলো ছেঁড়া ময়লা ন্যাকড়া প'ড়ে আছে। এদিক ওদিক হাঁড়ি-পাতিলের মতও কিছু কিছু জিনিস ছড়ানো রয়েছে। বোঝা গেল, এগুলি সব রামসিং-দম্পতির সম্পত্তি। কিন্তু সেই মান্ধাতার আমলের ধূলোর ওপর কি ক'রে শোওয়া যাবে জিজ্ঞাসা করায় রামসিং বললে, খাটিয়া দিতে পারি, রোজ এক পয়সা ক'রে ভাড়া লাগবে। অর্থাৎ ধর্মশালার জন্যে এক পয়সা, খাটিয়ার জন্যে এক পয়সা—একুনে তিন জনে ছ-পয়সা। আমরা বললুম, ধর্মশালার জন্যে ভাড়া দেব না, খাটিয়ার জন্যে তিনজনে দৈনিক তিন পয়সা দিতে পারি। দেখ, রাজী থাক তো বল ?

লোকটা সোজা ব'লে দিলে, না, হবে না।

আমরা চ'লে আসছি দেখে রামসিংহিনী রুখে উঠল, কোথায় যাচ্ছ ?

—দেখি, অন্য কোথাও জায়গা পাওয়া যায় কি না!

সে জিজ্ঞাসা করলে, তোমরা কত বলছ ?

—আমরা বলছি খাটিয়া সমেত জনপ্রতি রোজ এক পয়সা ক'রে দেব।

—বেশ, তাই দিও। ব'লে সে বাইরে গিয়ে দু হাতে দুখানা রৌদ্রতপ্ত খাটিয়া তুলে নিয়ে এসে ঘরের মধ্যে এক জায়গায় রেখে বললে, শুয়ে পড়।

এরই মধ্যে শুয়ে পড়ব কি! তবু যা হোক বোঁচকাগুলো নামিয়ে একটু হালকা হওয়া গেল। ইতিমধ্যে আর একখানা খাট এসে পড়ল। কিন্তু সেগুলোতে কি ধূলো রে বাবা! যত ঝাড়ি তত পড়ে। শেষকালে আর চেষ্টা না ক'রে তিনখানা খাট ঠেকাঠেকি ক'রে তার ওপরে শতরঞ্চি বিছানো গেল। এক-একটা ধুতি পেতে চাদর করা গেল। রামসিংকে বললুম, আমরা বাইরে চললুম, খেয়ে দেয়ে সন্ধ্যের মধ্যেই আসব।

রামসিং কোনও কথা বললে না। তার গিন্নী বললে, রাত্তিরে রাস্তা দেখতে পাবে না, হারিয়ে যাবে। খেয়ে দেয়ে অন্ধকার হবার আগেই ফিরে এসো।

সেখান থেকে বেরিয়ে ঘুরে ফিরে শহরটাকে ভাল ক'রে দেখে বেড়াতে লাগলুম। আগ্রা, এলাহাবাদ, কাশী, পাটনার তুলনায় ভরতপুরকে শহরই বলা চলে না। এর অনেক দিন পরে আর একবার ভরতপুরে যাবার সুযোগ হয়েছিল। আগের চেয়ে শহরের অনেক উন্নতি হয়েছে দেখলুম বটে, কিন্তু সেই সময়ের মধ্যে অন্যান্য শহরেরও অনেক উন্নতি হয়েছে, কাজেই তুলনায় তার মাপ সমানই আছে।

একটু ঘোরাফেরা করতে না করতেই অন্ধকার হয়ে আসতে লাগল আর সেই সঙ্গে শীত পড়তে লাগল দারুণ। আমাদের অঙ্গে পরেশদার দেওয়া সেই ধোশা ছিল। আগ্রায় কোনও রকমে তার দ্বারা শীত নিবারণ হ'ত, কিন্তু এখানে সন্ধ্যেবেলাতেই সেই ধোশা ভেদ ক'রে ঠাণ্ডা যেন গায়ে বিঁধতে লাগল। রাস্তায় আলোর ব্যবস্থা দেখতে পেলুম না, তাই সূর্যের আলো থাকতে থাকতেই এক রকম ছুটে আমাদের সেই ডেরায় ফিরে এলুম। জায়গাটা একেই নির্জন

ছিল, সে সময় একেবারে যেন খাঁ-খাঁ করছিল। বাইরে কুকুর ছাগল কিছুই নেই, দরজায় একটা চটের পর্দা ঝুলছে, কারণ কপাটের বালাই নেই। কাঁপতে কাঁপতে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়া গেল।

ঘরের মধ্যে সেই প্রায়ান্ধকারে যতদূর দৃষ্টি চলে তার মধ্যেই দেখতে পেলুম যে, সেখানে ছোটখাট একটি চিড়িয়াখানা তৈরি হয়েছে। এক দিকে সিংহ ও সিংহিনী দুটো খাটে প'ড়ে রয়েছে, তাদের আপাদমস্তক শতছিন্ন ময়লা কাপড়ে ঢাকা। বোধ হয় গোটা পঁচিশেক কুকুর স্থানে স্থানে কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমুচ্ছে। ধাড়ী ছাগলগুলো বড় বড় পাথরের সঙ্গে দড়িতে বাঁধা, বাচ্চাগুলোকেও একটু দূরে তেমনই ক'রে বেঁধে রাখা হয়েছে। ধাড়ী বাচ্চা সবাই ঘোর নিদ্রায় অভিভূত। আমরাও পা টিপে টিপে খাটের কাছে গিয়ে নিঃশব্দে শুয়ে পড়লুম।

ঘরের মধ্যে ক্রমেই অন্ধকার ঘনিয়ে উঠতে লাগল। দেওয়ালের বড় বড় গর্ত দিয়ে দেখতে লাগলুম বাইরে তখনও স্বল্প আলো আছে। তার ভেতর দিয়ে সেই বিরাট উঁচু-নীচু ধ্বংসস্তূপ দেখা যেতে লাগল। সেই ধ্বংসস্তূপের ওপরে বড় বড় গাছ লতা জন্মেছে। ক্রমে সেই নিস্তব্ধ বনস্থল ধীরে ধীরে মুখর হয়ে উঠতে লাগল। ঝিঁঝি পোকা ও অন্য কি সব রাতপাখির অদ্ভুত চীৎকারে সমস্ত জায়গাটা ভয়াবহ হয়ে উঠতে লাগল। ক্রমে ধীরে ধীরে বাইরের আলোটুকু নিবে গেল।

আগের দিন রাতে ঘুম না হ'লেও সেদিন ট্রেনে প্রায় সব সময়টা ঘুমিয়ে কাটিয়েছিলুম। তা ছাড়া সন্ধ্যেবেলায় ঘুমোনো কোনদিনই অভ্যেস নেই। তার ওপর সেই অজানা শহর, অদ্ভুত আশ্রয় ও বিচিত্র পরিবেশ, এর মধ্যে নিদ্রাদেবীর মতন বেপরোয়া ব্যক্তিও প্রবেশ করতে ভরসা পান না। কাজেই সেই অন্ধকারে চোখ চেয়ে প'ড়ে প'ড়ে ভাবতে লাগলুম হাজার রকমের ভাবনা। কিন্তু প্রাণ খুলে যে চিন্তা করব তারই জো আছে কি! অন্ধকার হওয়ার সঙ্গে শীত বাড়তে লাগল। এমন সাংঘাতিক শীত আগ্রাতে

একদিনও ভোগ করতে হয় নি। তার ওপরে দেওয়ালের সেই বড় বড় ফুটো দিয়ে হু-হু ক'রে বাতাস ঢুকতে লাগল ঘরের মধ্যে। শীতে খালি এ-পাশ ও-পাশ ক'রে গরম হবার চেষ্টা করছি আর ভাবছি, সৃষ্টিকর্তা যদি পশুপক্ষীদের মতন মানুষের অঙ্গেও শীতাতপ থেকে বাঁচবার জন্যে কোনও আবরণ দিতেন, তা হ'লে এই কষ্টভোগ আর করতে হ'ত না। এমন সময়ে সেই অন্ধকার ভেদ ক'রে জনার্দনের কণ্ঠ থেকে ঋষভ রাগে বেসুরো প্রস্রবণ ছুটল—"আমায় কোথায় আনিলে—আনিয়ে, তরঙ্গমাঝে তরী ডোবালে!"

জনার্দনের গান শুনে হাসব কি কাঁদব তাই ভাবছি, এমন সময় সুকান্ত বললে, বৎস জনার্দন, ধৈর্য ধর, তরী তরঙ্গমাঝারে পড়েছে মাত্র, ডুবতে এখনও দেরি আছে।

কিন্তু কে কার কথা শোনে! জনার্দন এক মুহূর্ত চুপ ক'রে থেকে আবার ষাঁড়-চ্যাচানি চেঁচাতে আরম্ভ করলে, "কোথা রইল পিতা মাতা, কোথা রইল বন্ধু ভ্রাতা—আমার প্রাণপ্রিয়ে রইল কোথা বন্ধু সকলে"—ব'লে এমন এক তান ছাড়লে যে কুকুরগুলো জেগে উঠে ধমকের সুরে 'চোপ্, চোপ্, চুপ রহো' ক'রে চেঁচাতে লাগল, ছাগলগুলো শুরু করলে ব্যা-ব্যা, ওদিক থেকে মৃদু সিংহনাদও শোনা যেতে লাগল।

চারিদিক থেকে ওই রকম প্রতিবাদ হতে থাকায় জনার্দন চুপ করল বটে, কিন্তু শীত তো আর সহ্য হয় না। শীতের চোটে শুয়ে থাকা আর সম্ভব হ'ল না। আগ্রায় রাতে আমরা মোমবাতি জ্বালাতুম, কয়েকটা মোমবাতি সঙ্গেও ছিল। তাড়াতাড়ি উঠে একটা মোমবাতি জ্বালিয়ে কুঁকড়ে-সুঁকড়ে বসলুম। জনার্দন তো শীতের চোটে সশব্দে হি-হি করতে লাগল। শেষকালে সেই কম্পিত গলায় আবার সে গান ধরলে। তখুনি তার মুখে হাত চাপা দিয়ে থামিয়ে দেওয়া গেল। জনার্দন বলতে লাগল, ভাই, শীতের চোটে তো মারা গেলুম, তোরা দুজনে আমাকে জড়িয়ে ধর্।

সুকান্ত বললে, উনি আবার তিব্বতে যেতে চাইছিলেন!

এমনি ক'রে হাসাহাসি করতে করতে এবার বাতি নিবিয়ে শুয়ে পড়া গেল। কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলুম জানি না, একবার ঘুম ভেঙে যেতে দেখলুম, দূরে রামসিংয়ের খাটের কাছে একটু ছোট্ট আলো জলছে। দেখলুম, রামসিংয়ের বউ দুটো ভাঙা হাঁড়িতে দুটো আগুন ক'রে তাতে বাতাস দিচ্ছে। কিসের আগুন তা বুঝতে পারলুম না, তবে সিংহিনীর হস্ততাড়িত বাতাস লাগার ফলে সেই ভাঙা হাঁড়ির গহ্বরপ্রদেশ লাল হয়ে উঠতে লাগল ও সঙ্গে সঙ্গে সেই জায়গাটা ধোঁয়ায় ভ'রে যেতে লাগল। খানিক পরে আগুন বেশ লাল হয়ে উঠলে সিংহিনী একটা সিংহের খাটের নীচে ও একটা নিজের খাটের নীচে রেখে কোনও কথা না ব'লে আলোটা নিবিয়ে দিলে। অন্ধকারে সেই ভাঙা হাঁড়ির আগুন জলতে নিবতে লাগল আর আমি শুয়ে শুয়ে গোপাল ভাঁড়ের গল্পের সেই ব্রাহ্মণের মতন চোখ দিয়ে আগুন পোয়াতে লাগলুম।

পরদিন সকালবেলা উঠে দেখা গেল, আমাদের সবারই মুখগুলো ফুলে ঢোল হয়ে উঠেছে, শুধু তাই নয়, হাত পা ফেটে একেবারে চৌচির অবস্থা। দেশসুদ্ধ লোক মাথা-মুখ ঢেকে থাকে কেন, এতক্ষণে তার একটা হদিস পাওয়া গেল। আমরা আর কালবিলম্ব না ক'রে বিছানা থেকে ধুতি তুলে নিয়ে বেশ ক'রে মাথা-মুখ পেঁচিয়ে বেঁধে ফেললুম।

সকাল হতেই দেখা গেল, দলে দলে স্ত্রী পুরুষ নানা আকারের পাত্র নিয়ে রামসিংয়ের দরজায় হাজির হতে লাগল। দেখলুম, কর্তা গিন্নী উভয়ে খুবই ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। একজন দুধ দোয় আর একজন মেপে মেপে দেয়। শুনলুম সেখানে ছাগলের দুধ ও মোষের দুধের একই দর—ছ পয়সা সের। যাদের ছেলেপিলের ঘর তারা ছাগলের দুধই নেয়।

কিছুক্ষণ এই সব ব্যাপার দেখে আমরা চরা করতে বেরুলুম। শহরে ঘুরতে ঘুরতে মনে হ'ল, কাল জায়গাটাকে যত দুঃখী মনে করেছিলুম আসলে সেটা তত নয়। সেখানে ভাল রাস্তা ভাল বাড়ি ঘর যে একেবারেই নেই তা নয়।

সেখানে একটি কেল্লা আছে, জবরদস্ত রাজা, রাজপুত্র ও রাজকর্মচারী সবই আছে, তবে বেশির ভাগ লোকের অবস্থাই আমাদের মতন।

শহরে ঘুরতে ঘুরতে অনেক জায়গাতেই দেখা গেল ছাগলের দুধ বিক্রি হচ্ছে। আমাদের জনার্দনের নানা রকম ব্যবসার প্ল্যান মাথায় গজাত। সে থেকে থেকে বললে, এখানে থেকে ছাগলের দুধের ব্যবসা করা যাক।

জনার্দন নানা রকম প্ল্যান বাতলাতে লাগল, ছাগল থেকে গরু, গরু থেকে মোষ, বাচ্চা যা হবে তার মদ্দাগুলো বেচে ফেলা হবে। তারপরে দুধ থেকে মাখন, পনির ইত্যাদিও হতে পারবে—হাথ্‌ হাথ্‌ ক'রে ব্যবসা ফলাও হয়ে পড়বে।

জনার্দনের প্ল্যানটা আমাদের নেহাত মন্দ লাগল না। আশাকুহকিনী আবার কানের কাছে গুঞ্জন শুরু ক'রে দিলে।

আমরা স্টেশনে যে দোকানে রোজ খেতে যেতুম, সেই দোকানে চা বিক্রি হ'ত। একদিন তাকে জিজ্ঞাসা করা গেল, তুমি কোথা থেকে দুধ কেন?

সে বললে, এখান থেকে মাইল তিনেক দূরে শহরের এক জায়গা থেকে।

—আচ্ছা, আমরা যদি রোজ তোমায় এখানে দুধ দিয়ে যাই, তবে আমাদের কাছ থেকে নেবে?

লোকটা বললে, চায়ের জন্যে আমরা ছাগলের দুধ নিই—ও-জন্যে ছাগলের দুধই ভাল। আমাদের সারা দিন-রাতে পাঁচ সেরেরও বেশি দুধের দরকার হয়।

আমরা বললুম, তাই দেব, কিন্তু নগদ দাম দিতে হবে।

লোকটা রাজী হয়ে গেল। সে বললে, তোমাদের আরও খদ্দের যোগাড় ক'রে দিতে পারি।

লোকটার কথা শুনে আমরা খুব উৎসাহিত হলুম। ভাবলুম, সত্যিই ছাগলের দুধের ব্যবসা করলে তো মন্দ হয় না। আমরা ব'সে ব'সে তার সঙ্গে এই সম্বন্ধে আরও অনেক আলোচনা করতে লাগলুম। কোথায় ভাল ছাগল পাওয়া যায়—কোথাও ঘর ভাড়া পাওয়া যায় কি না, ইত্যাদি আরও অনেক কথা হ'ল।

দিন দুয়েক আলোচনা ক'রে এই দোকানদারের কাছ থেকে অনেক সন্ধান পাওয়া গেল। সে বললে, স্টেশনের কাছেই একটা খোলার বাড়ি খালি ছিল, সেটা পেলে তোমাদের ছাগল রাখাও চলবে, থাকাও চলবে। অনেকখানি খোলা জায়গাও আছে সেখানে। সেটা এখনও খালি আছে কি না তার খোঁজ করতে হবে।

আবার উৎসাহ ও আশায় বুক দশ হাত হয়ে উঠল। আমরা ব'সে থাকবার ছেলে নয়—মোজা-গেঞ্জির কারবার ফেল হয়ে গেছে ব'লে কি জীবনে হতাশ হয়ে ব'সে থাকতে হবে! দুধের কারবার ক'রে বড়লোক হয়েছি শুনলে

হয়তো অনেকে নাক সিঁটকোবে—তা সিঁটকোক গে, আমরা তাদের গ্রাহ্য করি না। ব্যবসায়ে ছোট বড় নেই, এই ক'রেই তো বাঙালী জাতটা গেল।

সেদিন তাড়াতাড়ি ফিরে রামসিংয়ের স্ত্রীকে বললুম, দেখ, রাত্রে তো শীতের চোটে ঘুমুতে পারি না; আমাদের জন্যে একটা ক'রে আঙেঠি জ্বালিয়ে দিতে পার?

সে বললে, একটা তো সারারাত্রি জ্বলবে না—তোমাদের একটা ক'রে দিচ্ছি, রাত্রে যখন শীত অসহ্য হবে তখন উঠে জ্বালিয়ে নিও।

সে তিনটে ভাঙা হাঁড়িতে শুকনো ছাগলের নাদি ভ'রে দিলে। দেখলুম, ঘরের এক দিকে পাহাড়ের সমান উঁচু ছাগলের নাদি জমা ক'রে রাখা হয়েছে—একটি নাদি তারা নষ্ট হতে দেয় না। সারা বছর ধ'রে নাদি জমা হয়।

এবার তাকে জিজ্ঞাসা করলুম, তোমার নাম কি?

সে বললে, সুরয।

জিজ্ঞাসা করলুম, সুরয কি? তোমায় কি ব'লে ডাকব? সুরযবাই?

সে একটু লজ্জিত হয়ে বললে, হ্যাঁ, ওই নামেই ডেকো—সুরযবাই।

একটু পরে সুরযবাই বললে, আঙেঠির জন্যে একটা ক'রে পয়সা দিতে হবে।

শীতের ঠেলায় পয়সা দিতে রাজী হতে হ'ল। সেই হরে-দরে দৈনিক ছ-পয়সা ক'রেই লাগতে লাগল।

স্টেশনের সেই দোকানদার খবর দিলে, সেই বাড়ির বাড়িওয়ালা এখানে নেই, দিনকতক পরে আসবে—তবে বাড়িটা এখনও খালি আছে।

যা হোক, আমরা অন্য বাড়িও দেখতে লাগলুম। ছাগলও দু-চারটে দেখা গেল, দরদস্তরও চলতে লাগল। স্টেশনের কাছের বাড়িটার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলুম। কারণ স্টেশনের একজন হকারের সঙ্গে ঠিক হয়েছিল যে, সে কিছু কমিশন নিয়ে যাত্রীদের গরম দুধ বিক্রি করবে।

যাত্রীদের দুধ বিক্রি করতে পারলে খুব লাভ হয়। কারণ এক সের দুধে এক সের জল মিশিয়ে রঙটা শুধু সাদা রাখলেই হয়। দুধটা এমন গরম করতে হবে যে, স্টেশনে যতক্ষণ গাড়ি থাকবে ততক্ষণ গরমের চোটে খদ্দের তা মুখে দিতে পারবে না। তারপরে গাড়ি ছেড়ে দিলে আর কি! ছাগল ও বাড়ি দেখার সঙ্গে এই সব ব্যবসার মারপ্যাঁচও শেখা চলতে লাগল।

রামসিং ও তার স্ত্রীর সঙ্গে একটু একটু ক'রে ভাব হতে লাগল। অতি দরিদ্র তারা, কিন্তু এক সময়ে নাকি তাদের পূর্বপুরুষেরা রাজা ছিল। একদিন এখানে তাদের প্রকাণ্ড প্রাসাদ ছিল। সেই প্রাসাদেরই অবশিষ্ট একমাত্র এই ভাঙা ঘরে রাজবংশের শেষ স্ত্রী-পুরুষ বাস করছে। তাদের এখনও কিছু জায়গা-জমি আছে, কিন্তু অর্থ ও লোকের অভাবে সে জমি নিজে চাষ করতে পারে না। অন্য লোকে চাষ ক'রে তাদের দয়া ক'রে যা দেয় তাই নিতে হয়। তারা স্বামী-স্ত্রীতে মিলে খেটে এই দুধের ব্যবসা করে। তাও যদি ছাগলগুলোকে ভাল ক'রে খেতে দিতে পারত তো দুধ কিছু বেশি পাওয়া যেত। কিন্তু তারা নিজেরাই পেট ভ'রে খেতে পায় না। সকালবেলা এক-একজনে থান-ষোলো ক'রে মোটা রুটি নুন দিয়ে খায়, তার সঙ্গে একটা কি দুটো পিঁয়াজ জুটল তো ভূরি-ভোজন হয়ে গেল। বিকেলেও তাই, তবে কোন কোন দিন ওরই মধ্যে এক-আধ ফোঁটা দুধ জুটে যায়। খাদ্য অতি সামান্য, অথচ মোটা না হ'লেও তাদের চেহারা ছিল বিরাট। আমরা ভাবতুম, এই সামান্য খাদ্যে তাদের পুষ্টি হয় কি ক'রে!

রামসিং ও তার স্ত্রী, তারা দুজনেই ছিল স্বল্পভাষী। নিজেদের মধ্যেও তারা খুব কমই কথাবার্তা বলত। সকালবেলা সেখানে অনেক খদ্দের এসে জুটত বটে, কিন্তু তাদের সঙ্গেও যতদূর সম্ভব কম কথা কইত তারা। সকাল থেকে স্বামী-স্ত্রীতে যে যার বাঁধা কাজ ক'রে যেত। তার পরে বিকেল হতে না হতে খাওয়া-দাওয়া চুকিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে কাপড় চাপা দিয়ে দ্যুগান্ত ঘুম।

একদিন সকালবেলা উঠে এক আশ্চর্য দৃশ্য দেখা গেল। দেখলুম যে, রামসিং ও সুরযবাইয়ের মধ্যে খুব কথাবার্তা চলেছে। সুকান্ত ঠাট্টা ক'রে বললে, আজ যে সিংহ-সিংহিনীতে খুবই প্রেমভাব দেখছি!

তারা নিজেদের মধ্যে এক অদ্ভুত ভাষায় কথা বলত, যার একটি বর্ণও আমরা বুঝতে পারতুম না। দুজনে খুব কথা চলেছে দেখে আমরা তো বেরিয়ে পড়লুম। বিকেল নাগাদ ফিরে দেখি, তারা তখনও যে যার খাটে ব'সে উচ্চৈঃস্বরে প্রেমালাপ করছে। রামসিং মাঝে মাঝে শুয়ে পড়ছে আবার উঠছে—এই রকম প্রায় ঘণ্টাখানেক চলল, তার পরে দুজনেই কাপড় চাপা দিয়ে শুয়ে পড়ল। অন্য দিন ফিরে এসে বরাবর দেখেছি, তারা দুজনেই ঘুমুচ্ছে।

কিছুক্ষণ বিড়ি-টিড়ি টেনে আমরাও শোবার ব্যবস্থা করতে লাগলুম। সেখানে এসে অবধি আমাদেরও সন্ধ্যার আগেই শুয়ে পড়া অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। বিছানাপত্তর ঝাড়া হচ্ছে এমন সময় আবিষ্কার করা গেল, সেদিন সুরযবাই প্রেমালাপে মত্ত থাকায় আমাদের আঙ্গেঠিগুলোতে ইন্ধন দেয় নি। নিজেরাই আঙ্গেঠি ভ'রে নিয়ে শুয়ে পড়া গেল।

রাত্রি কত হয়েছিল তা বলতে পারি না, জনার্দন জোরে ধাক্কা দিয়ে আমার ঘুম ভাঙিয়ে বললে, ওঠ্, ওঠ্, শীগগির ওঠ্।

ধড়মড় ক'রে উঠে দেখি, সিংহ ও সিংহিনীতে যুদ্ধ শুরু হয়েছে। অন্য দিনের মতন সেদিকে একটা বাতি জ্বলছে, আর স্বামী-স্ত্রীতে নিঃশব্দে মারপিট চলেছে। স্বামী স্ত্রীকে প্রহার করছে—সে দৃশ্য এর আগেও দেখেছি এবং সেইটেই শাস্ত্রসম্মত ব'লে এতকাল জেনে এসেছিলুম, কিন্তু এখানে যা দেখলুম তা অভূতপূর্ব। দুজনেই—একে অন্যকে ঘুষো, কিল, চড়, লাথি লাগিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু মুখে কোনও শব্দ নেই। বোধ হয় আমরা ঘরে রয়েছি ব'লে কেউ টুঁ শব্দটি করছে না। ঘুষোঘুষি, ঠুস্সা-ঠাস্সা চলতে চলতে হঠাৎ একবার সুরযবাই তার শোবার খাটখানা তুলে ঝেড়ে দিলে স্বামীর মাথার ওপরে। সে

আঘাত বাঁচাতে গিয়ে রামসিং নিজের খাটে পা লেগে গেল প'ড়ে। যাহাতক সে প'ড়ে যাওয়া, অমনি কুস্তিগীরের তৎপরতায় সুরযবাই লাফিয়ে পড়ল তার ওপর। কাছেই একটা বড় পাথর প'ড়ে ছিল, সেখানা সে তুলে নিয়ে রামসিংয়ের মাথায় দমাদ্দম ক'রে মারতে শুরু ক'রে দিলে। শীতের চোটে আমাদের শরীরে কাঁপন তো ধ'রেই ছিল, এই দৃশ্য দেখে তার সঙ্গে ভয়ের কাঁপনও এসে যোগ দিলে। মনে হতে লাগল, সকালবেলায় এদের একটার সঙ্গে আমাদেরও তো থানায় টেনে নিয়ে যাবে। তারপরে দিশী রাজ্যের কাজীর বিচারে এই সূত্রে চরম দণ্ড হয়ে যাওয়াও বিচিত্র নয়।

ওদিকে স্বামীর মাথায় সুরয পাথর ঠুকেই চলেছে। ভাগ্যে তার মাথায় মোটা ক'রে কাপড় জড়ানো ছিল, তা না হ'লে তার খুলিটি বোতলচুরে পরিণত হ'ত। চোখের সামনে যখন এই খুনোখুনি অথবা কে খুন হয় কাণ্ড চলেছিল, তখন আমার পুরুষের মন এই প্রার্থনা করতে লাগল যে, খুন যদি একটা দেখতেই হয় তবে নারীর হাতে পুরুষের কাত হওয়ার দৃশ্য যেন দেখতে না হয়। পুরুষের এত বড় অপমান সারা জীবন ধ'রে ব'য়ে বেড়ানো বড়ই দুর্বহ হবে।

ওদিকে সিংহিনী ক্ষিপ্রহস্তে সিংহের মস্তকচূর্ণের কাজে ব্যস্ত, এমন সময় রামসিং কি ক'রে ঠিকরে বেরিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে সুরযও উঠে যেমনি পাথরটা ছুঁড়ে তাকে মারতে যাবে, অমনি রামসিং টপ ক'রে তার হাতখানা ধ'রে অন্য হাত দিয়ে সুরযের গলাটা চেপে ধ'রে তাকে দেওয়ালের দিকে ঠেলে নিয়ে চলল। মেঝেতে কুকুরগুলো নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমুচ্ছিল—এ রকম দৃশ্য দেখে দেখে বোধ হয় তাদের গা-সওয়া হয়ে গিয়েছিল। ইতিমধ্যে সেই হুটোপুটিতে কার একখানা পা একটা কুকুরের পেটে পড়তেই সেটা ক্যাঁক ক'রে একবার চেঁচিয়ে উঠেই আবার অন্য জায়গায় গিয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে পড়ল। ওদিকে রামসিং সুরযকে ঠেলতে ঠেলতে দেওয়ালে নিয়ে গিয়ে ঠেসে ধ'রে গায়ের জোরে মুখে দশ-বারোটা ঘুষো মারতেই সুরযের দীর্ঘ ঋজু

দেহ স্যানবেলে হয়ে দড়াম ক'রে মাটিতে প'ড়ে গেল। তার পড়বার ধরন দেখে মনে হ'ল, সে ম'রে গেল।

সুরয তো ওই রকম ভাবে প'ড়ে রইল। রামসিং সেদিকে গ্রাহ্য না ক'রে বেশ নিশ্চিন্ত মনে ইতস্ততবিক্ষিপ্ত জিনিসগুলোকে গুছোতে আরম্ভ করলে। সুরযের খাটিয়াখানা এক পাশে আকাশের দিকে চার পা তুলে প'ড়ে ছিল। রামসিং সেখানা তুলে স্বস্থানে ঠিক ক'রে রেখে নিজের খাটে গিয়ে মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল।

প্রদীপটা সেইভাবে জ্বলতে লাগল।

ব্যাপার দেখে আমরা তো স্তম্ভিত! এর পর আঙেঠি জ্বালানো ঠিক হবে কি না তাই পরামর্শ করতে লাগলুম। জনার্দন বললে, আর আঙেঠি জ্বালিয়ে কাজ নেই, কারণ রামসিংয়ের যা মেজাজ হয়ে আছে, ধোঁয়া নাকে গেলে কি হবে বলা যায় না। কাল সকালে পুলিসের লোকেরা রামসিংয়ের সঙ্গে আমাদের কোমরেও দড়ি বেঁধে কেমন ক'রে রাস্তা দিয়ে নিয়ে যাবে—সেই দৃশ্যটা মনের পটে আঁকবার চেষ্টা করতে লাগলুম।

সুকান্ত বললে, তারপরে আমরা তিনটিতে এক নারীহত্যার ব্যাপারে জড়িত হয়েছি—খবরটা কাগজে প'ড়ে বাড়ির লোকে কি গ্ল্যাডই হবে!

—কিন্তু যেতে দাও, ভবিষ্যতের গর্ভে যা আছে তাই ঘটবে, এখন তো শুয়ে পড়।

রাত্রে ওই সার্কাস দেখে পরের দিন ঘুম থেকে উঠতে দেরি হয়ে গিয়েছিল। বাইরে বেরিয়ে এসে দেখি, ঠিক অন্য দিনেরই মত দুধের খদ্দেরে জায়গাটা ভর্তি। সুরয দুধ দুইছে, আর রামসিং মেপে মেপে দুধ দিচ্ছে। রামসিংয়ের দিকে চেয়ে দেখলুম, তার মুখ ও কপালের দুই-এক জায়গায় কালশিরে পড়েছে—মুখের বাকিটা দাড়িগোঁফ ও কাপড়ে ঢাকা।

সুরযের মুখখানা দেখবার ইচ্ছা করছিল, কিন্তু সে এমন ক'রে মাথা গুঁজে দোহন-কার্যে ব্যস্ত ছিল যে, ভাল ক'রে দেখাই গেল না। যাক বাবা! সে

যে প্রাণে বেঁচে আছে—এই আমাদের ভাগ্য মনে ক'রে দৈনিক চারণের কাজে বেরিয়ে পড়া গেল।

সেদিন কি একটা কাজে আহারাদির পরে বাসস্থানে ফেরবার প্রয়োজন হয়েছিল। ফিরে এসে দেখি যে, রামসিং তার খাটে এক দিকে পা ঝুলিয়ে বসেছে আর সুরয তার কোলে মাথা রেখে শুয়ে আছে, রামসিং তার মাথার উকুন বাছছে। দৃশ্যটি দেখে সত্যিই চোখ জুড়িয়ে গেল। ঝড়ের পরে প্রকৃতির শান্ত অবস্থা একেই বলে। কাল যে সুরয পরমানন্দে স্বামীর মাথা চুর করতে ব্যস্ত ছিল, আজ সে পরম নির্ভরে তারই কোলে মাথা পেতে দিয়েছে। কাল ছিল তারা পশুর পর্যায়ে, আজ তারা মানুষের পর্যায়ে উঠে গেছে। আর একদিন দেখেছিলুম তাদের অন্য রূপ—সে ঘটনাটি ব'লেই তাদের কথা শেষ করব।

সুরয ও রামসিং যে রাত্রে খুনোখুনি ক'রে মরছিল, তারই কয়েক দিন পরের কথা। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে দেখা গেল, চারদিকে খুব মেঘ জমেছে, রোদের দেখা নেই, মাঝে মাঝে ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টিও পড়তে লাগল। বাইরে বেরিয়ে মনে হতে লাগল, শীতে যেন হাত-পা অসাড় হয়ে যাচ্ছে—একটু একটু ঠাণ্ডা বাতাসও বইছিল। নেহাত খাওয়ার জন্য স্টেশনে যেতেই হবে, তাই আমরা সেই ঠাণ্ডাতেই অগ্রসর হতে লাগলুম। পথে লোক-চলাচল বিশেষ দেখলুম না। স্টেশনে গিয়ে শুনলুম যে, শীতকালে নাকি এখানে এই রকম হয়ে থাকে—এই রকম হাওয়াই নাকি ভাল, তা না হ'লে শস্যের অপকার হবে। তারা বললে, শীত এ আর কি দেখছ! আরও বাড়বে। মাঝে মাঝে এই সময় নাকি এমন ঝড়-বৃষ্টি হয় যে, লোকে ঘর থেকে বেরুতে পারে না।

শীতের ঠেলায় আমাদের মনে হতে লাগল, শস্যের উপকার করতে গিয়ে দেবতা এই যে মানুষ মারবার ব্যবস্থা করেছেন—এটা বিশেষ বিবেচনার কাজ হয় নি। যা হোক, স্টেশনে আহারাদি সেরে আমরা বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে

ও শীতে শীৎকার সহযোগে কাঁপতে কাঁপতে বাসস্থানে ফিরে এলুম। ভিজে পরদা ঠেলে ঘরের মধ্যে ঢুকে দেখি, সেই বেলাবেলিই রামসিং ও সুরয তাদের সংসার-পাট সব ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে ফেলেছে। ছাগলদের ধাড়ী বাচ্চা সব বাঁধা হয়ে গেছে—অন্য দিন কুকুরগুলো এদিক ওদিক চ'লে যায় খাদ্য অন্বেষণে, কিন্তু সেদিন দুর্যোগ দেখে এরই মধ্যে ডেরায় ফিরে এসে তারা যে যার জায়গায় কুণ্ডলী পাকিয়েছে।

দেখলুম রামসিং খাটে ব'সে তার বিরাট হাতের চেটোয় গাঁজা ডলছে, আর সুরয তাদের আঙ্গেঠি দুটোতে আগুন জ্বালাবার চেষ্টা করছে। আমরা হি-হি করতে করতে ধুতি জামা বদলে ঘরের মধ্যেই ছাড়া কাপড়গুলো শুকোতে দিয়ে খাটে ব'সে কাঁপতে লাগলুম। ওদিকে রামসিং গাঁজা সেজে আঙ্গেঠি থেকে একটু আগুন তুলে কল্‌কেতে দিয়ে লাগালে দম—বাবা! ঘর একেবারে অন্ধকার হয়ে গেল। গোটা দু-তিন দম লাগিয়ে সে কল্‌কেটা সুরযকে দিলে। সেও যে দম লাগালে তাকেও রামদম বলা যেতে পারে। তারপর ফাঁকা কল্‌কেটা স্বামীর হাতে দিয়ে দুজনের খাটের নীচে দুটো আঙ্গেঠি ঠেলে দিয়ে দুই খাটে ব'সে তারা গল্প করতে লাগল।

ওদিকে আমাদের অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হয়ে উঠতে লাগল। ভাবতে লাগলুম, দিনেই যখন এই অবস্থা তখন রাত কাটবে কি ক'রে! উঠে গিয়ে সুরযকে বললুম, দেখ, আমাদের বড় শীত করছে, দিনের বেলায় আঙ্গেঠি জ্বালাব?

সুরয বললে, হ্যাঁ হ্যাঁ, জ্বালিয়ে নাও না।

আমি ফিরে আসছিলুম, এমন সময় সে বললে, আমি জ্বেলে দেব আঙ্গেঠি?

দেখলুম, তার মেজাজটা খুবই শরীফ রয়েছে। বললুম, দাও না দয়া ক'রে।

সুরয আমাদের আঙ্গেঠিগুলো তুলে নিয়ে এল। আমি নিজের খাটের কাছে যাচ্ছি এমন সময় রামসিং বললে, দেখ, আগুন জ্বালিয়ে কাঁহাতক শরীর গরম রাখবে? তার চেয়ে এক কাজ কর।

—কি কাজ ?

—কিছু গাঁজা আনিয়ে নাও। শীত যখন অসহ্য হবে তখন মাঝে মাঝে গাঁজায় দম লাগাবে—শরীর একেবারে গরম হয়ে উঠবে।

ফিরে এসে বন্ধুদের কাছে রামসিংয়ের প্রস্তাব পেশ করা গেল। পরামর্শ চলল—শেষকালে গাঁজা খাব! না না বাবা, মাথা-টাথা খারাপ হয়ে শেষে পাগল হয়ে রাস্তায় নেচে নেচে বেড়াতে হবে!

আমি আর রামসিংয়ের কাছে ফিরে গেলুম না। একটু বাদে সুরয তিনটে আঙেঠি ভ'রে এনে দিলে। আমরা তাতে আগুন ধরিয়ে নিজের নিজের খাটের নীচে রেখে ঠিক তার ওপরেই উবু হয়ে ব'সে আগুন তাপতে লাগলুম। কিন্তু ছাগলের নাদির আর তেজ কতটুকু! কষ্টে-সৃষ্টে ঘণ্টাখানেক তাপ বিকিরণ ক'রেই সেগুলি ভস্মে পরিণত হ'ল। এই ভাবে শীত চললে রাত্রে কি অবস্থা হবে ব'সে ব'সে তাই ভাবছি, এমন সময় রামসিং—যে এতক্ষণ মাথা-মুড়ি দিয়ে পড়েছিল, সে ধড়মড় ক'রে উঠে ব'সে আবার গাঁজা তৈরি করতে আরম্ভ ক'রে দিলে। সুরযবাই এতক্ষণ এদিক ওদিক কি ক'রে বেড়াচ্ছিল, শুভকার্যের সূচনা দেখে সে গুটিগুটি স্বামীর পাশে এসে বসল। কিছুক্ষণ বাদে রামসিং কল্‌কেতে গাঁজা ঠেসে সেটাকে টানবার জন্যে বাগিয়ে ধরলে, আর সুরয উঠে তাতে দেশলাই জেলে আগুন দিতে লাগল।

আমরা হাঁ ক'রে তাদের এই কসরৎ দেখছি, এমন সময় কোথাও কিছু নেই আমাদের জনার্দন টপ্‌ ক'রে উঠে কোনও কথা না ব'লে তাদের কাছে চ'লে গেল। সেখানে পৌঁছে সে সুরযকে কি জানি বললে। সুরয তার মুখের দিকে চেয়ে দেশলাইটা তার হাতে দিতেই সে একটা কাঠি জালিয়ে রামসিংয়ের করধৃত কল্‌কের ওপরে ধরতেই রামসিং মারলে টান—তারপরেই মুখ দিয়ে বার করলে রাশিকৃত ধোঁয়া। এর পর রামসিং কল্‌কেটা দিলে জনার্দনের হাতে। জনার্দনও বিনা দ্বিধায় সেটাকে বাগিয়ে ধ'রে টান মেরে প্রায় রামসিংয়ের মতনই আর এক রাশ ধোঁয়া বের ক'রে কল্‌কেটা সুরযের হাতে দিলে।

এই ভাবে পালা ক'রে টেনে টেনে তারা তিনজনে মিলে সেই ক্ষুদ্রকায়া কল্‌কে থেকে একটি মেঘলোক সৃষ্টি ক'রে তার মধ্যে ব'সে রইল।

বাইরে তখন প্রবল ধারায় বৃষ্টি চলেছে—সঙ্গে সঙ্গে হাওয়া, সে ঝড়েরই নামান্তর।

আমি ও সুকান্ত ব'সে ব'সে তাদের দেখতে লাগলুম। প্রথমে কিছুক্ষণ তারা তিনজনেই স্থির হয়ে ব'সে রইল। তার পরে জনার্দন উঠে সুরযের খাটে গিয়ে বসল। একটু পরেই সুরয এসে বসল তার পাশে। শেষে তারা তিনজনে কি সব কথাবার্তা বলতে লাগল। হিন্দী উর্দু বলতে পারে না ব'লে এতদিন জনার্দন রামসিং কিংবা সুরয কারুর সঙ্গেই কথা বলত না। এখন দেখলুম, গাঁজার কল্যাণে সে হাত নেড়ে তাদের সঙ্গে খুব কথা বলছে। জনার্দনের কথাগুলোও বৃথা যাচ্ছে না, কারণ তার কথা শুনে কখনও সুরয হাসছে, কখনও রামসিং হাসছে। রামসিংয়ের পোড়ার মুখে আমরা এতদিন কখনও হাসি দেখি নি। সেই রামসিংয়ের মুখে হাসি দেখে মনে মনে জনার্দনকে তারিফ ক'রে তাকে ডাক দিলুম।

জনার্দন কাছে আসতেই বললুম, কি রে, গাঁজা খেলি শেষকালে?

জনার্দন বললে, কি করব! শেষকালে কি শীতে মারা যাব নাকি? গাঁজা গ্র্যাণ্ড জিনিস রে! এই দেখ্, আমার আর কিচ্ছু শীত লাগছে না।

এই ব'লে জনার্দন গায়ের কাপড়খানা খুলে ছুঁড়ে খাটে ফেলে দিয়ে বলতে লাগল, শীত তো লাগছেই না, তা ছাড়া যা চোখে পড়ছে তাই সুন্দর ব'লে মনে হচ্ছে। মাইরি, তোরাও এক এক টান খেয়ে দেখ্।

গাঁজা খাওয়ার বিরুদ্ধে আমাদের মনে প্রথমে যত প্রবল আপত্তিই থাকুক না কেন, জনার্দন কল্‌কে ধ'রে টান মারতেই তার প্রাবল্য অনেকখানি ক'মে গিয়েছিল। তারপর জনার্দনের যুক্তি ক্রমেই আমাদের আপত্তির ভিত টলিয়ে দিতে লাগল। শেষকালে যখন সে বললে, আমরা তো আর নেশা বা ফুর্তি

করবার জন্যে খাচ্ছি না, শীত থেকে রক্ষা পাবার জন্যে কম্বল কেনবার পয়সা নেই, তাই গাঁজা খেয়ে শীত নিবারণ করছি, স্রেফ প্রাণের দায়ে—

বাস্, আর বেশি যুক্তির প্রয়োজন হ'ল না। এখন গাঁজা পাওয়া যায় কোথায়? এই শীত ও জল-ঝড়ের মধ্যে সে জিনিস আহরণই বা করবে কে!

জনার্দন বললে, সে আমি সব ঠিক ক'রে দিচ্ছি।

সে আবার রামসিংয়ের কাছে গিয়ে তাকে কি সব ব'লে আমাদের কাছে এসে বললে, দু আনা পয়সা দাও।

পয়সা নিয়ে গিয়ে রামসিংয়ের হাতে দিতে সে মাথায় গায়ে ভাল ক'রে কাপড় জড়িয়ে নিয়ে সেই জল-ঝড়ে গাঁজা কিনতে বেরিয়ে গেল।

জনার্দন আর আমাদের কাছে ফিরল না, সে ওদিকেই র'য়ে গেল। আমরা ব'সে ব'সে দেখতে লাগলুম, গাঁজা খেয়ে তার কর্মপটুতা যেন বেড়ে গেছে। সে সুরযের সঙ্গে নানা কাজ ক'রে ক'রে ঘুরতে লাগল। শুধু তাই নয়, দেখলুম, তার সঙ্গে জনার্দনের হাসি-ঠাট্টাও চলেছে। কিছুক্ষণ পরে সুরয ছাগল দুইতে আরম্ভ করলে আর জনার্দন ছাগলের বাচ্চা ধ'রে রইল। তাদের বাক্যালাপও খুব চেঁচিয়ে হচ্ছিল বটে কিন্তু ঘরখানা এত বড় যে, এক দিকে কিছু বললে অন্য দিকে আওয়াজ শোনা যায় মাত্র, তার ওপরে বায়ু ক্রমেই অসম্ভব রকমের ক্ষিপ্ত হয়ে উঠছিলেন ব'লে তাদের কথা আমরা কিছুই বুঝতে পারছিলুম না।

এইভাবে কিছুক্ষণ কাটবার পর বাইরের ঝড় যেন আরও উদ্দাম হয়ে উঠতে লাগল। আমাদের সেই জায়গাটা ছিল শহরের এক প্রান্তে। বাড়ি-ঘর বেশি না থাকায় স্থানটি একটু জংলী গোছের। ঘরের দু দিকের দেওয়ালে খুব বড় বড় ফুটো গর্তের কথা আগেই বলেছি। সেই ফুটো দিয়ে এখন কামানের মতন গর্জন করতে করতে হাওয়া ও জল ঘরে ঢুকতে আরম্ভ করলে। ক্রমে ক্রমে শীতও হয়ে উঠতে লাগল অসহ্য। মেরুপ্রদেশ ছাড়া শীতকালে সমতল ভূমিতেও যে এমন দুর্যোগ হতে পারে তা আমাদের জানা ছিল না। হা-পিত্যেশ ক'রে আর কতক্ষণ গাঁজার আশায় ব'সে থাকব? ভাবছি, প্রাণটা

থাকতে থাকতে রামসিং এখন ফিরে এলে হয়! এদিকে একটা একটা ক'রে সুরয চার-চারটে ছাগল দুয়ে ফেললে। তার পরে একটা বড় আঙেঠি জেলে তার ওপরে দুধ-ভর্তি পেতলের একটা বড় লোটা বসিয়ে সেটাকে নিজের খাটের নীচে রাখলে—তারপরে সে আর জনার্দন পা তুলে খাটে ব'সে রইল।

সেই যুগল মূর্তি দেখতে দেখতে আমাদের দুঃসময় কাটতে লাগল।

খানিকক্ষণ বাদে রামসিং ছুটতে ছুটতে এসে হাজির হ'ল।

এতক্ষণে এলি বাপ!—ব'লে আমরাই ছুটে তার কাছে এগিয়ে গেলুম। দেখলুম, বৃষ্টিতে তার সর্বাঙ্গ ভিজে গিয়েছে, বেচারী শীতে ঠক্‌ঠক্ ক'রে কাঁপতে লাগল। তাড়াতাড়ি ক'রে সে জামাটা খুলে ফেলে মাটিতে ব'সে প'ড়ে জলন্ত আঙেঠি থেকে দুধের গরম ঘটিটা নামিয়ে আগুন পোয়াতে আরম্ভ ক'রে দিলে। মিনিট পাঁচেক আগুন পোয়াবার পর সে ট্যাঁক থেকে একটা কাগজের মোড়ক বার ক'রে সুরযের হাতে দিয়ে বললে, তৈরি কর্।

সুরয কাগজের মোড়কটা খুলে তার কুলোর মত হাতের চেটোয় কিছু মাল তুলে নিয়ে ডাঁটি বিচি ইত্যাদি ফেলে দিয়ে সেগুলোকে কুচি-কুচি ক'রে ছিঁড়ে তাতে কয়েক ফোঁটা জল দিয়ে বুড়ো আঙুল দিয়ে টেপাটেপি আরম্ভ ক'রে দিলে। তারপরে বিধিমতে পেষণ ও কর্তন ইত্যাদির পালা শেষ হয়ে গেলে কল্‌কেতে ঠেসে আমাদের দিকে এগিয়ে দিয়ে সুরয বললে, নাও—পিও।

সে কি কথা! তুমি এত কষ্ট ক'রে তৈরি করলে, আগে তুমি টান।

আমাদের অনুরোধে সুরয সলজ্জ বধূর মত একটু হেসে লজ্জিত হয়ে কামানটিকে বাগিয়ে ধরলে, আর আমরা ওপর থেকে দেশলাই মারতে লাগলুম। সুরযের পর আমার ও সুকান্তের হাতে-খড়ি হ'ল। প্রথম সেবকের পক্ষে আমরা ভালই উতরে গেলুম।

প্রথম ছিলিমে আমাদের দু টান ক'রেও হ'ল না। রামসিং অনুমতি চাইলে, শীতে কালিয়ে গিয়েছি, একটা বড় ক'রে কল্‌কে সাজব?

—নিশ্চয়, নিশ্চয়। অত কিন্তু হচ্ছ কেন ভাই?

অবিলম্বে দ্বিতীয় ছিলিম তৈরি হ'ল। আরও তিনটি ক'রে টান মেরে নেশায় বুঁদ হয়ে গেলুম।

নেশার প্রথম দিন, ঠিক যেন ফুলশয্যার রাত্রি। সে অনুভব করা যায় মাত্র, তার আর ব্যাখ্যা করা চলে না। দুনিয়ার রঙই গেল বদলে। সেই ভাঙা ঘরখানাকে মনে হতে লাগল—যেন দেওয়ান-ই-খাস। দড়ির ঝোলা খাটকে মনে হতে লাগল—তখ্‌ত্‌-এ-তাউস্‌। রামসিং, সুরয ও আমাদের মধ্যে যে জাতি, ধর্ম, সংস্কার ও শিক্ষার প্রাচীর ছিল তা ধোঁয়ার ফুৎকারে কোথায় মিলিয়ে গেল। মনে হতে লাগল, এই দুনিয়ায় তারাই আমাদের পরম বন্ধু। সাম্যবাদকে যাঁরা গাঁজাখুরি ব্যাপার ব'লে থাকেন—তাঁদের কথা যে একেবারে অসত্য নয়, তার প্রমাণ আমরা ব্যক্তিগত জীবন থেকে দিতে পারি। সরাব ও সিদ্ধির নেশার অভিজ্ঞতা ইতিপূর্বে হয়েই গিয়েছিল, এইবার গাঁজায় হাতে-খড়ি হ'ল।

যাঁরা যোগ-যাগ ক'রে থাকেন এমন অনেকের মুখেই শুনেছি যে, আমাদের এই দৃশ্যমান জগতের মধ্যেই এবং এর অতীতে আরও কয়েকটি জগৎ আছে—অনেকে এগুলিকে বলেছেন, সূক্ষ্মজগৎ। সাধনার পথে অগ্রসর হতে হতে যোগী এই সব জগৎ দেখতে পান। কিন্তু গাঁজার গুণে এই দৃশ্যমান জগৎই সেবকের চোখে অন্য রূপে ধরা দেয়। অরূপকে দেখে সে রূপময়, নির্গুণকে দেখে গুণময়। অসুন্দর তার চোখে সুন্দররূপে ধরা দেয়। অমন যে জাঠের মেয়ে সুরযবাই—আমাদের চেয়ে মাথায় আধ হাত উঁচু—যার চলনে ফেরনে বলনে কখনও কোন সময়ে একটু মাধুর্যের লেশ চোখে পড়ে নি, তাকেই সুন্দরী ও মাধুর্যময়ী ব'লে মনে হতে লাগল—ধন্য গাঁজা, তুয়া গুণ কহই না পার।

একটুখানি খোশগল্প ও হাসাহাসি চলবার পর রামসিং আবার আগের মতন মাথায় কাপড় মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল। সুরয গাঁজার মোড়কটা আমাদের হাতে দিয়ে শুয়ে পড়বার যোগাড় করছিল, কিন্তু আমরা তাকে শুতে না দিয়ে এক রকম টেনেই নিয়ে গেলুম আমাদের খাটের কাছে।

চারজন মুড়ি-ঝুড়ি দিয়ে বেশ জমাটি হয়ে ব'সে গল্প শুরু ক'রে দেওয়া গেল। কিছুক্ষণ থেকে বাতাসের সেই উদ্দাম ভাব ক'মে গিয়ে চেপে বৃষ্টি নেমেছিল। সুরয বলতে লাগল, এই বৃষ্টিতে এখানকার শস্যের খুব ভাল হবে।

আমরা বললাম, শস্যের ভাল হ'লে আর তোমাদের কি লাভ বল? তোমরা তো আর চাষবাস কর না।

সুরয বললে, আমরা চাষ নাই বা করলুম, যারা করবে তাদের তো ভাল হবে। তা ছাড়া আমাদের যে জমিতে অন্য লোক চাষ করে, তারা বেশি শস্য পেলে আমরাও তো তার ভাগ পাব।

চাষবাস জমি-জায়গার কথা হতে হতে সুরয আবার আগের মতন গম্ভীর বিষণ্ণ ও মৌন হয়ে পড়ল। আমাদের সামনের দেওয়ালে সেই প্রকাণ্ড গর্ত দিয়ে বাইরে দেখা যাচ্ছিল—বিরাট ভগ্নস্তূপ, ছোট বড় নানা আকৃতির ঢিপি—যত দূর দৃষ্টি চলে। তার ওপরে রাজ্যের জঙ্গল জন্মেছে। বড় বড় গাছ বেয়ে লতা উঠেছে, তাতে নানা রঙের ফুল ধরেছে। আবার অনেকখানি জায়গায় গাছপালা শুকিয়ে গেছে। আমরা এসে অবধি দেখেছি, এই ভগ্নস্তূপে, এমন কি উঁচু উঁচু গাছের ডগা অবধি ধুলোর আস্তরণে ঢাকা। বৃষ্টিতে সেই আবরণ ধুয়ে গিয়ে জঙ্গলের এক নতুন রূপ আমাদের চোখের সামনে ফুটে উঠতে লাগল।

সেই ভগ্নস্তূপের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে আমাদের মৌন সুরয আবার মুখর হয়ে উঠল। সে বলতে লাগল—এই যে ভাঙা বাড়ি দেখা যাচ্ছে—একদিন, সে বোধ হয় তিন-চার শো বছর আগে হবে, ছিল এক বিরাট প্রাসাদ। তারা ছিল এই অঞ্চলের রাজা। প্রাসাদ যেমন বড় দেখছ, ঐশ্বর্যও তাদের কম ছিল না। হাতী ঘোড়া, গরু মহিষ, দাস দাসী, সৈন্য সামন্ত সবই ছিল, কিন্তু সে সবই ধীরে ধীরে চ'লে গিয়েছে—সেই বিরাট প্রাসাদের মধ্যে এই ভাঙা ঘরখানি মাত্র অবশিষ্ট আছে। আর সেই রাজবংশে বাতি দিতে আছি ওই রামসিং আর আমি। ছাগলের দুধ বেচে জীবিকা নির্বাহ করছি, তাও দু-বেলা পেট ভ'রে অন্ন জোটে না।

বলতে বলতে সুরযের চক্ষু সজল হয়ে উঠল। তাকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে বললাম, দুঃখ ক'রো না। আমরা শুনেছি ভারতবর্ষের সম্রাটের বংশধরেরা আজ রেঙ্গুনে দপ্তরীগিরি করছে, চিরদিন সমান যায় না।

সুরযকে জিজ্ঞাসা করলুম, তুমিও কি এই রাজবংশেরই মেয়ে?

সুরয বললে, হ্যাঁ। কয়েক পুরুষ আগে আমরা এই ভাঙা বাড়ি ছেড়ে দিয়ে রাজপুতানায় গিয়ে বাসা বেঁধেছিলুম। কিন্তু এই জঙ্গলের সঙ্গে জনমে জনমে বাঁধা প'ড়ে আছি, যাব কোথায়! রামসিংয়ের বাপ তার ছেলের সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়ে এখানে নিয়ে এল—আমার স্বামী ও আমি, আমরা একই বংশের ছেলে মেয়ে।

গল্প বলতে বলতে সুরয বেশ একটা করুণ আবহাওয়া সৃষ্টি করলে। সে আবার শুরু করলে, আমাদের শিরায় রাজরক্ত বইছে—বলতে গেলে আমরা রাজার মেয়ে ও রাজার ছেলে, আজ ছাগলের দুধ বেচে জীবনযাত্রা নির্বাহ করছি।

প্রসঙ্গটা বদলে ফেলবার জন্যে বললুম, আচ্ছা, তোমরা কখনও ওই ভগ্নস্তূপের মধ্যে গিয়েছ?

সুরয উদাসভাবে বললে, যাই, দরকার পড়লে যেতে হয় বইকি।

বললুম, কি সর্বনাশ! ওই জঙ্গলের মধ্যে আবার দরকার কিসের?

সুরয একটু হাসবার চেষ্টা ক'রে বললে, যখন ছাগলের দুধ থাকে না, দু-বেলা দুখানা ক'রে রুটিও বন্ধ হয়ে যায়, তখন আমরা স্বামী স্ত্রীতে চ'লে যাই ওই জঙ্গলের ভেতরে, আমাদের বজ্রুগ্‌দের কাছে—তারা যা দেয় তাই-দিয়েই দিন চলে তখন।

বলে কি রে বাবা! তখন নেশার শেষ অবস্থা, একটু ঘুম-ঘুম লাগছিল, শরীরটা আলস্যে ভেঙে পড়ছিল, কিন্তু সুরযের এই শেষ কথাটা যেন কেমনধারা লাগল। চমকে উঠে জিজ্ঞাসা করলুম, তার মানে? ওর ভেতর গুপ্ত ধন-টন আছে নাকি?

স্বরষ বললে, আরে, সে তো আছেই। আমাদের পুরুষানুক্রমে সঞ্চিত ধন ওইখানে পোঁতা আছে। পূর্বপুরুষেরা ম'রে যাবার পর দেও হয়ে সেই সব ধন আগলাচ্ছে। আমরা ম'রে গেলে আমাদেরও সেই কাজ করতে হবে। কারও সাধ্য নেই সেই সব টাকাকড়ি-জহরতে হাত দেবার। তা হ'লে তৎক্ষণাৎ সেই ব্যক্তির মৃত্যু হবে। কত লোক, কত চোর-ডাকাতের দল যে সেই সব গুপ্তধনের সন্ধানে ওখানে গিয়েছে তার ঠিক-ঠিকানা নেই, কিন্তু কেউ কিছুই পায় নি। যারা সন্ধান পেয়েছে, দেওরা তাদের মেরে ফেলেছে—ওখানে গেলে দেখতে পাবে চারিদিকে সেই সব মৃত মানুষের কঙ্কাল ছড়ানো রয়েছে।

—তবে! কি ধন তোমরা আনতে যাও ওখানে?

স্বরষ বললে, আমাদের প্রাসাদের সবটাই কিছু পাথর দিয়ে তৈরি ছিল না, তার মধ্যে কাঠের দরজা জানলা কড়ি বরগাও ছিল। যক্ষরুগেরা সেই সব কড়ি বরগা দরজা জানলা এখনও পর্যন্ত সযত্নে রেখে দিয়েছেন। দুঃখের দিনে আমরা স্বামী-স্ত্রীতে মিলে সকালবেলা কুড়ুল হাতে ক'রে চ'লে যাই ওই গহন রহস্যের মধ্যে। খুঁজে খুঁজে বড় দেখে একখানা কড়ি সারাদিন ধ'রে দুজনে মিলে চেলা ক'রে সেই সন্ধ্যেবেলা নিয়ে ফিরে আসি—পরদিন বাজারে সেই কাঠ বিক্রি ক'রে আবার যতদিন চলে—আবার যাই, আবার নিয়ে আসি—এমনি ক'রেই তো আমাদের দিন চলে। ছাগলের দুধ বিক্রি ক'রে বা তোমাদের মতন যাত্রী রেখে বছরের আর কটা দিনই বা চলে?

জিজ্ঞাসা করলুম, আচ্ছা, ওখানকার কাঠের সন্ধান আর কেউ জানে না?

—জানে বইকি। কিন্তু সে সব জায়গা এমন ভয়ানক ও দুর্গম যে লোকে যেতে সাহস করে না। তা ছাড়া সে সব কাঠ তো আমাদের সম্পত্তি। বড় বড় সাপ জড়িয়ে আছে সে সব কাঠে। তারা সব দেও, আমাদেরই পূর্বপুরুষদের লোকজন। পাপ-কাজ করেছিল ব'লে সাপ হয়ে আমাদেরই সম্পত্তি আগলাচ্ছে। আমরা ম'রে গেলে তারা সব মুক্তি পাবে।

—তারা তোমাদের কিছু বলে না ?

—কেন বলবে ! তারা তো আমাদেরই লোক ছিল আর আমাদের জন্যেই ওখানে রয়েছে। আমরা গেলেই তারা স'রে যায়। তা ছাড়া সব সময়েই যে আমরা কড়ি বরগা দরজা জানলা নিয়ে আসি তা নয়, দেখতে পাচ্ছ ওখানে কত বড় বড় গাছ জন্মেছে, এই সব গাছ কেটেও মাঝে মাঝে বিক্রি করা চলে, রাজার বংশের লোক আমরা, পরের নোকরি তো আর করতে পারি না। পরমাত্মার কৃপায় এই ক'রেই দিন গুজরান হচ্ছে। শীতকালে ওখানে বাঘ এসে লুকিয়ে থাকে, তারা মানুষ গরু প্রভৃতি মেরে ওইখানে টেনে নিয়ে যায়। তা ছাড়া কত রকমের শের ও শের-এ-বব্বর বাস করে ওই ভাঙা প্রাসাদে তার আর ঠিক-ঠিকানা নেই, কিন্তু বজ্‌রুগদের দয়ায় তারা আমাদের কিছুই বলে না। এই সব দেওয়ালে এত বড় বড় যে গর্ত রয়েছে, বাঘ ইচ্ছা করলেই এর মধ্য দিয়ে ঢুকে আমাদের টেনে নিয়ে যেতে পারে, কিন্তু দেওরা রক্ষা করে।

এবারে সত্যিই আমাদের নেশা একেবারে ছুটে গেল। গাঁজা সস্তার জিনিস, তার আর জান কতটুকু ! তার পেছনে এমন ক'রে শের, শের-এ-বব্বর প্রভৃতি জানোয়ার ও দেও লাগলে কতক্ষণ তাদের সঙ্গে লড়াই করতে পারে ! রামসিং ও সুরযের বজ্‌রুগদের দেও তাদের রক্ষা করে ব'লে তারা যে আমাদের ওপরেও দয়া করবে এমন কোনও কথা নেই।

আমাদের চারিদিকে অন্ধকার ঘনিয়ে আসতে লাগল। অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে হাওয়ার জোরও বাড়তে আরম্ভ করল। সুরয আমাদের কাছ থেকে উঠে গিয়ে আঙেঠিগুলো সব ভ'রে প্রত্যেক খাটের নীচে একটা ক'রে রেখে গেল।

রাত্রে আহারের কি হবে ! এই দুর্যোগে ঘর থেকে বেরুনো অসম্ভব। সকালবেলা যা পেটে পড়েছিল গাঁজার ধোঁয়ায় কখন তা উবে গিয়েছে, ক্ষিধের চোটে পেট চোঁ-চোঁ করতে লাগল। রামসিং সেই যে আমাদের সঙ্গে টেনে বিছানা নিয়েছিল, সে তখনও প'ড়ে আছে। সুরয তাদের সেই প্রদীপ জালিয়ে তারই ক্ষীণ আলোয় এদিক ওদিক কাজ ক'রে বেড়াতে লাগল।

সে ছাগলগুলোকে বাচ্চা ও ধাড়ী হিসাবে স্থানে স্থানে বেঁধে তাদের সামনে চাট্টি ক'রে শুক্‌নো ঘাস ছড়িয়ে দিলে। কুকুরগুলো ইতিমধ্যে কোথায় চরতে গিয়েছিল, তারা একটা একটা ক'রে পরদা ঠেলে ঘরে এসে জমতে লাগল। আমরা সুরযকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলুম, তোমরা রাত্রে কি খাও?

সুরয বললে, রাত্রে খাবার আমাদের কিছুই ঠিক নেই, আজ আর কিছুই খাব না। নেহাত ক্ষিধে পেলে আটা মেখে গুড় দিয়ে খেয়ে নেব। আমার ঘরে আটা গুড় আছে, মেখে দেব, খাবে?

—না বাবা! কাঁচা আটা আমরা হজম করতে পারব না। কালই ওর নাম কি হয়ে যাবে!

জিজ্ঞাসা করলুম, এ বেলায় তো দুধ বিক্রি হয় নি, দুধ আছে না?

সুরয বললে, হাঁ হাঁ, দুধ আছে।

বললুম, আমাদের এক-একজনকে আধ সের ক'রে গরম দুধ দিতে পারবে না?

সুরয খুশি হয়ে বললে, হাঁ হাঁ খুব পারব—কেন পারব না? আধ সেরের দাম চার পয়সা, তিনজনের দেড় সের, তা হ'লে তিন আনা দাও।

আমরা তখুনি সুরযকে তিন আনা পয়সা দিলুম। সে আলাদা একটা ছোট মাটির কেঁড়ে-গোছের পাত্রে দেড় সের দুধ ঢেলে একটা আঙেঠি জেলে তার ওপরে কেঁড়েটা বসিয়ে দিলে।

দুধ জ্বাল হতে লাগল। সেই ফাঁকে জনার্দন কাগজের মোড়কটা ট্যাঁক থেকে বের ক'রে বললে, তা হ'লে আর এক ছিলিমের বন্দোবস্ত করা যাক।

সুরযকে ডেকে অনেকখানি গঞ্জিকা তার হাতে দিয়ে জনার্দন বললে, তৈরি কর।

সুরয বললে, সবটা এখনই সেজে কি হবে? এত বড় রাত এখনও সামনে প'ড়ে রয়েছে, আজ রাত্রে দেবতার কি মর্জি আছে কে জানে!

—কেন বল দিকিন?

সুরয বললে, আজ রাতে খুব ঝড় হবে ব'লে মনে হচ্ছে। এ রকম ঝড় আর একবার হয়েছিল, তাতেই তো পাশের ঘরখানা ও এই ঘরের ওই কোণের দিকটা প'ড়ে গেল। এবার ঘরখানা সবটা না পড়লেই বাঁচি!

—বল কি! তা হ'লে তো আর কিছু বাড়াবাড়ি হবার আগেই ইষ্টিশানের দিকে পাড়ি জমাতে হয়।

সুরয অভয় দিয়ে বললে, কিছু করতে হবে না, দেবতা আছেন, সব ঠিক ক'রে দেবেন।

তার পরে চারদিকে চেয়ে পরম ঔদাস্যভরে বললে, প'ড়েই যদি যায়, এবার তবে ওই কোণটা প'ড়ে যাবে, তাতে আমাদের কিছু হবার ভয় নেই।

সত্যি কথা বলতে কি, সুরযের অভয়-বাণীতে ভরসা কিছু পেলুম না। ঘরের খানিকটা প'ড়ে যাবে, বাকি খানিকটায় আমরা থাকব, সেই ব্যাপারের পরেও আমাদের থাকা সম্বন্ধে একেবারে নিশ্চিন্ত হতে পারছিলুম না।

রামসিং তখনও মাথা মুড়ি দিয়ে ঘুমুচ্ছিল। ইতিমধ্যে গাঁজা তৈরি ক'রে সুরয তাকে ডেকে তুললে। তারপরে গোল হয়ে ব'সে আবার আমরা মেঘলোক সৃষ্টি করলুম। বেশ নেশা হ'ল, আনন্দও কিছু কম হ'ল না; কিন্তু ওই ঘর চাপা পড়ার আশঙ্কায় থেকে থেকে মনটা বিগড়ে যেতে লাগল। দু-একবার রামসিংকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করায় সে বললে, হাঁ, দেওতার যা মর্জি আছে তাই হবে।

ছাত চাপা পড়বার আশঙ্কা নেই—এমন কথা রামসিং বললে না। কত বড় দার্শনিক হ'লে তবে আসন্ন বিপদে আত্মরক্ষার কোনও চেষ্টা না ক'রে তাকে পরাশক্তির লীলা ব'লে গ্রহণ করা যায় তা বিপদের সম্মুখীন না হ'লে বোঝা যায় না।

রামসিং এবার আর না শুয়ে আমাদের সঙ্গে গল্প করতে লাগল। সুরযের মুখে ঘর পড়ার কথা শুনে আমরা ভয় পেয়েছি বুঝতে পেরে দু-একটা অভয়-বাক্যও শোনালে। ইতিমধ্যে সুরয একটা ছোট লোহার কড়াইতে

ক'রে তিনবারে আমাদের তিনজনকে দুধ খাইয়ে বাকি দুধটুকু তারা স্বামী-স্ত্রীতে খেয়ে ফেললে।

গাঁজার ওপরে গরম খাঁটি দুধ পড়ায় ঘর চাপা পড়ার আশঙ্কা কিছু দূর হ'ল বটে, কিন্তু ঝড় ক্রমেই যেন বাড়াবাড়ি করতে শুরু ক'রে দিলে। ঝড়ের বাতাস কি রকম ঘুরপাক খেতে খেতে দেওয়ালের সেই সব বিরাট গর্ত দিয়ে ঢোকবার চেষ্টা করতে লাগল, আর সেই সঙ্গে কামান-গর্জনের মতন একটা নিরবচ্ছিন্ন আওয়াজ হ'তে লাগল—বুম্-বুম্-বুম্। পিছনের সেই জঙ্গল, যাকে কয়েক ঘণ্টা আগেও শান্ত শ্রীমণ্ডিত ঘুমন্ত রূপসীর মতন মনে হচ্ছিল, ঝড়ের পরশ পেয়ে সে যেন সর্বনাশিনী মূর্তি ধ'রে জেগে উঠল। থেকে থেকে বিদ্যুতের চমকানিতে তার রূপ এক-একবার আমাদের চোখে প্রতিভাত হচ্ছিল—মনে হতে লাগল, গাছগুলো যেন অসংখ্য বাহু মেলে আকাশ স্পর্শ করতে উদ্যত হচ্ছে, কিন্তু তখুনি আবার কে তাদের ঝুঁটি ধ'রে মাটির দিকে নামিয়ে দিচ্ছে। কখনও বা মনে হয়, সুরথ-বর্ণিত সেই কালনাগিনীর দল শোঁ-শোঁ শব্দে আকাশে ছুটোছুটি করতে করতে সহস্র শাখায় তাদের অগ্নিজিহ্বা বিস্তার করছে আর সঙ্গে সঙ্গে আওয়াজ হচ্ছে—কড়-কড়-কড়াৎ। সঙ্গে সঙ্গে সেই নিরবচ্ছিন্ন আওয়াজ চলছে—বুম্-বুম্-বুম্! আমি কলকাতাবাসী জীব, প্রকৃতির আত্মঘাতিনী সেই স্বৈরিণী মূর্তি দেখা তো দূরের কথা, এক শো মাইল বেগে বাতাস বইলে আমার জানলায় ফুর-ফুর ক'রে দক্ষিণার আমেজ দেয়; কিন্তু জনার্দন ও সুকান্ত দুজনেই তারা পূর্ববঙ্গের ছেলে, ঝড়ের কোলেই তারা এক রকম মানুষ হয়েছে—ব্যাপার দেখে তারাও বেশ ভড়কে গেল।

এদিকে আমাদের ঘরের প্রদীপটি একবার বাতাসের এক ঝটকায় নিবে গেল। ঘরের মধ্যে বাতাস এমন ছুটোছুটি করতে আরম্ভ করলে যে, প্রদীপ জ্বালানো আর সম্ভব হ'ল না। সেই অন্ধকারে ব'সে ঝড় সম্বন্ধে আরও কিছুক্ষণ আলোচনা ক'রে রামসিংহ তো লম্বা হ'ল। সুরথ আমাদের আশ্বাস

দিয়ে বললে, কোনও ভয় নেই। ওপরে দেবতা রয়েছেন, তাঁকে স্মরণ ক'রে শুয়ে পড়।

সুরথ শোবার যোগাড় করতে লাগল। আমরা দেশলাই জ্বেলে জ্বেলে নিজেদের খাটিয়ার কাছে এসে গায়ের কাপড় আড়াল ক'রে ধ'রে মোমবাতি জ্বালিয়ে নিয়ে বসলুম। আমাদের শোবার জায়গাটায় বাতাস তত জোর ছিল না, তবুও ক্ষীণ মোমবাতির পক্ষে বেশিক্ষণ তার বেগ সহ্য করা সম্ভব হ'ল না। কি আর করি—নিরুপায় হয়ে সেই সন্ধ্যারাত্রেই শুয়ে পড়তে হ'ল।

শুয়ে তো পড়লুম, কিন্তু ঘুম কোথায়! সেই নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে সহস্র নাগিনী ও সহস্র কামানের প্রতিযোগিতা চলেছে। এরই মধ্যে আবার নেশার ঘোরে কত রকমের চিন্তা মাথার মধ্যে জোট পাকাতে লাগল। মনে হতে লাগল, কবে অতীতের কোন্ এক বিস্মৃত দিনে রাম-সিংয়ের পূর্বপুরুষের কে এই প্রাসাদ প্রতিষ্ঠা করেছিল—আজকের এই দিন যে ভবিষ্যতের গর্ভে লুকিয়ে ব'সে ছিল, সে কথা কি সে ব্যক্তি ভাবতে পেরেছিল! কত রকম চিন্তা ভিড় করতে লাগল মগজে—কখনও বা নিজের মনেই হাসি, কখনও মনে হয় নেশাটা বড্ড চেপে ধরেছে। নিজের মনে ভাবতে ভাবতে বাইরের সেই প্রচণ্ড শব্দ ক্রমেই যেন ক্ষীণ হয়ে আসতে লাগল। ঝড়ের সেই ভীষণ শব্দগুলো যেন দূরে চ'লে যেতে লাগল—দূর—দূর—দূরতর—দূরতর, তারপর কখন করুণাময়ী নিদ্রা এসে সকল চিন্তা দূর ক'রে দিলে।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলুম জানি না, হঠাৎ বাহুতে একটা ধাক্কা পেয়ে ঘুমটা ভেঙে গেল। আমাদের খাট তিনটে একেবারে গায়ে-গায়েই পাতা ছিল। আমার পাশেই ছিল জনার্দনের খাট। তার ধাক্কা খেয়ে আমি ধড়মড় ক'রে উঠে বসলুম। আমার সঙ্গে সঙ্গে সে-ও উঠে ব'সে আমাকে চেঁচিয়ে কি যেন বললে। কিন্তু তখন কার সাধ্য কিছু শুনতে পায়! বাইরে ক্রুদ্ধ প্রকৃতির হুঙ্কার চলেছে অবিচ্ছিন্ন ধারায়, তা ভেদ ক'রে কোনও শব্দ কি আর কানে যায়! আমি চীৎকার ক'রে জিজ্ঞাসা করতে লাগলুম, কি রে, কি বলছিস?

জনার্দনও চেঁচাতে লাগল।

মিনিটখানেক এই রকম চলবার পর জনার্দনের কণ্ঠস্বর কানে গেল। জনার্দন বললে, বাতিটা শীগগির জ্বাল্—আমায় বোধ হয় সাপে কামড়েছে।

কি সর্বনাশ!

জনার্দন চীৎকার করতে লাগল, ওরে বাবা রে! ম'রে গেলুম রে! বাবা গো, আর পারি না।

বাস্! বাইরে ঝড়ের সেই ভীষণ আওয়াজ আমার শ্রবণে ক্ষীণ হয়ে গেল। জনার্দনের আর্তনাদ সব শব্দ ছাপিয়ে উঠতে লাগল। তক্ষুনি সুকান্তকে ঠেলে তুলে বললুম, শীগগির ওঠ্, জনার্দনকে সাপে কামড়েছে।

মোমবাতি জ্বালাবার চেষ্টা করতে লাগলুম, কিন্তু ঘরের মধ্যে তখন ঝড় চলেছে, দেশলাই জ্বালাই আর নিবে যায়। শেষকালে একটা খাটিয়াকে পাশ ফিরিয়ে দাঁড় করিয়ে তার ওপর কাপড় দিয়ে একটা পর্দার মতন ক'রে তার পাশে মোমবাতি জ্বালালুম।

জনার্দন বললে, ওঠবার জন্যে মাটিতে পা রাখা মাত্র কিসে কামড়ালে, নিশ্চয় সাপ—অসহ্য যন্ত্রণা রে বাবা, আর সহ্য করতে পারছি না।

জনার্দনের কথা শুনেই সুকান্ত তো ভেউভেউ ক'রে কেঁদে উঠল। কিন্তু

এখন কাঁদলে চলবে না, একটা কিছু চেষ্টা করা চাই। শুনেছিলুম যে, সাপে কামড়ালে দষ্ট স্থানের ওপরেই গোটা কয়েক বাঁধন দিতে হয়। কিন্তু দড়ি কোথায় পাই! ছুটে গিয়ে স্বরথকে ধাক্কা দিয়ে তুললুম। সে হাঁউমাউ ক'রে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে রামসিংও উঠে পড়ল। সব শুনে তারা ছুটে জনার্দনের কাছে এল। ডান পায়ের বুড়ো আঙুলে কামড়েছে শুনেই রামসিং সেই আঙুলটা মুখে পুরে দিয়ে চুষতে আরম্ভ ক'রে দিলে।

ওদিকে জনার্দন চীৎকার করতে লাগল, ও বাবা! আর যে পারি না! ও বড়দা ও মেজদা ও সোনাদা রাঙাদা তোমরা কোথায় আছ, আমি যে মরি!

স্বরথকে বললুম, পায়ে দড়ি বাঁধতে হবে, দড়ি দিতে পার?

সে ছুটে গিয়ে ধাড়ী ছাগলগুলোর গলা থেকে সব দড়ি খুলে নিয়ে এল। আসবার সময় তাড়াতাড়িতে দু-চারটে কুকুরের পেটে পা দিতে তারা কেঁউকেঁউ ক'রে চীৎকার শুরু করলে। ঘরের মধ্যে কুকুর ছাগল ও জনার্দন, আর বাইরে ঝড়ের আওয়াজ মিলে এক বীভৎস রসের সৃষ্টি হ'ল।

আমি ও স্বরথ মিলে জনার্দনের পায়ের গাঁট থেকে আরম্ভ ক'রে হাঁটু অবধি চার জায়গায় বাঁধলুম। ওদিকে রামসিং জনার্দনের পা চুষে চুষে বার তিন-চার থুতু ফেলে বললে, সাপে কামড়ায় নি, মনে হচ্ছে বিচ্ছুতে কামড়েছে।

তারপরে সে আস্তে আস্তে বললে, সাপে কামড়ালেও মরে, বিচ্ছুতে কামড়ালেও মরে, তবে সাপে কামড়ালে এত যন্ত্রণা হয় না, এ বিচ্ছুতে কেটেছে ব'লেই মনে হচ্ছে।

রামসিংয়ের কথা শুনে জনার্দন আরও চেঁচাতে শুরু ক'রে দিলে। সেই সঙ্গে তাল মিলিয়ে সুকান্তও শুরু করলে, ওরে বাবা! কি হবে রে!

ওদিকে জনার্দনের রজ্জুবদ্ধ পা-খানা দেখ্‌ দেখ্‌ ক'রে ফুলে ঢোল হতে লাগল। স্বরথ তার পায়ের অবস্থা দেখে বললে, যখন বিচ্ছুতেই কেটেছে তখন বাঁধন দিয়ে ওর কষ্ট বাড়িয়ে লাভ কি, ওকে শান্তিতে মরতে দাও—

কিন্তু বাঁধন কাটি কি ক'রে! দেখতে দেখতে জনার্দনের পা-খানা ফুলে এমন অবস্থা হ'ল যে, বাঁধনের দুই পাশ ফুলে দড়িগুলো মাংস কেটে ব'সে যেতে লাগল। শেষকালে শ্বরষ তার বিছানার তলা থেকে ইয়া বড় চক্‌চকে এক খাঁড়ার মতন অস্ত্র টেনে বার করলে। সেই সাংঘাতিক জিনিস দিয়ে জনার্দন বেচারীর পা-খানা ক্ষত-বিক্ষত ক'রে বাঁধন চারটে কেটে ফেলা গেল।

বাঁধন খোলার পর বোধ হয় মৃত্যু অবধারিত বুঝতে পেরে জনার্দনের আক্ষেপ আরও বেড়ে গেল।

আমি ও সুকান্ত ঠিক করলুম, এই ভাবে জনার্দনকে বিনা চিকিৎসায় মরতে দেওয়া হবে না। রামসিং ও শ্বরষকে বললুম, তোমরা দুজনে একে দেখ, আমরা শহর থেকে একজন ডাক্তার ডেকে নিয়ে আসি। এখানে সব থেকে বড় ডাক্তারের নাম কি, কোথায় থাকেন তিনি?

রামসিং হেসে বললে, ডাক্তার! সে যত বড় ডাক্তারই হোক না কেন, কিছুই করতে পারবে না।

শ্বরষ বললে, এই ঝড়-তুফানে বাইরে গেলে বাঁচবে! গাছ চাপা প'ড়ে পথে ম'রে থাকবে। যে মরছে তাকে মরতে দাও, দেওতার যা ইচ্ছে তাই হবে, তাই ব'লে তিনজনে মিলে মরবে কোন্ বুদ্ধিতে?

তবে! বন্ধু বিনা চিকিৎসায় ম'রে যাচ্ছে তাই বা দাঁড়িয়ে দেখি কি ক'রে?

আমরা বেরুতে যাচ্ছি, এমন সময় শ্বরষ আমাদের একরকম বাধা দিয়ে বললে, দাঁড়াও। ডাক্তার কিছুই করতে পারবে না—

তারপরে সে তার পরনের কাপড়-চোপড়গুলো এঁটে পরতে পরতে পাশের সেই বিরাট ভগ্নস্তূপের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললে, ওই জঙ্গলের মধ্যে একরকম লতা জন্মায়, সেই লতা বেটে দষ্ট স্থানে লাগাতে পারলে ও বেঁচে যেতে পারে, তা না হ'লে যে রকম লক্ষণ দেখছি তাতে মনে হচ্ছে, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ওর মৃত্যু হবে।

এই অবধি ব'লে সে নিজেদের ঠেট ভাষায় চীৎকার ক'রে তার স্বামীকে কি বললে। সুরযের কথা শুনেই রামসিং বিনাবাক্যব্যয়ে উঠেই মাথায় কাপড়খানা বেশ ক'রে জড়িয়ে নিলে। তারপরে সেই অসভ্য নিরক্ষর জাঠ-দম্পতি—যারা ছাগলের দুধ বেচে জীবিকা অর্জন করে, দিন কয়েক আগেই যারা পরস্পরে খুনোখুনি ক'রে মরছিল, ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে সেই প্রভঞ্জনের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল—যে সময়ে ক্ষুদ্রতম কীট-পতঙ্গও নিজের আশ্রয় ত্যাগ করে না, তারা গেল সেই অন্ধকারের মধ্যে, সেই উঁচু-নীচু ধ্বংসস্তূপে,—যেখানে বাঘ, সাপ, বিচ্ছু, শেয়াল—কি না আছে, চ'লে গেল এক অপরিচিতের প্রাণ বাঁচাবার জন্যে, সেই ওষধির সন্ধানে।

এদিকে জনার্দনের চীৎকারের বিরাম নেই। সে তারস্বরে চেঁচিয়েই চলল। আমি কিসে যেন পড়েছিলুম যে, সর্পদষ্ট ব্যক্তির কিছুক্ষণ পরে গলার স্বর ভেঙে যায়। অনবরত চীৎকার ক'রেই হোক অথবা অন্য যে কোনও কারণেই হোক ক্রমেই যেন জনার্দনের কণ্ঠস্বর ভেঙে আসতে লাগল। সে চেঁচাতে লাগল, ওরা কি আমার বাড়িতে খবর দিতে গেল ?

—না, ওরা তোমার জন্যে ওষুধ আনতে গেল।

—আর ওষুধে কি হবে! আমি বেশ বুঝতে পারছি, আমার হাত পা সব ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। ও রাঙাদা—রাঙাদা গো—

বললুম, জনার্দন, চেঁচিয়ে নিজেকে কেন ক্লান্ত করছিস ভাই ?

জনার্দন হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, মরবার সময় ভাইকে ডাকছি, যদি শুনতে পায়—

—কোথায় বিক্রমপুরের কোন্ গাঁয়ে তোর বাড়ি, আর কোথায় এই ভরতপুর! এখান থেকে চীৎকার পাড়লে কি তারা শুনতে পায় কখনও ?

—হায় হায়! তবে মরবার সময় কারুকে দেখতে পেলুম না।

জনার্দন যত এই ধরনের কথা বলে, সুকান্তর কান্নার বেগ ততই বাড়তে

থাকে। সুকান্ত ও জনার্দন একই দেশের ছেলে। সে কাঁদে আর বলে, ওর বাড়িতে মুখ দেখাব কি ক'রে ?

এদিকে জনার্দনের কণ্ঠস্বর ভেঙে গেলেও তার চীৎকারের বিরাম নেই। সে বলতে লাগল, যে সাপটা তাকে কামড়েছে সেটাকে সে দেখেছে, একেবারে কালসাপ রে বাবা! ও বাবা, তুমি কোথায়? ব্রহ্মশাপ না হ'লে লোককে সাপে কামড়ায় না। হরিশ্চন্দ্রের ছেলে রোহিতাশ্বকে সাপে কামড়েছিল, তাকে মাত্র একটা ব্রাহ্মণে শাপ দিয়েছিল, আর আমি দেশসুদ্ধ ব্রাহ্মণের দানের টাকা মেরে নিয়ে এসেছি, এতগুলো বামুনের অভিসম্পাত, ওরে কি হবে রে!

এই রকম সব বকতে বকতে ক্রমে সে নির্জীব হয়ে পড়ল। আস্তে আস্তে তার কথা বলাও শেষ হয়ে গেল।

সুকান্ত বললে, বাস্! দেখছ কি? শেষ হয়ে গেল।

সুকান্ত জনার্দনের মাথার কাছ থেকে উঠে নিজের খাটে গিয়ে বসল। আমিও সেখান থেকে উঠে মেঝেতে যেখানে মোমবাতিটা জ্বলছিল, সেখানে গিয়ে ব'সে পড়লুম।

বাইরে তুফান গর্জাতে লাগল।

সেই প্রকাণ্ড প্রায়ান্ধকার ঘরে আমরা দুজন জেগে, আর একজন নিদ্রিত কি মহানিদ্রাগত তা জানি না। কুকুর ছাগলগুলোও ঘুমিয়ে পড়েছে। এতক্ষণ পরে সমস্ত ব্যাপারটা ভাল ক'রে চিন্তা করবার অবসর পেলুম। বেশ বুঝতে পারলুম যে, জনার্দন যদি ম'রে গিয়ে থাকে তো কাল সকালেই পুলিসের লোক এসে তার মৃতদেহ আর আমাদের জীবন্ত দেহ নিয়ে একচোট টানা-পোড়েন করবে। পুলিসের কবল থেকে যদি ভালয়-ভালয় মুক্তি পাই তো প্রথমে জনার্দনের দেহের সৎকার করতে হবে। তার পরে কি হবে ?

ভাবতে লাগলুম, ব্রাহ্মণের অভিশাপে জনার্দন না হয় মারা গেল। কিন্তু এ কার অভিশাপ আমার জীবনকে এমন পাকে-পাকে জড়িয়ে ধরেছে! যেখানে যাই, যে কাজেই অগ্রসর হই ঠিক সাফল্যের পূর্ব-মুহূর্তটিতে অতর্কিতে বাধা এসে

সব পণ্ড ক'রে দেয়। এই তো বরাবরই দেখে আসছি। কোথায় জমা হয়ে আছে এই বাধা, কে প্রয়োগ করছে এই বাধা—আমার ইচ্ছাকে, আমার জীবনকে বিপর্যস্ত করবার এই চক্রান্ত প্রকৃতির মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে কেন? কি আমার অপরাধ?

কার প্রতি জানি না—ধীরে ধীরে একটা অভিমান আমার অন্তরে জমা হতে লাগল। এই দুর্জয় অভিমানে আত্মহত্যা করবার প্রবল ইচ্ছা আমার মনের মধ্যে লাফালাফি করতে শুরু ক'রে দিলে। আমি ঠিক করলুম, জনার্দন যদি ম'রে যায় তো ওই টিনে যত অর্থ এখনও অবশিষ্ট আছে তা সুকান্তর হাতে দিয়ে তাকে বাড়ি পাঠিয়ে দেব। আমি কিন্তু আর ফিরব না—ফিরব না বটে, কিন্তু জীবনযুদ্ধ থেকে একেবারে স'রে দাঁড়াব। কোনও চেষ্টা করব না জীবনে কোনও উন্নতি করবার। আমি খুঁজব তাঁকে, যিনি আমার ভাগ্যলিপি লিখেছেন। জিজ্ঞাসা করব তাঁকে, কেন তিনি দিলেন আমার মধ্যে এই আবেগ ও আকুলতা, অথচ সংসারের প্রতিটি জিনিসকে লেলিয়ে দিলেন আমার বিরুদ্ধে—যেন কোনও কাজেই আমি সাফল্যলাভ করতে না পারি। কেন! কেন! কি আমার অপরাধ?

আমার পাশের মোমবাতিটা ফুরিয়ে গিয়ে অনেকক্ষণ থেকে নোটিশ দিচ্ছিল—দাউদাউ ক'রে কিছুক্ষণ জ্ব'লে সেটা নিবে গেল।

অন্ধকারে ব'সে ভাবতে লাগলুম, আসুক ওই জঙ্গল ও ভগ্নস্তূপ থেকে বাঘ নেকড়ে—আসুক বিছুর দল—কামড়ে মেরে ফেলুক আমাকে—আমি নড়ব না।

একটু পরে সুকান্ত আর একটা মোমবাতি জ্বালিয়ে আমার পাশে রেখে উবু হয়ে বসল। দেখলুম, তখনও তার চোখে জল রয়েছে। তাকে আমার সংকল্পের কথা বলায় সে ঘাড় নেড়ে বললে, আমিও তোমার সঙ্গে যাব, বাড়ি যাবার কথা আমায় ব'লো না। জনার্দন যদি মারা যায় তো কোন্ মুখ নিয়ে আমি বাড়ি যাব? তা ছাড়া বন্ধুকে এমনভাবে ফেলে সব টাকা নিয়ে মজা ক'রে আমি বাড়ি যেতে চাই না। তুমিও যেখানে যাবে, আমিও সেখানে যাব।

সুকান্ত আমার আরও কাছে এসে তার একটা হাত দিয়ে আমার গলা জড়িয়ে ধরলে। সুদূর অতীতে দুর্দিনের সেই দারুণ রাতে সে আমায় কি কি বলেছিল তার খুঁটিনাটি কথা আজ আর ভাল ক'রে মনে পড়ছে না, কিন্তু সেই ঘটনাকে আশ্রয় ক'রে তার সঙ্গে আবার যেন নতুন ক'রে আমার বন্ধুত্ব হ'ল। যদিও ভবিষ্যতে তার জীবনের কর্মক্ষেত্র ছিল আলাদা—সে থাকত এক জায়গায়, আমি থাকতুম আর এক জায়গায়। তবুও যখনই যেখানে দেখা হয়েছে আমরা পরস্পরকে জড়িয়ে ধরেছি—অতীতের সেই ভয়ঙ্কর রাত্রে চোখের জলে আমাদের যে বন্ধুত্ব পাকা হয়েছিল হাসতে হাসতে সে কথা আলোচনা করেছি।

একবার অনেক দিন অসাক্ষাতের পর সকালবেলা প্রায় দশটার সময় এসে সুকান্ত জিজ্ঞাসা করলে, হ্যাঁ রে! ওই যে অমুক কাগজে 'মহাস্থবির জাতক' নামে একটা লেখা বেরুচ্ছে, সেটা নাকি তুই লিখছিস?

বললুম, হ্যাঁ।

সুকান্ত বললে, ও বাবা! তা হ'লে আমাদের সেই সব কথা ফাঁস ক'রে দিবি নাকি?

জিজ্ঞাসা করলুম, কেন, তোর আপত্তি আছে?

সুকান্ত একটু ভেবে বললে, না, আপত্তি আর কি, তবে নামটা আর দিস নি। ছেলেপুলে বড় হয়েছে—নাতি-নাতনী আসছে, সে সব কেলেঙ্কারি—

দুজনে একচোট খুব হাসা গেল।

বললুম, অনেক দিন পরে দেখা হ'ল—দু-দিন থাক্ না আমার কাছে।

সে বললে, না ভাই, এবার অমুক জায়গায় উঠেছি, সেখান থেকে হঠাৎ চ'লে এলে কি মনে করবে তারা? এর পরের বারে একেবারে তোর এখানে এসে উঠে কদিন থাকব।

ঘণ্টাখানেক হাসি-গল্প ক'রে সুকান্ত চ'লে গেল। বোধ হয় দু-তিন দিন পরেই শুনলুম, স্নানের ঘরে অস্বাভাবিক দেরি হচ্ছে দেখে তার আত্মীয়েরা দরজা ভেঙে দেখলে, তার প্রাণহীন দেহ বাথ-টবের পাশে প'ড়ে রয়েছে।

যাই হোক, আমরা তো জনার্দনকে নিয়ে সেইভাবে ব'সে রইলুম। প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে রামসিং ও সুরয ফিরে এল, তাদের মাথায় বড় বড় দুই লতার বোঝা। বোঝা নামিয়ে তখুনি ডাঁটা থেকে পড়পড় ক'রে রাশিকৃত পাতা ছিঁড়ে নিয়ে সুরয বাটতে আরম্ভ ক'রে দিলে।

রামসিং বললে, এ লতার নাম বিশল্যকরণী, লক্ষ্মণজীর জন্যে মহাবীরজী এই লতা হিমালয় থেকে লঙ্কায় নিয়ে গিয়েছিল। তাঁদের সঙ্গে এ ওষধি অযোধ্যায় যায়—তার পরে ভরতজী যখন এখানে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন, তখন তাঁর হুকুমে এইখানে বিশল্যকরণী লাগানো হয়েছিল। এ লতা জঙ্গলে জন্মায় বটে, কিন্তু যে-সে জঙ্গলে তা ব'লে হয় না।

ওদিকে সুরয তাল তাল সেই পাতা বাটতে লাগল, আর রামসিং জনার্দনের পায়ের পাতা থেকে আরম্ভ ক'রে প্রায় কুঁচকি অবধি থেবড়ে থেবড়ে সেগুলো বসিয়ে দিতে লাগল। সব লাগানো হয়ে গেলে মেঝে পরিষ্কার ক'রে সেখানে জনার্দনকে শোয়ানো হ'ল। রামসিং ও সুরয দুজনেই বেশ ক'রে তাকে পরীক্ষা ক'রে বললে, এখনও প্রাণ আছে—বেঁচে যাবে ব'লে মনে হচ্ছে।

এই সব করতে করতে ফরসা হয়ে গেল। সকালের দিকে বৃষ্টি একেবারে থেমে গেল বটে, কিন্তু তখনও হাওয়ার জোর ছিল, রোদ ওঠার সঙ্গে সঙ্গে হাওয়ার জোরও ক'মে গেল—প্রসন্ন সূর্যালোকে আবার পৃথিবী হাসতে লাগল।

এতক্ষণে জনার্দনকে ভাল ক'রে দেখবার সুযোগ পেলুম। মনে হ'ল, তার মুখখানা যেন কালো হয়ে গিয়েছে। খুব আস্তে আস্তে সে নিশ্বাস নিচ্ছিল—সুরয কয়েকবার নাকের কাছে হাত দিয়ে দেখে বললে, ও এখন বিষের ঘোরে ঘুমুচ্ছে, সেই বিকেল নাগাদ ঘুম ভাঙবে। পরমাত্মা ওকে বাঁচিয়ে দিলেন—

সকালবেলা দুধের খদ্দেররা এসে কেউ দুধ পেলে না। রাত্রে ধাড়ীদের গলার দড়ি খুলে জনার্দনের পায়ে বাঁধা হয়েছিল, সেই তালে তারা বাচ্চাদের কাছে গিয়ে দুধ খাইয়ে দিয়েছে। খদ্দেররা দুধ পেল না বটে, কিন্তু মজা পেল। দুধ না পাওয়ার কারণটিকে তারা দেখে গেল। তারপর নিজ নিজ

মহল্লায় গিয়ে বেশ ফলাও ক'রে গল্প করার ফলে চার দিক থেকে দলে দলে লোক আসতে লাগল জনার্দনকে দেখতে। আমাদের উপকার করতে গিয়ে সেদিন তাদের সকালবেলার রোজগারটি নষ্ট হ'ল। তারপরে সেই দড়িগুলো কেটে ফেলায় ভবিষ্যতের অবস্থাও খারাপ হ'ল দেখে আমরা তাদের দড়ি কেনবার পয়সা তো দিলুমই, তা ছাড়া খোরাকি বাবদও কিছু দিলুম।

বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দর্শনার্থীর ভিড় ক'মে আসতে লাগল। সুরয বললে, যাও, তোমরা খেয়ে এস। রুগীর অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে, আর ভয় নেই। বিকেল নাগাদ ও ভাল হয়ে উঠবে, তখন একটু গরম দুধ খাইয়ে দেব, সব ঠিক হয়ে যাবে।

সেদিন বিকেল নাগাদ জনার্দন সত্যিই ভাল হয়ে উঠল। চ'লে-ফিরে বেড়াতে না পারলেও, সে উঠে ব'সে আমাদের সঙ্গে হেসে কথা বলতে লাগল। জনার্দনকে বললুম যে, সুরয ও রামসিং সেই দুর্যোগে প্রাণ তুচ্ছ ক'রে বেরিয়ে গিয়ে লতা এনেছিল ব'লেই সে বেঁচে গিয়েছে। নইলে—

জনার্দন যখন সুরযের হাত ধ'রে তাদের কাছে কৃতজ্ঞতা জানাতে লাগল, তখন তাদের স্বামী-স্ত্রী দুজনের চোখেই অশ্রু ফুটে বেরুল। বাইরের আবরণটা কঠিন হ'লেও বুঝলুম, তাদের ভেতরটা তখনও দরদে ভরা রয়েছে।

সুরয বললে, বৃষ্টি-বাদলের দিনে সব বিচ্ছু বেরোয়, তোমরা বিছানাপত্র ভাল ক'রে ঝেড়ে নাও।

আমরা বিছানা খাট ভাল ক'রে ঝেড়ে আছড়ে আবার বিছানা পাতলুম। জনার্দনের বিছানা ঝাড়তে গিয়ে প্রায় এক বিঘৎ লম্বা ও সেই অনুপাতে মোটা, গায়ে খাড়া খাড়া রোঁয়াওয়ালা একটা বিচ্ছু বেরিয়ে পড়ল। তখুনি জুতোপেটা ক'রে তো সেটাকে মেরে ফেলা হ'ল। ওরা বললে, একবার কামড়ালে সাত দিন আর ওদের বিষ থাকে না, কাজেই আজকে যদি ওটা কামড়াত তা হ'লে কিছুই হ'ত না। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বললে যে, এই

শ্রেণীর বিচ্ছুর বিষ প্রায়ই মারাত্মক হয়ে থাকে। এরা যদি সাপকে কামড়ায় তো সাপ ম'রে যায়।

বিকেলবেলা জনার্দনকে আধ সেরটাক দুধ দেওয়া হ'ল বটে, কিন্তু সে আরও কিছু খাবারের জন্যে এত গোলমাল আরম্ভ করলে যে তার জন্যে আবার স্টেশন থেকে রুটি মাছ কিনে আনতে হ'ল।

সেদিন সন্ধ্যায় জনার্দনের ভাল হয়ে যাওয়া উপলক্ষ্যে আগের অবশিষ্ট গাঁজাটুকু টেনে সবাই শুয়ে পড়া গেল, তারপরে এক ঘুমেই রাত কাবার।

দিন তিনেকের মধ্যেই জনার্দন বেশ সেরে উঠে আগের মতন আমাদের সঙ্গে স্টেশনে যাতায়াত আরম্ভ করলে। স্টেশনের কাছের সেই বাড়ির মালিক তখনও ফেরে নি। স্টেশনের দোকানদারটি বললে, আর আট দশ দিনের মধ্যেই সে নিশ্চয় ফিরে আসবে। কিন্তু এদিকে আমাদের জনার্দন মহা হাঙ্গামা জুড়ে দিলে। সে খালি বলতে লাগল, তার কি রকম মনে হচ্ছে—এখানে থাকলে সে ম'রে যাবে। সেদিন তো দক্ষিণ দরজা অবধি পৌঁছে গিয়েছিল—এবার চৌকাঠ পেরুতে হবে। জনার্দনকে বোঝাতে লাগলুম, এ রকম সস্তার জায়গা ছেড়ে অন্য কোথাও গেলে হয়তো মুশকিলেই পড়তে হবে। ওদিকে দুধের ব্যবসার জন্যে ভাল ভাল ছাগল ইত্যাদি দেখা হয়েছে, এই সব ছেড়ে দিয়ে চ'লে যাওয়া অত্যন্ত অবিবেচকের কাজ হবে।

জনার্দন কিন্তু কোনও যুক্তিই মানে না। তার যুক্তি হচ্ছে, যদি প্রাণেই না বাঁচি তো ব্যবসা দিয়ে কি করব!

এই রকম চলেছে। একদিন আমরা স্টেশন থেকে খেয়ে ডেরায় ফিরছি, বেলা তখন প্রায় দেড়টা হবে, এমন সময় একটা লোক দৌড়তে দৌড়তে এসে আমাদের বললে, তোমাদের ওই চৌকিতে ডাকছে।

চৌকি কি রে বাবা!

শেষকালে টের পাওয়া গেল যে, পুলিসের লোক থানায় আমাদের ডাকছে। লোকটার সঙ্গে সঙ্গে গেলুম। কাছেই একটা বড় গাছের নীচে একটা খোলার

ঘর। সেখানে টেবিল বেঞ্চি আছে। বেঞ্চিতে চার-পাঁচজন লোক ব'সে রয়েছে, আরও কয়েকজন দাঁড়িয়ে আছে।

আমরা সেখানে গিয়ে উপস্থিত হতেই থানাদার খুব খাতির ক'রে বসতে ব'লে আমাদের জিজ্ঞাসা করলেন, কিছুদিন থেকে লক্ষ্য করছি, আপনারা এই পথে যাতায়াত করছেন, কে আপনারা?

এই অবধি ব'লেই থানাদার আবার বললেন, আমার অপরাধ মার্জনা করবেন। জানেনই তো, এটা একটা রেয়াসৎ অর্থাৎ দেশীয় রাজ্য। এখানকার বাসিন্দা নয় এমন লোক এখানে এলে তাদের খোঁজ রাখতে হয় আমাদের।

আগ্রায় সত্যদার কাছে আমরা রেয়াসতের অনেক খবরই পেতুম। বাঙালীর ছেলে, বিশেষ কলকাতার লোক এই স্বদেশীর সময় সেখানে গেলে যে খুব খাতির পাবে না তাও আমাদের জানা ছিল। থানাদার কিছুক্ষণ ধ'রে আমাদের আপাদমস্তক দেখে বললেন, আপনাদের দেখে তো বাঙালী ব'লে মনে হচ্ছে। বাংলা দেশের কোথায় আপনাদের বাড়ি, কোন্ জেলা কোন্ পোস্ট-অফিস, কোন্ গ্রাম, কোন্ থানা?

বললুম, বাংলা দেশে আমাদের পূর্বপুরুষের বাড়ি ছিল, কিন্তু কয়েক পুরুষ থেকেই আমাদের আগ্রাতে বাস।

প্রশ্ন হ'ল—আপনাদের তিনজনেরই কি তাই?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—বেশ, আপনাদের নাম ধাম ঠিকানা?

থানাদারের সঙ্গে আমার কথাবার্তা হচ্ছিল। আমি তো যা-তা একটা নাম ব'লে দিলুম। ঠিকানাও একটা দিয়ে দিলুম। বললুম, আমরা সবাই একই মহল্লায় বাস করি।

আমার দেখাদেখি জনার্দন ও সুকান্তও নাম ভাঁড়ালে। কিন্তু এতেও তারা রেহাই দিলে না। থানাদার আবার প্রশ্ন করলেন, কতদিন এসেছেন এখানে?

—তা মাসখানেক হবে।

—কোথায় আছেন ?

—ধর্মশালায়।

—কোন্ ধর্মশালায় ?

—ওই যে রামসিং ব'লে একটা লোকের ধর্মশালা আছে, সেখানে।

আমাদের কথা শুনে থানাদার ও উপস্থিত সকলে হো-হো ক'রে হেসে উঠল। থানাদার বললেন, রামসিংয়ের ধর্মশালা! বলেন কি! রামসিং কি ধর্মশালা খুলেছে নাকি ?

উপস্থিত লোকদের মধ্যে একজন বললে, রামসিং মধ্যে মধ্যে লোক রাখে ব'লে শুনেছি।

থানাদার আমাদের জিজ্ঞাসা করলেন, আপনারা কি ওকে পয়সা দেন ?

—হ্যাঁ, দিই।

এবার থানাদার একটু গম্ভীর ভাব অবলম্বন ক'রে বললেন, ওই রামসিং ও তার স্ত্রী কি রকম চরিত্রের লোক, তা কি আপনাদের জানা আছে ?

বললুম, ওদের ভাল লোক ব'লেই তো মনে হয়। বেচারারা আজই গরিব হয়ে পড়েছে—শুনেছি, ওদের পূর্বপুরুষেরা রাজা ছিল। রাজত্ব চ'লে গেছে, কিন্তু ওদের ব্যবহারের মধ্যে আভিজাত্যের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

আমার বক্তৃতার তোড় থামিয়ে দিয়ে থানাদার বললেন, বাবু সাহেব, আপনার কথা মেনে নিচ্ছি—এ কথা খুবই সত্যি যে, ওদের পূর্বপুরুষ রাজা ছিল। কিন্তু আমি এখনকার কথা বলছি। জানেন কি যে ওরা ডাকাত! ওই রামসিং ডাকাতি ক'রে ধরা প'ড়ে পাঁচ বছর জেল খেটেছে। আর ওর বউটা—সেটারও দু বছর জেল হয়েছিল। রামসিং যে দলের লোক সে দলকে শুধু এখানকার নয়, এর চারপাশের তিন-চারটে রেয়াসতের লোক ভয় করে। ডাকাতি, নরহত্যা ও যে কত করেছে তার আর ঠিক-ঠিকানা নেই। আপনাদের কেন যে প্রাণে মারে নি, তা বুঝতে পারছি না। মেরে ওই জঙ্গলের মধ্যে ফেলে দিলে আর কারুর সাধ্যি নেই যে, ওদের ধরে। নিজের যদি মঙ্গল

চান তো এখুনি ওখান থেকে স'রে পড়ুন। এখানে ভাল ধর্মশালা আছে, সেখানে চ'লে যান—পয়সাকড়ি কিছুই লাগবে না।

সত্যি কথা বলতে কি, থানাদারের কথা শুনে আমরা দস্তুর মতন ভড়কে গেলুম। সঙ্গে সঙ্গে সুকান্ত বললে, কদিন থেকে ওরা স্বামী-স্ত্রী দুজনে প্রায়ই বিস্কুটের বাক্সের দিকে টেরিয়ে টেরিয়ে দেখতে আরম্ভ করেছে। তার ওপর সেদিন রাত্রে সুরয তার বিছানার তলা থেকে যে অস্ত্রটি বার করেছিল, তার দ্বারা আমাদের এক-একজনকে দুখানা ক'রে ফেলতে বিশেষ কষ্ট করতে হবে না।

আমাদের নিজেদের মধ্যে এই সব কথাবার্তা চলেছে, এমন সময় জনার্দন থানাদারকে বললে, কিন্তু এখন চ'লে যেতে চাইলে ওরা যদি যেতে না দেয় ?

থানাদার একটু ভেবে নিয়ে বললে, আচ্ছা, আমি আপনাদের সঙ্গে লোক দিচ্ছি—জবরদস্ত্ লোক দিচ্ছি।

থানাদার তিনজন ষণ্ডা দেখে সিপাহী আমাদের সঙ্গে দিলে।

আমাদের কারুর মুখে আর কথা নেই। রামসিং ও সুরয যে সাধারণ মানুষের চাইতে অনেক উঁচুদরের লোক, সে বিষয়ে আমাদের মনে কোন সন্দেহই ছিল না। সেই ঝড়ের রাতে তারা যে ক'রে জনার্দনকে বাঁচিয়ে তুলেছিল, তার তুলনা কোথায় পাব ? সেই রামসিং ও সুরয ডাকাত ও নরহত্যাকারী !

চলতে চলতে জনার্দন বলতে লাগল, ওরা আমার প্রাণ বাঁচিয়েছে বটে, কিন্তু সেই দিন থেকেই কে যেন দিনরাত আমার মনের মধ্যে খোঁচা দিয়ে এখান থেকে স'রে পড়তে বলছে—এখানে আর কিছুদিন থাকলে নিশ্চয় ওরা আমাদের খুন ক'রে ফেলবে।

ধীরে ধীরে রামসিংয়ের ডেরায় পৌছনো গেল। খাওয়াদাওয়া সেরে তখন তারা শোবার যোগাড় করছিল। আমাদের পেছনে তিনজন পুলিসের সিপাহী দেখে তারা দুজনেই অবাক হয়ে চেয়ে রইল। আমরাও তাদের সঙ্গে আর কোনও কথা না ব'লে তিনজনে তিনটে বোঁচকা বাঁধতে আরম্ভ ক'রে

দিলুম—তারা ঠিক সেই রকম দৃষ্টিতে হাঁ ক'রে আমাদের কার্যকলাপ দেখতে লাগল।

আগে আগে প্রতিদিন সকালেই সুরয আমাদের কাছ থেকে সেদিনের খাট ও ঘরের ভাড়া চেয়ে নিত। ইদানীং একটু ঘনিষ্ঠতা হওয়ায় দু-তিন দিন বাদে চাইত। সে সময় কয়েক দিনের ভাড়া বাকি ছিল। আমাদের পুঁটলি বাঁধা শেষ হ'লে আমি এগিয়ে গিয়ে ঘর ও আঙেঠির জন্যে বাকি পাওনা সুরযের হাতে দিলুম। সে হাত পেতে পয়সা কটা নিয়ে নিলে, কিন্তু একটা কথাও উচ্চারণ করলে না। একবার ভাবলুম, সুরযকে কিছু বলি—কিন্তু লজ্জায় তার মুখের দিকে চাইতেই পারলুম না। ফিরে এসে সিপাহীদের সঙ্গে তাদের ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লুম।

এই সুরয ও রামসিং আমার সারা জীবনের বিস্ময় হয়ে আছে। তারা ছিল রাজার ঘরের ছেলে-মেয়ে, অথচ সংসারে স্বজন বলতে তাদের কেউ ছিল না। বিরাট প্রাসাদের একখানা ভাঙা ঘর তখনও অবশিষ্ট ছিল—সেখানার অবস্থাও তাদেরই মতন—তারই মধ্যে তারা বাস করত। তাদের দেখে মনে হ'ত না যে, সুখ স্বাচ্ছন্দ্য দুঃখ ব'লে কোনও অনুভূতির বালাই তাদের আছে। তাদের জীবনের সঙ্গে সঙ্গে সেই ঘরখানার আয়ুও বোধ হয় এতদিনে শেষ হয়ে গিয়েছে। একবেলা কোনও রকমে খেয়ে বেঁচে থাকলেও সেই রুক্ষ কাঠখোট্টা চেহারার মধ্যে বাস করত দুখানা অদ্ভুত প্রাণ। জনার্দনকে সাপে কামড়িয়েছে শুনে রামসিং যে ক'রে পায়ের আঙুল ধ'রে চুষতে আরম্ভ করলে—তার পরে সে ও সুরয সেই ভীষণ ঝড়ের রাতে ভীষণতর সেই জঙ্গলে অন্ধকারে ওষুধ আনতে ছুটে বেরিয়ে গেল—মানুষের ইতিহাসে তার তুলনা কোথায়!

আবার যখন শুনলুম সেই রামসিং বহু ডাকাতি করেছে—ডাকাতি করতে গিয়ে ধরা প'ড়ে জেল খেটেছে, ডাকাতকে আশ্রয় দেওয়ার অপরাধে সুরযকেও জেল খাটতে হয়েছে—এক বছর আগেও প্রতি রাত্রে তাদের স্বামী-স্ত্রীকে দুবার ক'রে থানায় হাজিরা দিতে হ'ত—একাধিক নরহত্যা তারা করেছে,

শুধু আইনের ফাঁকিতে বেঁচে গিয়েছে—তখন নিউটনের মতন আমারও বলতে ইচ্ছা করে, দুর্জ্ঞেয় মানব-চরিত্রের সমুদ্রোপকূলে সারাজীবন ধ'রে কতকগুলি উপলখণ্ড নয়—বালুকাকণা মাত্র আহরণ করেছি। সত্যি কথা বলতে কি, আমাদের সঙ্গে তারা যে সদয় ব্যবহার করেছিল, তাতে তাদের কাছ থেকে অমন ভাবে বিদায় নেওয়া কখনই উচিত হয় নি। কিন্তু আগেই বলেছি মানব-চরিত্র অতি জটিল ও বিচিত্র—আর আমরাও মানুষ মাত্র। অর্থলোভে হত্যা করতে অভ্যস্ত জেনে—হোক না সে উপকারী—তার পাশে নিশ্চিন্ত হয়ে রাত্রে ঘুমোই কি ক'রে ? তখনও একটা টিন-ভরা সিকি দুয়ানি আমাদের কাছে রয়েছে—তাই একদিন যারা আমাদের প্রাণ রক্ষার জন্যে নিজেদের প্রাণকে তুচ্ছ করতে দ্বিধা করে নি, তাদের কাছ থেকেই আমরা প্রাণভয়ে পলায়ন করলুম।

তার পর একদিন বিনা মাশুলে তানসেনের দেশে এসে উপস্থিত হওয়া গেল গোয়ালিয়র ভরতপুরের চেয়ে অনেক বড় শহর। অনেক লোকজন বাজার হাট জমজম করছে সেখানে। এবারে দেখে-শুনে একটা ভাল ধর্মশালায় আশ্রয় নেওয়া গেল।

প্রথমে কয়েকদিন বিভিন্ন পল্লীতে ঘুরে ঘুরে শহরটাকে ভাল ক'রে বোঝবার চেষ্টা করা গেল। কিন্তু শহর বোঝা, লোক বোঝা আমাদের কাছে সবই বৃথা। অতি ভাল শহরও আমাদের বরাতে খারাপ দাঁড়িয়ে যায়, অতি ভাল লোকও মন্দ লোকে পরিণত হয়। আমাদের অলক্ষ্যে ব'সে যিনি কলকাঠি নাড়াচাড়া করছেন, তাঁর সঙ্গে বোঝাপড়া করি কি ক'রে! কি জিনিস ঘুষ দিলে যে তিনি তুষ্ট হয়ে আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবেন তার হদিস তো কিছুই পাই না।

অনেক ভেবে-চিন্তে তিন মাথা এক হয়ে পরামর্শ ক'রে ঠিক করা গেল, আপাতত ব্যবসা করার কল্পনা ত্যাগ করাই ভাল। প্রথমে চাকরির চেষ্টা করা যাক—তার পরে চাকরি করতে করতে একটা হদিস লেগে যেতে পারে।

গোয়ালিয়র শহরে বিস্তর মহারাষ্ট্রীয়ের বাস। উকিল, ডাক্তার, ব্যবসাদার, সরকারী চাকুরে প্রভৃতি অনেক প্রতিষ্ঠাবান মহারাষ্ট্রীয় সে সময় সেখানে বাস করতেন। মোট কথা, সেই রাজ্যটাই তো তাদের। এ ছাড়া মুসলমান ও অন্যান্য প্রদেশের হিন্দুদের সংখ্যাও কিছু কম ছিল না।

গোয়ালিয়র সঙ্গীতের রাজ্য। সেই তানসেন থেকে আরম্ভ ক'রে গত শতাব্দীর হদ্দ হস্সু খাঁ অবধি গোয়ালিয়র শহর বড় বড় গুণীর আবাসস্থল ছিল। আমরা যে সময় সেখানে গিয়েছিলুম, সে সময় জনসাধারণের মধ্যে গান-বাজনার খুবই চর্চা ছিল। তা ছাড়া ভারতবিখ্যাত কয়েকজন বড় গাইয়ে ও বাজিয়ে মহারাজার দরবারে বেতনভুক ছিলেন। এঁদের বড় মেজো ও ছোট চেলায় শহর তখন ভর্তি ছিল। পুরুষ ছাড়া জনকয়েক নাম-করা গাইয়ে বাইজীও সে সময় থাকতেন সেখানে। দেখে-শুনে মনে হ'ল, একটা ক'রে চাকরি সেখানে জুটিয়ে নেওয়া খুব কঠিন হবে না।

আমরা যে ধর্মশালায় উঠেছিলুম, সেখানকার রক্ষক বাঙালী দেখে আমাদের সঙ্গে সেধে আলাপচারী করত। সকাল-সন্ধ্যায় তার আড্ডায় অনেক মুরুব্বী-গোছের লোক যাতায়াত করত। তারাও আমাদের আশ্বাস দিতে লাগল—তোমরা কাজের লোক, এখানে একটা কিছু লেগে যাবেই যাবে।

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে আমরা তিনজনে মিলে বেরুতে লাগলুম চাকরির সন্ধানে। আমরা ঠিক করেছিলুম যে-কোনও কাজ—তা সে জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ—যা জোটে তাই করব। একটা কিছু অবলম্বন পেলে তাই ধ'রেই ওঠা যাবে।

তিনজনে মিলে বাড়ি বাড়ি ঘুরতে আরম্ভ ক'রে দিলুম—হ্যাঁগা, লোক রাখবে? সকলেই বলে, না।

সকাল বিকেল ঘোরাই সার হতে লাগল। শেষকালে ধর্মশালারই একজন পরামর্শ দিলে—তিনজনকে একসঙ্গে দেখলে কেউ রাখতে চাইবে না—একজন একজন ক'রে চেষ্টা কর।

কথাটা আমাদের মনে লাগল। পরের দিন থেকে আমরা আলাদা আলাদা এক-একদিকে বেরিয়ে পড়তে লাগলুম। বেলা বারোটা অবধি পথে পথে দুয়ারে দুয়ারে চাকরির চেষ্টায় ঘুরে ধর্মশালায় ফিরে এসে নিজের নিজের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা বলাবলি করতুম। একদিন জনার্দন বললে, এক গৃহস্থ তাকে দেখে দয়াপরবশ হয়ে পেট ভ'রে খাইয়েছে।

একদিন এক বাড়িতে আমি কাজের চেষ্টায় গিয়েছি। একটি আধাবয়সী স্ত্রীলোক, বোধ হয় সেই বাড়ির গিন্নী হবে, আমায় জিজ্ঞাসা করলে, তোমার খাওয়া হয়েছে?

আমি 'না' বলায় সে খান-দুয়েক গরম রুটি ও তার ওপরে এক ছিটে ঘন ডাল আমার হাতে আলগোছে ফেলে দিয়ে বললে, খাও।

ডালটুকু তখুনি চেটে মেরে দিয়ে রুটি দুখানা পকেটে পুরে ধর্মশালায় ফিরে এসে সকলে মিলে হাসাহাসি করতে করতে খাওয়া গেল।

এর কিছুকাল পরে অনেক দিন ধ'রে রুটি তরকারি পকেটে পুরতে হয়েছিল—সে কথা যথাস্থানে বলব। সেদিন সেই ভিক্ষের রুটি খেতে খেতে সুকান্ত বললে, ওঃ, উন্নতি যা করা যাচ্ছে, জ্ঞাত-গুষ্টির কেউ টের পেলে হিংসেয় বুক ফেটে ম'রে যাবে।

একদিন এই রকম ক'রে পথে পথে দোরে দোরে চাকরির চেষ্টায় ঘুরে বেড়াচ্ছি, এমন সময় একজনদের বৈঠকখানায় গানের আসর বসেছে দেখে সেখানে দাঁড়িয়ে গেলুম। একজন লোক প্রাণপণ শক্তিতে দুম্ তারা নারা ক'রে চেঁচাচ্ছে আর একজন তবলা চাঁটাচ্ছে—দু-চারজন লোকও তাদের ঘিরে ব'সে তারিফ করছে। আমি একটু একটু অগ্রসর হতে হতে বাড়ির মধ্যে বেশ খানিকটা ঢুকে গিয়েছি, এমন সময় দেখি, একটা বাচ্চা মেয়ে—বোধ হয় আট-দশ মাসের বেশি বয়স হবে না—বনবন ক'রে হামাগুড়ি দিতে দিতে রাস্তার দিকে এগিয়ে চলেছে। তার কোমরে রূপোর পাটা, গলায় আমড়ার মতন রূপোর একটা বল ঝুলছে। মেয়েটা আমাকে ছাড়িয়ে দরজার কাছ

অবধি এগিয়ে যাওয়ায় আমি ফিরে গিয়ে তাকে তুলে বাড়ির মধ্যে নিয়ে গেলুম। সেখানে কয়েকবার 'মাইজী' 'মাইজী' 'মাতাজী' ব'লে ডাক দিতেই একটি মহারাষ্ট্রীয় মহিলা বেরিয়ে এলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এ কি আপনাদের মেয়ে?

মহিলাটি এগিয়ে এসে টপ ক'রে বাচ্চাটিকে আমার কোল থেকে নিয়ে নিলেন। আমি বললুম, মাইজী, বাচ্চা এখন হামা দিতে শিখেছে—ওকে এখন সাবধানে রাখতে হয়। দেখুন, রাস্তায় বেরিয়ে গিয়েছিল। ভাগ্যে আমার চোখে পড়েছিল নইলে নির্ঘাত আজ গাড়িচাপা পড়ত। কোন চোর-ডাকাতের হাতে পড়লে ওকে গয়নার জন্যে মেরে পর্যন্ত ফেলতে পারে।

আমার কথা শুনে মেয়ের মা বাচ্চাটিকে কোলে চেপে ধ'রে কাঁদতে শুরু ক'রে দিলে। আমি বললুম, কাঁদবেন না মা। মেয়ের তো কিছু হয় নি—ভবিষ্যতে ওকে সাবধানে রাখবেন।

—তুমি কে? তোমাকে তো কখনও দেখি নি!

—আমি বিদেশী, এখানে এসেছি চাকরির সন্ধানে। গান শুনে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলুম।

—তোমার মা-বাপ নেই? আত্মীয়-স্বজন কেউ নেই?

—না মা, দুনিয়ায় কেউ থাকলে কি আর দেশ ছেড়ে এত দূরে চাকরির জন্যে আসি! আমি আর আমার দুটি বন্ধু এসেছি এখানে পেটের দায়ে।

—তোমার দেশে দুর্ভিক্ষ হয়েছে বুঝি?

—ভয়ানক দুর্ভিক্ষ মা, পয়সাওয়ালা লোক সব খেতে না পেয়ে ম'রে যাচ্ছে।

—তুমি কি জাত?

—আমরা বেনে। আপনাদের এখানে যেমন বৈশ্য আছে না, সেই জাত।

—তোমার পৈতে আছে?

—আছে।

—তুমি আমাদের বাড়িতে কাজ করবে? কাজ খুব বেশি নয়, এই ঘর-গৃহস্থালির কাজ। ঝাড়ু দেওয়া, জিনিসপত্তর সাফ রাখা, বাড়ির কর্তার ফরমাজ খাটা আর মাঝে মাঝে এই বাচ্চাকে ধরা।

আমি জাহাজে কখনও কাজ করি নি। শুনেছি, সমুদ্রের মাঝখানে দারুণ ঝড়ের মধ্যে সেই টলটলায়মান অর্ণবপোতের প্রধান মাস্তুলে চ'ড়ে পাল নামানো খুবই শক্ত কাজ। এ সম্বন্ধে আমি কোনও সন্দেহ প্রকাশ করছি না, কিন্তু ছোট ছেলে রাখাও যে কতখানি শক্ত কাজ তা যে না করেছে সে কিছুতেই বুঝতে পারবে না।

যা হোক, সেদিন অপ্রত্যাশিতভাবে সেই গিন্নীর মুখে কাজের কথা শুনে একেবারে আকাশের চাঁদ হাতে পেয়ে গেলুম। বললুম, করব—কি মাইনে দেবেন?

গিন্নী বললেন, মাইনের কথা কর্তার সঙ্গে হবে। যা দস্তুর তাই পাবে।

কিছুক্ষণ কি ভেবে নিয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি মাছ মাংস এ সব খাও না তো?

এক হাত জিভ বের ক'রে দুই হাত দুই কানে ঠেকিয়ে বললাম, রাম রাম, ও-সব আমরা খাই না।

গিন্নী বললেন, কিছু মনে ক'রো না—তোমাদের জাত ওই সব জিনিস খায় কি না—

বললাম, যারা খায় তারা খায়, আমরা ও-সব জিনিস ছুঁই না।

—আমাদের বাড়িতে কাজ করতে হ'লে এইখানেই থাকতে হবে, রোজ স্নান করতে হবে।

আমি সব তাতেই হাঁ দিয়ে যাচ্ছি, এমন সময় বাড়ির কর্তা এসে হাজির হলেন। আমার সম্বন্ধে স্বামী-স্ত্রীতে কিছুক্ষণ কথাবার্তা হ'ল। তার পরে কর্তা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কাজ করবে?

—করব হুজুর।

—কিন্তু মাইনের কথা এখন নয়। এক মাস কাজ করবার পর কি রকম কাজ কর তা দেখে মাইনে ঠিক হবে।

তখনকার মতন বিদায় নিয়ে চ'লে যাচ্ছিলুম, এমন সময়ে গিন্নীমা বললেন, কোথায় যাচ্ছ?

—যাচ্ছি আমার মিত্ররা যেখানে আছে সেখানে। তাদের বলতে হবে। আমার ধুতি ও একটা বালিশ আছে নিয়ে আসব। তা ছাড়া খেতে-টেতেও তো হবে।

গিন্নীমা বললেন, হ্যাঁ, জিনিসপত্র এনে এখানেই খেয়ো।

এদের কাছ থেকে তখনকার মতন ছুটি নিয়ে এক রকম ছুটতে ছুটতে ধর্মশালায় এসে হাজির হলুম। চাকরি জুটেছে—দেবদুর্লভ চাকরি—কিন্তু এসে দেখি, বন্ধুরা তখনও ফেরে নি। তখুনি ছুটলুম ইস্টিশানের দিকে। সেখানে একদিন এক ফেরিওয়ালাকে পৈতে বিক্রি করতে দেখেছিলুম। সেখান থেকে তিনটে ময়লা দেখে পৈতে কিনে ধর্মশালায় ফিরে এসে দেখি, স্থকান্ত ব'সে রয়েছে—কিছুক্ষণের মধ্যে জনার্দনও ফিরে এল। আমার একটা কাজ জুটেছে শুনে বেচারারা একেবারে দ'মে গেল। নিজেদের সম্বন্ধে তারা অত্যন্ত হতাশ হয়ে পড়েছে দেখে আমি তাদের বোঝাবার চেষ্টা করলুম যে, একজনের কাজ হওয়া মানে আমাদের সকলেরই কাজ হওয়া। অন্য জায়গায় থাকলেও তাদের সঙ্গে প্রতিদিনই দেখা-সাক্ষাৎ হবে—দুদিন পরে তাদেরও কাজ লেগে যাবে, ইত্যাদি।

যাই হোক, সেদিন স্নান করবার সময় ধর্মশালার কুয়োর ধারে আমাদের উপনয়ন হয়ে গেল। তিনজনে পৈতে গলায় দিয়ে সূর্যদেবকে প্রণাম ক'রে জামা গায়ে চড়িয়ে ঘরে ফিরে এলুম। বন্ধুদের সঙ্গে কথা হ'ল যে, প্রতিদিন দুপুরবেলা ঘণ্টা দুয়েক ক'রে তাদের কাছে থাকতে হবে। এতে যদি মনিবরা আপত্তি করে তো চাকরি ছেড়ে দিতে হবে। সেদিন ধর্মশালাতেই তাদের সঙ্গে খেতে হ'ল—আবার কবে একসঙ্গে ব'সে খাওয়া হবে তার ঠিক কি! খাওয়া-দাওয়ার

পর চাকুরিস্থলের দিকে পা বাড়ানো গেল। জনার্দন ও সুকান্ত আমার সঙ্গে এসে মনিবের বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে গেল। হঠাৎ আমাকে ছাড়তে হবে মনে ক'রে বেচারীরা খুবই মুষড়ে পড়েছে দেখে আরও কিছুক্ষণ তাদের সঙ্গে রাস্তায় দাঁড়িয়ে বেশ ক'রে বিড়ি টেনে মনিব-বাড়িতে ঢুকে পড়লুম।

প্রথম চাকরি—আমার জীবনের একটি প্রধান ঘটনা। আমি সারা জীবন ধ'রে দাসত্বই ক'রে এসেছি। সঙ্গে সঙ্গে দাসত্বের সব রকম হীনতাই সহ্য করতে হয়েছে। দাসত্ব করতে করতে যখন তা অসহ্য হয়েছে তখন ছেড়ে দিয়ে ব্যবসা করেছি; কিন্তু দাসত্ব কিংবা ব্যবসা কিছুই আমার দ্বারা ভাল ক'রে হয়ে ওঠে নি। সৃষ্টিকর্তা আমাকে কেন যে এখানে পাঠিয়েছিলেন, জীবনে আমার কি করা উচিত ছিল, আজও তা ঠিক করতে পারি নি। তবুও আমার জীবনের প্রথম মনিব-বাড়ির কথা এই জাতকে থাকা উচিত।

আমার প্রথম মনিব ছিলেন মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ। বোম্বাই, পুণা, নাসিক প্রভৃতি জায়গায় যে সব আচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ দেখতে পাওয়া যেত (এখন যায় কি না বলতে পারি না) ইনি ঠিক সে রকম ব্রাহ্মণ ছিলেন না। ওই সব জায়গাকার ব্রাহ্মণ বা ব্রাহ্মণেতর লোকদের সঙ্গে গোয়ালিয়র, ইন্দোর, কোল্‌হাপুর প্রভৃতি দেশীয় রাজ্যের লোকদের অনেক তফাত আছে আচারে ও বিচারে। বিশেষজ্ঞ মাত্রেরই জানা আছে রেয়াসতের অর্থাৎ দেশীয় রাজ্যসমূহের লোকেরা আচারে বিচারে, অশনে বসনে, বাক্যে ও ব্যবহারে বাইরের লোকদের চাইতে অনেক বেশি বিলাসী হয়ে থাকে। স্বাধীনতা পাবার পর সেখানকার কি অবস্থা হয়েছে তা ঠিক বলতে পারি না, তবে আমি যে সময়ের কথা বলছি, অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে সেখানকার অবস্থা ওই রকমই ছিল।

আমার মনিব রাজসরকারের কি একটা চাকরি করতেন। কিন্তু চাকরি ছাড়াও তাঁর অর্থাগমের অন্য রাস্তাও ছিল—তবে সেটা কি তা আমার জানা নেই, জানবার চেষ্টাও কখনও করি নি।

মনিবের সংসার খুব বড় ছিল না। তাঁর দুটি বিবাহ এবং দুই স্ত্রীই তখনও

বর্তমান ছিলেন। কর্তাকে দেখলে মনে হ'ত বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি হবে। কিন্তু বড় গিন্নীকে দেখলে মনে হ'ত, ষাট পেরিয়ে গিয়েছে। বড় গিন্নীর মাথার মাঝখানটি ছিল একেবারে ফাঁকা। মাথার চার পাশে যে কয়েক গাছা চুল তখনও অবশিষ্ট ছিল, সেগুলি সর্বদা-আঁচড়ানো ও খোঁপা-বাঁধা থাকত। রাত থাকতে উঠে তিনি পূজা-অর্চনা করতেন এবং রান্নার জন্যে ও সকলের পানীয় জল নিজ হাতে কুয়ো থেকে তুলতেন—সেই সকালেই স্নান সেরে জল তোলা ইত্যাদি হ'ত। রান্নাও স্বহস্তে করতেন, অবশ্যি তাঁর সতীনও তাঁকে এ কাজে সাহায্য করতেন। দুই সতীনে ঝগড়া বচসা হতে কখনও দেখি নি।

বড় গিন্নীকে অতিশয় দয়াশীলা ব'লে মনে হ'ত। আমাকে তিনি অতি যত্নের সঙ্গে খেতে দিতেন। খাবার সময় অনেক দিন তাঁর ছেলেও আমার কাছে বসত; চাকর ও পুত্রের মধ্যে কোন পক্ষপাতিত্ব করতে কখনও দেখি নি।

বাড়ির ছোট গিন্নী ছিলেন বয়সে তরুণী। তাঁকে ত্রিশ বছরের বেশি ব'লে মনে হ'ত না। দেখতে শুনতে মন্দ ছিলেন না। সকলের সঙ্গেই হেসে কথা বলতেন। এঁর এক মেয়ে—যাকে উপলক্ষ্য ক'রে আমার এখানে চাকরি আমি তাঁর মেয়ের বায়না সামলাতুম ব'লে আমার ওপরে তিনি ছিলেন ভারি সদয়। মোট কথা, এক স্বামী ছাড়া তিনি বিশ্বসুদ্ধ লোককেই পছন্দ করতেন, কিন্তু স্বামীকে দেখলেই তাঁর মেজাজ যেত বিগড়ে।

মনিব অর্থাৎ বাড়ির কর্তার নাম ছিল সদাশিব। কিন্তু নাম সদাশিব হ'লে কি হবে, এমন তেএঁটে লোক আমি জীবনে খুব কমই দেখেছি।

বেশ রাত থাকতে উঠে তিনি রোজ পায়খানায় যেতেন। পায়খানার কাছেই একটা বড় গামলা-গোছের পাত্র থাকত—প্রতিদিন রাতে ঘুমুতে যাবার আগে কুয়ো থেকে জল তুলে আমাকে সেই পাত্রটি ভ'রে রাখতে হ'ত। কিন্তু এই বাসি জলে শৌচ করা মনিব মশায় মোটেই পছন্দ করতেন না। পায়খানায় যাবার আগে আমাকে ধাক্কা দিয়ে ঘুম থেকে তুলে—এত বেলা অবধি ঘুমুচ্ছি ব'লে তিরস্কার করতেন—বলা বাহুল্য তখনও ঘোরতর অন্ধকার থাকত। আমি উঠে

একটা ঘটির গলায় দড়ি লাগিয়ে কুয়ো থেকে জল তুলে তাঁর ঘটিতে ঢেলে দিতুম, তিনি সেই জল নিয়ে পায়খানায় ঢুকতেন। এততেও নিস্তার ছিল না, কারণ কখন তিনি শ্রীমন্দির থেকে নিষ্ক্রান্ত হবেন—সেই আশায় আমাকে বাইরে ব'সে থাকতে হ'ত। প্রায় ঘণ্টাখানেক সেখানে কাটিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলে আবার জল তুলে দিতে হ'ত ঘটির পর ঘটি। কারণ, পায়খানা থেকে বেরিয়ে ভাল ক'রে মুখবিম্বর পরিষ্কার না ক'রে তিনি শুতে যেতে পারতেন না। এর পর মনিব মশায় ফিরে যেতেন—যেদিন যেখানে শোবার পালা থাকত। সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও সেখানে যেতে হ'ত এবং শুয়ে পড়লে পদসেবা এবং সর্বাঙ্গ সংবাহন করতে হ'ত প্রায় ঘণ্টা খানেক ধ'রে। ভোর হয়ে গেলে তিনি উঠে স্নানাদি করতেন এবং প্রায় দিনই তাঁকে স্নানের জল তুলে দিতে হ'ত। স্নান সেরে কর্তা প্রায় ঘণ্টাখানেক ধ'রে পুজো-আহ্নিক করতেন। ইতিমধ্যে বৈঠকখানা বা অন্য শয়নমন্দির থেকে তাঁর বিছানাপত্র তুলে ঘর পরিষ্কার করতে হ'ত। পুজো সেরে তিনি বৈঠকখানা-ঘরে ঢুকে দরজায় খিল লাগিয়ে তম্বুরার সঙ্গে গলা সাধতেন। প্রায় ঘণ্টা দুয়েক ধ'রে পাড়ার লোককে ব্যতিব্যস্ত ক'রে সামান্য কিছু জলযোগ সেরে রাজকার্যে বেরুতেন। বেলা প্রায় একটার সময় কার্য থেকে ফিরে এসে আহার করে লাগাতেন ঘুম একেবারে বেলা পাঁচটা অবধি। প্রায় প্রতি সন্ধ্যায় কখনও ছোট, কখনও বড় গান-বাজনার আসর বসত। অনেক বড় গুণী আসতেন গাইতে বাজাতে এবং তা শোনবার ও তারিফ করবার জন্যে অনেক ব্যক্তি নিমন্ত্রিত হতেন। কর্তাও ভাল গাইতেন ও কোন কোন দিন একা তিনিই আসর জমাতেন। বড় বৈঠকখানা-ঘরের পাশে একখানি অপেক্ষাকৃত ছোট ঘর ছিল। এই ঘরের দেয়ালে গেলাপে মোড়া বিরাট সব তম্বুরা ঝুলত। তা ছাড়া, বেঁটে মোটা লম্বা রোগা নানা আকারের খয়ের, রক্তচন্দন, গাম্ভেরী প্রভৃতি কাঠের তবলা আর মাটি ও তামার ওপরে রূপোলী গিল্‌টি করা ছোট বড় ডুগিও সাজানো থাকত। এই সব যন্ত্র ও তা ছাড়া তবলা ঠোকবার হাতুড়ির পর্যন্ত তদ্বির আমাকে করতে হ'ত। যেদিন বড় আসর বসত এবং

মাননীয় ব্যক্তির শুভাগমন হ'ত, সেদিন মদ্যাদি এনে এই ছোট ঘরখানিতে জমা রাখা হ'ত। রসিকেরা মধ্যে মধ্যে আসর থেকে উঠে এই ঘরে গিয়ে ঢুকু-ঢুকু চালাতেন। তা না হ'লে অধিকাংশ দিনই বড় বৈঠকখানাতে ব'সেই মদ্যাদি ও নানা রকম ভাজাভুজি চলত। আমাদের কর্তা প্রায় প্রতিদিনই প্রচুর টেনে একেবারে ট্যাঁ হয়ে পড়তেন। রাত্রির আসর ভাঙলে—তা কোনদিন দশটায়, কোনদিন বারোটায়, কোনদিন বা দুটোয়—আসরের চাদর ইত্যাদি তুলে ঘর ঝাঁট দিতে হ'ত। তার পর মনিব মহাপুরুষ আমার ওপর ভর দিয়ে ভেতর-বাড়ির দিকে অগ্রসর হতেন। দুটি উঠোন পার হয়ে সিঁড়ি ভেঙে ছাদ পেরিয়ে ছোট গিন্নীর ঘর। ছোট গিন্নী তো দূরের কথা, সংসারের সব গিন্নীই সেই গভীর রাত্রে ঘুমের কোলে আত্মসমর্পণ করেছেন। সেই রাতে দরজা ঠেঙিয়ে তাঁকে তোলা হ'ত। সে ভদ্রমহিলা জেগে উঠে বাতি জ্বালিয়ে দরজা খুলে আমার কণ্ঠলগ্ন মাতাল স্বামীকে দেখলেই উঠতেন জ্ব'লে। তার পরে শুরু হ'ত দাম্পত্য কলহ—কবি দাম্পত্য কলহকে বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া ব'লে উড়িয়ে দিয়েছেন, কিন্তু আমার বরাতে সবই উলটো। কারণ এ ক্ষেত্রে আরম্ভ হ'ত অতি লঘুভাবে, কিন্তু বাড়তে বাড়তে শেষে ঠেঙাঠেঙি ব্যাপারে পরিণত হ'ত। তাঁদের স্বামী-স্ত্রীতে ঝগড়া, তাতে আমার বলবার কিছু ছিল না; কিন্তু আমাকে ঠায় সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে হ'ত। কারণ ঝগড়ার পরে কর্তা মশায় শয়নমন্দিরে যদি ঢোকবার অনুমতি পেতেন তো সেইখানেই আমার দিনের কর্ম শেষ হ'ত, নচেৎ আমায় দুর্ভোগ ভুগতে হ'ত আরও।

ব্রাহ্মণ-সন্তানের মদ্যপানে ছিল দেবীর আপত্তি। অন্তত মত্ত অবস্থায় স্বামীকে শয়নমন্দিরে প্রবেশ করবার অধিকার তিনি দিতেন না। কিন্তু স্যাবার যুক্তি ছিল, মাল না টেনে তরুণী ভার্যার কাছে যাওয়ার কোন মানেই হয় না। দুজনের পক্ষেই যুক্তি ছিল, কিন্তু স্যাবা প্রায় প্রতিদিনই তাড়িত হতেন এবং তার পরে তিনি এত ভগ্নোদ্যম ও হতাশ হয়ে পড়তেন যে, তাঁকে প্রায় কাঁধে ক'রে নিয়ে এসে আবার বৈঠকখানায় শুইয়ে দিতে হ'ত। এই জন্যেই ঝগড়ার

যতক্ষণ একটা ফয়সালা না হয় ততক্ষণ কর্তা আমাকে ছাড়তে পারতেন না। কিন্তু বৈঠকখানায় শুইয়ে দিয়েই কি নিশ্চিন্ত হবার জো ছিল! সেখানে তাঁর পা টিপতে ও কথার অর্থাৎ বকবকানির সায় দিতে হ'ত। যেমন—

—এই বাঙালী! আরে এই বাঙালী!

—শালা, জবাব দিচ্ছিস নে কেন? তোকে আমি ব'লে রাখছি, কখনও বিয়ে করিস না। আমার দুর্দশা দেখছিস তো?

হয়তো বললুম, হুজুর, আপনি জোর ক'রে ঢুকে পড়লেই তো পারেন।

—শালা, তোর কিছু বুদ্ধি নেই। আমি জোর ক'রে ঢুকে পড়লে বিবি বেরিয়ে প'ড়ে অন্যত্র নিশি যাপন করবেন। আচ্ছা, কাল যদি ঘরে ঢুকতে না দেয়, তবে পরশুই আমি আবার একটা বিয়ে করব।

এই রকম বকতে বকতে তিনি ঘুমিয়ে পড়লে তবে আমি শুতে যেতুম।

সদাশিবের আমার বয়সী এক ছেলে ছিল বড় গিন্নীর দরুন, তার নাম ছিল বিনায়ক। সে ছিল বাড়ির দুলাল। দুই মা-ই তাকে খুব আদর দিতেন। বয়সের ধর্মে বিনায়কের সঙ্গে আমার বন্ধুত্বই দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। সে ইস্কুলে পড়ত এবং বিকেলবেলা বাড়িতে ফিরে জল-টল খেয়ে মাঠে খেলতে যেত। কিছুদিন বাদে সে আমাকেও খেলার মাঠে নিয়ে যেতে আরম্ভ করলে। সেখানে অনেক সমবয়সী ছেলে খেলা করত। দু-একদিন যাবার পর আমি সুকান্ত ও জনার্দনকেও সেই খেলার দলে ভিড়িয়ে নিলুম। আমরা সকলেই তাদের চাইতে ভাল খেলতে পারতুম ব'লে সকলেরই প্রিয় হয়ে উঠতে লাগলুম। তখন ক্রিকেট শেষ হয়ে ফুটবলের মরসুম পড়ছে। সেই সময় কে ক্যাপ্টেন হবে, কে সেক্রেটারি হবে—এই নিয়ে খেলার শেষে তাদের মধ্যে খুব আলোচনা হ'ত, মধ্যে মধ্যে তারা আমাদেরও মতামত জানতে চাইত। শুধু তাই নয়, বিনায়ক ও তার বন্ধুরা তখন নতুন বিড়ি-সিগারেট টানতে শিখেছিল। তারা বাড়ি থেকে পয়সা নিয়ে আসত, আর তাই দিয়ে সিগারেট বিড়ি ভাজাভুজি খাওয়া চলত।

আমাদের এই খেলার মাঠে খুব উৎসাহী সভ্য ছিল তুক্কো। বিনায়কদের পাড়াতেই ছিল তুক্কোদের বাড়ি। সে পাড়ার মধ্যে তুক্কোরা বেশ অবস্থাপন্ন পরিবার ছিল। তার বাবা ও ঠাকুরদা দুজনেই ছিলেন ওখানকার বড় উকিল।

খেলার মাঠে কাপ্তেনি করতে না পারলেও খেলার পরের আড্ডায় তুক্কোই ছিল কাপ্তেন। সে প্রায় রোজই বাপ-ঠাকুরদার পকেট মেরে দু চার আট আনা নিয়ে আসত আর তাই দিয়ে বিকেলে আমাদের মহা ভোজ হ'ত।

তুক্কোদের সঙ্গে বিনায়কদের কি একটা সম্বন্ধ থাকায় দুই বাড়ির মহিলারাই পরস্পরের বাড়ি যাতায়াত করতেন। একদিন তুক্কোর ঠাকুরমা আমাকে বললেন, আমার কোনও জানাশোনা লোক তাঁদের বাড়ির জন্যে দিতে পারি কি না! আমি জনার্দনের নাম করায় তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, সে কি আগে কোথাও কাজ-টাজ করেছে?

—হ্যাঁ, ভরতপুরের মস্ত রইস রাজা রামসিংয়ের ওখানে কাজ করেছে।

বেশি কিছু বলতে হ'ল না, তুক্কোদের বাড়িতে জনার্দনের কাজ হয়ে গেল, মাইনে হ'ল তিন টাকা।

জনার্দনের কাজ হয়ে যাওয়ায় সুকান্তর হ'ল মুশকিল। একলা সারাদিন ও সারারাত সে কাটাতে পারে না। শেষকালে রাত্রিবেলা তাকে আমাদের বাড়িতে শুতে বললুম। সে এসে শুতো বটে, কিন্তু শেষরাত্রে মনিব আমাকে ডাকতে আসার আগেই তাকে বের ক'রে দিতে হ'ত। কিন্তু বেশিদিন সে রকম করতেও সাহস হ'ল না। পাছে কোন অনর্থ ঘটে—এই ভয়ে একদিন ছোট গিন্নীর কাছে সুকান্তর জন্যে আশ্রয় ভিক্ষা করা গেল। বললাম, সে রাত্রে শোবে, অন্য কোথাও চাকরি হ'লেই চ'লে যাবে। ছোট গিন্নী বড় গিন্নীর সঙ্গে পরামর্শ ক'রে সুকান্তকে সেখানে শোবার অনুমতি দিলেন।

একটু একটু ক'রে সুকান্তকেও বাড়ির সকলে চিনে ফেললে। ক্রমে তার ওপরে একটু একটু ক'রে ফাই-ফরমাসের ভারও পড়তে লাগল, অবশ্য বেশি ফাই-ফরমাস করতেন মনিব মশায়।

কিছুদিন এই রকম চলতে চলতে একদিন বড় গিন্নী সুকান্তকে বললেন, তুমি কোথায় এখানে-সেখানে খেয়ে বেড়াও, আমাদের এখানেই খেলে পার! আমাদের বাড়িতে থেকে অন্য কোথাও খেলে আমাদের নিন্দে হবে যে!

এই রকম যখন চলেছে, তখন মাস কাবার হয়ে যাওয়ায় মনিবের কাছে মাইনে চাইলুম। মাইনের কথা শুনে তিনি একেবারে খাপ্পা হয়ে আমাকে প্রহার করতে উদ্যত হলেন। তারপর চোখ পাকিয়ে যা বললেন তার সোজা অর্থ হচ্ছে যে, দু ব্যাটায় প'ড়ে এখানে ব'সে ব'সে দু-বেলা খ্যাঁট লাগাচ্ছ, আবার এর ওপরে মাইনে!! শালা বাঙালী তো ভারি নেমকহারামের জাত! ভালভাবে এখানে খাও-দাও, থাক, মাইনের কথা তুলো না—তা হ'লে অন্যত্র পথ দেখ।

কিছুকাল আগে জনার্দনের যখন ও-বাড়িতে তিন টাকা মাইনে হয়েছিল, তখন ছোট গিন্নী একবার আমায় আভাস দিয়েছিলেন যে, আমিও মাসে তিন টাকা ক'রে পাব। কিন্তু মনিব মশায়ের ওই মূর্তি দেখে বড়ই আশাহত হলুম।

রাত্রে অতি অল্প সময়ই আমি ঘুমুতে পেতুম। কারণ রাত্রি এগারো-বারোটা পর্যন্ত মনিবের ঘরে চলত হল্লোড়, গান ও আড্ডা। সেই ঘর পরিষ্কার ক'রে মনিবকে বহন ক'রে অন্তঃপুরে নিয়ে যাওয়া ও সেখান থেকে আবার নিয়ে আসা—এই করতেই রাত্রি প্রায় একটা বাজত। ওদিকে বেশ রাত থাকতেই উঠতে হ'ত মনিবকে পায়খানার জল দেবার জন্যে। কয়েক ঘণ্টা সময়ের মধ্যে প্রথম আধ ঘণ্টা আমার কাটত ওই তিন টাকা মাইনের ধ্যানে। টাকাটা পেলে জমানো হবে কি খরচ করা হবে! ওই তিন টাকার মধ্যে কতখানি খরচ ও কতখানি জমানো সম্ভব হতে পারে, তা নিয়ে নিজেদের মধ্যেও আলোচনা কিছু কম হ'ত না। আমরা যে চিরদিন চাকরি করব না, এটা এক রকম ঠিকই ছিল। চাকরি-বাকরি ক'রে কিছু জমিয়ে নিয়ে ব্যবসা করব ব'লেই যে কোন

চাকরি নিতে দ্বিধা করি নি। কিন্তু তার ফল এই হ'ল দেখে সত্যিই বড় দুঃখ বোধ হ'ল।

এদের বাড়ি সেই শেষ রাত্রি থেকে রাত্রি বারোটা-একটা অবধি চাকরি—তার ওপর খাওয়া ছিল অতি জঘন্য। জঘন্য এই জন্যে বলছি যে, সাধারণ গৃহস্থ মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণের বাড়িতে এক-আধদিন শখ ক'রে খাওয়া চলতে পারে—সে খাওয়া বেশিদিন খেলে বাঙালীর ছেলে বাঁচে না।

আমি সুকান্তর সঙ্গে পরামর্শ ক'রে ঠিক করলুম, বিনা মাইনের এই চাকরি আর করব না। কিন্তু কর্তা যতই নির্দয় হোন না কেন, দুই মা-ই ছিলেন দয়াবতী। আমরা চ'লে যাব শুনে তাঁরা আপত্তি করতে লাগলেন। ছোট মা বলতে লাগলেন, তোমার রূপ ধ'রে ভগবান আমার লক্ষ্মীকে প্রাণে বাঁচিয়েছেন। তুমি অসন্তুষ্ট হয়ে চ'লে গেলে আমাদের অকল্যাণ হবে। তুমি মাসে মাসে যাতে ঠিকমত মাইনে পাও তার ব্যবস্থা আমি ক'রে দিচ্ছি—শুধু তোমার নয়, কান্তও যাতে মাইনে পায় তারও বন্দোবস্ত আমি করছি।

সে সময় গ্রহও বোধ হয় সুপ্রসন্ন ছিল, কারণ আমরা চ'লে যাব শুনে বিনায়ক এমন হাঙ্গামা লাগালে যে, তার বাবা 'বাপ বাপ' ব'লে আমার তিন টাকা মাইনে তো চুকিয়ে দিলেই, সুকান্ত, যার মাস পুরতে তখনও অনেক দেরি, তাকেও তিন টাকা দিয়ে দিলে।

একসঙ্গে ছটি টাকা তখুনি আমাদের বিস্কুটের বাক্সে বন্দী হ'ল।

আমরা বিকেলবেলায় খেলা সেরে কিছুক্ষণ বাজারে ঘুরে বাড়ি ফিরতুম। কারণ সেখানে পান সিগারেট ও নানা রকম খাদ্যদ্রব্যাদি পাওয়া যেত। সিগারেট দ্রব্যটির প্রতি তখন সরকারের এত কড়া নজর পড়ে নি। ব্যাটল্ এক্স, রেড ল্যাম্প, পেড্রো, কলম্বিয়া প্রভৃতি চলনসই সিগারেটের দাম ছিল ছ পয়সা প্যাকেট, আর রেলওয়ে, ট্যাব্স্ প্রভৃতি ভাল সিগারেটের দাম ছিল চার-পাঁচ পয়সা প্যাকেট অর্থাৎ দশটা। মোট কথা, চার আনা পয়সা জুটলে আমাদের আট-দশজনের ভাজা-ভুজি ও তৎসহ পান-সিগারেট অবধি চলত।

আমাদের রাস্তাতেই একটা বড় হোটেল পড়ত। হোটেলটা ছিল মুসলমানদের এবং নানা রকম মাংসের খাবার থালা ক'রে বাইরে সাজানো থাকত। একটা থালায় বড় বড় ভাজা মাছের টুকরো থাকত। একজন লোক সামনে ব'সে মোগলাই পরোটা ভাজত। সে যে কতরকম কায়দায় হাত ঘুরোতে থাকত তা আর কি বলব! লোকটা পরোটা ভাজছে কি মুগুর ভাঁজছে তা বোঝা মুশকিল হ'ত। সেই মচমচে ভাজা টাটকা পরোটা তাওয়া থেকে নামিয়ে রাখতে না রাখতে বিক্রি হয়ে যেত। আমরা রোজই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই পরোটা-ভাজার কায়দা দেখতুম।

একদিন সন্ধ্যাবেলা সেই রকম পরোটা-ভাজা দেখছি, এমন সময় বিনায়ক তুকোকে বললে, একদিন বেশ ক'রে মাংস দিয়ে পরোটা খেতে হবে তুকো।

দেখলুম, তুকোর তাতে কোনও আপত্তি নেই। জিজ্ঞাসা ক'রে বুঝতে পারা গেল যে, খাবার ইচ্ছেটা ষোল আনা থাকলেও তারা মাছ মাংস কখনও খায় নি। তার প্রথম কারণ এই যে, বাড়িতে যদি কেউ ঘুণাক্ষরে জানতে পারে তা হ'লে জ্যান্তে ছাল ছাড়িয়ে নেবে। বিশেষ ক'রে এখন তাদের পৈতে হয়ে গেছে। পৈতে হবার আগে মাছ মাংস খাওয়ার প্রায়শ্চিত্ত আছে, কিন্তু পৈতে হবার পর সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত তুষানল। অথচ পৈতে হবার পর থেকেই ওই পাপের প্রতি আকর্ষণ তাদের হয়েছে প্রবল। দ্বিতীয় বাধা হচ্ছে, দোকানে গিয়ে মাছ কিংবা মাংস কেনবার মতন সাহস আজও তারা সঞ্চয় ক'রে উঠতে পারে নি।

সেদিন আমাদের সঙ্গে গুটিচারেক ছেলে ছিল। সুকান্ত বললে, যদি পয়সা থাকে তো আমাকে দাও, আমি কিনে আনছি।

আমাদের তুকাজী অর্থাৎ তুকো তখুনি পকেট থেকে একটা সিকি বের ক'রে ফেললে।

দোকানদার এতক্ষণ আমাদের বেশ ক'রে লক্ষ্য করছিল। জনার্দন গিয়ে ; ভাজা চাইতে সে একটা কাগজের ঠোঙায় বেশ ক'রে মুড়ে-ঝুড়ে মাল

দিলে। তারপরে সেই মাছ-ভাজা খাওয়া নিয়ে এক ব্যাপার! দুটি ছেলে তো মুখে দিয়েই ওয়াক্ ওয়াক্ ক'রে বমি ক'রে ফেলে দিলে। আমাদের বিনায়ক বেশ ক'রে কাঁটা বেছে বেছে তিন-চারখানা ভাজা মেরে দিলে। গপ্ গপ্ ক'রে খেতে গিয়ে তুক্কোর গলায় বিঁধল কাঁটা। শেষকালে সে যায় আর কি! আমি তার মুখের মধ্যে হাত পুরে দিয়ে গলা থেকে ইয়া বড় একটা কাঁটা বের করলুম। তার থুতুর সঙ্গে রক্ত বেরুতে লাগল। গলার যন্ত্রণা ও রক্ত দেখে সে তো ভড়কে গেল। তারপরে এক জায়গা থেকে গরম চা খেয়ে তুক্কো একটু সুস্থ বোধ করায় সেদিন যে যার বাড়ি চ'লে গেল।

তুক্কোর গলার ব্যথা সারতে ক'দিন কেটে গেল। তারপর একদিন আমরা গরম টিকিয়া কাবাব কিনে খেলুম। কাবাব সকলের মুখে অমৃতের মত লাগল। এমন কি, সেদিন মাছ খেয়ে যারা জলচরের শত নিন্দা করেছিল, কাবাব খেয়ে তারা পণ্টক-নন্দনের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠল।

দিনে দিনে এই সন্ধ্যাযাত্রায় আমাদের সহযাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে লাগল। শেষকালে আমরা অন্য রাস্তা দিয়ে ঘুরে ঘুরে বাড়ি ফিরতে লাগলুম—আমাদের সঙ্গে কিছুক্ষণ ঘুরে অন্যরা সবাই কেটে পড়লে তখন আবার বাজারে ফিরে গিয়ে কাবাব খাওয়া হতে লাগল।

একদিন তুক্কো বাড়ি থেকে গোটা চারেক টাকা মেরে নিয়ে এল। আগেই বলেছি, তার বাবা ও ঠাকুরদা দুজনেই ওখানকার পসারওয়ালা উকিল ছিলেন। তাঁরা দুজনে আলাদা আলাদা জায়গায় টাকা রাখতেন আর তুক্কো দু জায়গা থেকেই কিছু কিছু সরাত। এতদিন সে চার আনা আট আনা, কখনও বা পুরো একটা টাকা মেরে আনত; কিন্তু কথায় বলে 'ঘটি চোর বাটি চোর হতে হতে সিঁদেল চোর'—সেদিন একেবারে চার-চারটে টাকা এনে সে বললে, আজ হোটেলে ঢুকে পরোটা ও মাংস খেতে হবে।

মাংসের গন্ধে গন্ধে আরও দুটি ছেলে জুটে গেল আমাদের সঙ্গে। খেলা-টেলা ফেলে বেশ বেলাবেলিই আমরা হোটেলের সামনে এসে দাঁড়ালুম।

কিন্তু হোটেলের মধ্যে ঢুকতে তাদের কারুর আর সাহস হয় না। আমরা তিন জন অর্থাৎ আমি জনার্দন ও সুকান্ত যতবার হোটেলের দরজার দিকে এগিয়ে যাই ওরা চারজন আমাদের পিছু পিছু খানিকটা এসে আবার ফিরে যায়। এমনি দু-চারবার করতেই হোটেলের একটি ছোকরা-মত চাকর বেরিয়ে এসে আমাকে ডাকলে, বাবুসাব শুনিয়ে!

ছেলেটি হোটেলের পাশেই একটা গলি দেখিয়ে দিয়ে বললে, আপনারা ওই গলিতে ঢুকে খানিকটা এগিয়ে গেলেই একটা দরজা দেখতে পাবেন, সেইখান দিয়ে চলে আসুন।

ছেলেটির নির্দিষ্ট পথে আমরা সবাই টুপ টুপ ক'রে গলিতে ঢুকে পড়লুম। তারপর একটু এগিয়ে গিয়ে একটা দরজা দিয়ে ঢুকেই দেখি, এক বিরাট ব্যাপার —সেটা হচ্ছে হোটেলের পেছনের একটা ঘর। ঘরখানা বেশ বড়। বড় রাস্তা থেকে হোটেলের যে ঘরটা দেখতে পাওয়া যায় প্রায় তত বড়ই হবে। ঘরের মধ্যে লোকের অন্ত নেই—সকলেই হিন্দু তারা। যে সব মাংসলোলুপ হিন্দু সামনের দিক দিয়ে ঢুকতে ভয় পায় অথবা মুসলমানদের সঙ্গে এক জায়গায় ব'সে খেতে যাদের আপত্তি আছে, তাদের জন্যে এই পেছনের দরজা খোলা হয়েছে। আমরা একটু কোণ-গোছের জায়গা দেখে বসতে না বসতে সেই ছেলেটি এসে জিজ্ঞাসা করলে, কি দেব তোমাদের?

—আপাতত পরোটা মাংসই তো চলুক।

তক্ষুনি গরম খাবার এসে গেল। দু-একজন বাদে সকলকেই মাংস খাওয়া শেখাতে হ'ল। কেউ মাংসের টুকরো হাতে ক'রে গায়ের ঝোলটুকু চুষেই ফেলে দিচ্ছিল, কেউ বা চিবিয়ে ছিবড়ে ফেলে দিতে লাগল—চিবিয়ে গিলে ফেলতে বলায় কেউ কেউ বিষম বিপদে প'ড়ে গেল। যা হোক, একটু চেষ্টা করতেই তারা দিব্যি ওড়াতে আরম্ভ ক'রে দিলে। তুকো উপরি উপরি তিন প্লেট কারি ও তিনটি পরোটা মেরে দিলে। আমাদের বিনায়ক দেখলুম

এ বিষয়ে খুবই ওস্তাদ—অথচ সেই মাছ খাওয়ার দিনের মতন সেদিনেও সে বললে, এর আগে মাংসের সঙ্গে এমন সাক্ষাৎ-পরিচয় তার হয় নি।

যাই হোক, সেখানে ব'সে ঘণ্টাখানেক ধ'রে দম-ভোর খাওয়া গেল। এরই মধ্যে আমাদের চেনা একজন মহা নিষ্ঠাবান সৎ-ব্রাহ্মণ হোটেলে ঢুকে খেয়ে বেরিয়ে গেল। আমরাও খাওয়া শেষ ক'রে পয়সা চুকিয়ে দিয়ে আবার সেই রাস্তা দিয়ে বেরিয়ে এলুম।

সেদিন আবার কর্তার একটি বড় জলসা ছিল। আমরা বাড়ি ফিরে দেখি, তিনি নিজেই বৈঠকখানা ঝাড়ামোছা করছেন। আমাদের দেখেই তো মহা তম্বি লাগিয়ে দিলেন। এই নিয়ে বাপ-ব্যাটায় খুব খানিকটা খচাখচি হয়ে গেল। আমরা বেগতিক দেখে কর্তা কিছু বলবার আগেই বৈঠকখানা পরিষ্কারের কাজে লেগে গেলুম। ও-কাজ আগে থেকেই আমাদের জানা ছিল। কোথায় কি পাততে হবে, তম্বুরা কোথায় থাকবে, তবলা হাতুড়ি কোথায় থাকবে—সব ঝেড়ে ঝুড়ে সাজাতে লেগে গেলুম। কর্তা ওদিকে মৌজের ব্যবস্থায় মন দিলেন। এদিককার কাজ সারা হতেই আমাদের ছুটতে হ'ল সোডা-লেমনেডের দোকানে। বোম্বাইয়ের কে একজন বড় গাইয়ে আসবেন ব'লে কর্তা একটু বিশেষ ব্যবস্থা করেছিলেন সেদিন। সন্ধ্যা হবার আগেই হোমরা-চোমরা নিমন্ত্রিতবর্গ ইয়া ইয়া পাগড়ি মাথায় বেঁধে জলসায় আসতে লাগলেন। অন্য জলসার দিন বিনায়ক প্রায়ই বাড়ির ভেতরে থাকত, কিন্তু সেদিনকার বিশেষ ব্যবস্থায় বিনায়কও আমাদের সঙ্গে আছে। আমরা কারুর পাগড়ি দেখে হাসছি, কখনও বা বাইরে বেরিয়ে গিয়ে দু-টান সিগারেট ফুঁকছি, সময়টা বেশ আনন্দেই কাটছিল—এমন সময় তুক্কোর বাড়ি থেকে তারই সম্পর্কিত এক খুড়ো হন্তদন্ত হয়ে এসে বিনায়ককে ডেকে নিয়ে গেল। লোকটা বিনায়ককে তাদের ভাষায় ধমকের সুরে কি সব বলতে লাগল। দেখলুম, তার মুখখানা একেবারে শুকিয়ে গেল।

বিনায়ক চ'লে যাবার একটু পরেই আমন্ত্রিত সেই গাইয়ে সদলবলে এসে

উপস্থিত হলেন। আদর-আপ্যায়নের পর যন্ত্রাদি বেঁধে গান শুরু হ'ল—সেই হেঁড়ে গলায় হ্যা র‍্যা র‍্যা র‍্যা—ত্যা র‍্যা র‍্যা র‍্যা—গান। শ্রোতারা কেউ তারিফ করতে লাগল, কেউ বা মন্ত্রমুগ্ধের মত চুপ ক'রে ব'সে রইল।

ইতিমধ্যে আমি ও সুকান্ত জলসা ছেড়ে বিড়ি ফোঁকবার জন্যে রাস্তার দিকে যাচ্ছি এমন সময় একদল লোক, তার মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যাও নেহাত কম নয়—এসেই আমাদের দুজনেরই দুই বাহু জোর ক'রে চেপে ধ'রে মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় কি সব বলতে লাগল।

এই কয়েকদিন ওদের বাড়ি কাজ ক'রে সে ভাষায় যতখানি পাণ্ডিত্য লাভ করা গিয়েছিল তাতে বুঝতে পারলুম, লোকগুলো যা বলছে তা বিশেষ সুবিধার কথা নয়।

দেখলুম, দুজন লোক বিনায়ককেও সেই রকম ভাবে ধরেছে। লোকগুলো সেই রকম ভাবে ধ'রে টানতে টানতে আমাদের বৈঠকখানা-ঘরের দরজা অবধি নিয়ে এল। কিন্তু সেখানে আসর তখন খুবই সরগরম, দরজার দিকে মনোযোগ দেবার মতন মেজাজ তাদের নেই। তার ওপরে বড় জল" হবে ব'লে কর্তা আগে থাকতেই বড় বড় পাত্র মেরে আসরের মধ্যিখানে চোখ বুজে ব'সে গান উপভোগ করছিলেন। সেখানে বিশেষ সুবিধা হবে না বুঝে তারা আমাদের টানতে টানতে বাড়ির ভেতরে নিয়ে চলল। সিঁড়ি দিয়ে ওঠবার সময় তারা কি সব ব'লে চেঁচাতেই দু দিক থেকে দুই গিন্নী একরকম ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে এলেন। এইখানে ব্যাপারটা যা শোনা গেল তা এই—আজ বিকেলে তুকাজী বাড়িতে ফিরে ভয়ানক পেট কামড়াচ্ছে ব'লে শুয়ে পড়েছিল। পেট-কামড়ানি অসহ্য হওয়ায় যোয়ানের আরক ইত্যাদি খাওয়ানো হয়, কিন্তু তাতেও যন্ত্রণার উপশম হচ্ছে না দেখে চাওন সাহেবকে ডাকতে পাঠানো হয়। চাওন (চ্যবন) বিলেত-ফেরত ডাক্তার, তুকোর ঠাকুরদাদার বিশেষ বন্ধু। কিন্তু চাওন সাহেব এসে পৌছবার আগেই আমাদের অতি খলিফা তুকাজী হড় হড় ক'রে তিন প্লেট মাংস ও তিনটি পরোটা উদ্গার ক'রে ফেলেন। ব্রাহ্মণের ছেলের পেট

থেকে তিনটি সাপ ও এক ডজন ব্যাঙ বেরুলেও বাড়ির লোকেরা এতটা আশ্চর্য হতেন না। তাকে জেরা করায় সে আমাদের তিনজনের ও বিনায়কের নাম ক'রে দিয়েছে।

বিনায়ক চেঁচাতে লাগল, তুক্কোর ও-সব মিছে কথা। আমরা তিনজন কিংবা সে ও-সব দ্রব্য পর্যন্ত স্পর্শ করি নি।

তুক্কোর বাড়ির লোকদের মুখে ওই বিবরণ শুনতে না শুনতে দুই গিন্নী একেবারে একসঙ্গে আমাদের—দূর, দূর—বেরো, বেরো—করতে আরম্ভ ক'রে দিলে।

বিনায়ক চেঁচিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগল, সব মিছে কথা—তুক্কোর সব মিছে কথা—

বারান্দার এক কোণে একটা ভাঙা হাঁড়িতে বড় গিন্নীর 'রেডি মেড' গোবর-জল থাকত। এই চেঁচামেচি হাঙ্গামার মধ্যে তিনি চট ক'রে সেই হাঁড়িটা তুলে নিয়ে এসে একেবারে বিনায়কের মাথায় ঢেলে দিলেন। ওদিকে তুক্কোর বাড়ির মেয়েরা আমাদের উদ্দেশ্যে চেঁচাতে লাগল—ঝাঁটা মেরে বিদেয় কর—দুধ-কলা দিয়ে এই সব সাপদের কখনও পুষতে আছে!

শেষকালে উপস্থিত স্ত্রী-পুরুষ সবাই মিলে আমাদের 'দূর দূর' করতে আরম্ভ ক'রে দিলে।

সদ্যক্রীত একখানা শতরঞ্চি বগলদাবা ক'রে আমরা বাইরের দিকে পা বাড়াতেই বিনায়ক লাফিয়ে এসে আমাকে জড়িয়ে ধ'রে চীৎকার ক'রে কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগল, যাস নে—ও বাঙালী, তুই যাস নে—

তুক্কোর বাড়ির পুরুষেরা জোর ক'রে তাকে ছাড়িয়ে নিতে লাগল। এর মধ্যে তার গর্ভধারিণী মাঝে মাঝে চড়-চাপড়ও দিতে লাগলেন।

বিনায়কের কান্না, দুই গিন্নীর চীৎকার, তুক্কোর বাড়ির পুরুষ ও স্ত্রীলোকদের ভর্ৎসনা ও গঞ্জনা, তার ওপরে নীচের গায়কের বাট, তান ও কর্তবে মিলে

বাড়িটা একেবারে নরককুণ্ডে পরিণত হ'ল। ব্যাপার দেখে স'রে পড়াই আমরা সমীচীন বোধ করলুম।

বাইরে এসে দেখি, একটু দূরে অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে জনার্দন দাঁড়িয়ে আছে। সে বললে, তুকো আমাদের নাম করতেই আমার খোঁজ পড়েছিল, কিন্তু আমি স'রে পড়ায় আর খুঁজে পায় নি।

আর কালবিলম্ব না ক'রে ছুটলুম সেই ধর্মশালার দিকে।

পঞ্চাশ বছর আগের জীবন-প্রভাতের সেই দুর্দিনের বন্ধুর মুখখানা জীবনের সায়াহ্নে আজ ভাল ক'রে মনে পড়ছে না। চোখের দৃষ্টির মত স্মৃতির পরকালও আজ আবছায়ায় অস্পষ্ট হয়ে এসেছে। তবুও বিস্মৃতির কুহেলিকা ভেদ ক'রে সেই ক্রন্দমান বালকের মুখের একটা অস্পষ্ট ছবি মনের মধ্যে ভেসে উঠছে আর ভাবছি, আজও কি সে বেঁচে আছে? যদি থাকে তো এই মিলন, শোক, হাসি ও অশ্রুভরা পৃথিবী তার সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করলে! জীবনে বহুবার মনে হয়েছে তার কথা, কতবার মনে করেছি, একবার তার খোঁজ করি; কিন্তু তা আর হয়ে ওঠে নি। আজ এই শেষবারের মতন তাকে আমার হৃদয়ের অভিনন্দন জানিয়ে গেলুম।

* * *

এমনি ক'রে ঘুরে ঘুরে, কখনও পথে, কখনও ঘাটে, কখনও দীনের কুটিরে, কভু বা ধনীর অট্টালিকায়—কখনও ধর্মশালায়, কখনও বা পাকশালায়, কখনও রেলের ইষ্টিশনে, কখনও ট্রেনের কামরায় আমাদের দিনগুলি কাটতে লাগল। এমনই ক'রে পাক খেতে খেতে একদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে আমরা জয়পুর রাজ্যের রাজধানীতে এসে উপস্থিত হলুম।

স্টেশন থেকে বেরিয়ে একটু দূরেই একটা গর্তর মতন ঘর এক পয়সায় ভাড়া করা গেল। ঠিক করলুম, রাতটা সেখানে কোনও রকমে কাটিয়ে কাল শহরের ভেতরে ঢোকা যাবে।

তখন প্রকৃতির মধ্যে শীতান্তের সাড়া প'ড়ে গেছে। আকাশের রঙ আর

পৃথিবীর ঢঙ একটু একটু ক'রে বদলাতে আরম্ভ করেছে। যে গাছ পাতা ঝ'রে ন্যাড়া হয়ে গিয়েছিল তার ডালে ডালে নতুন পাতা গজিয়ে উঠছে, যে গাছ শুকনো পাতা নিয়ে তখনও ঋতুরাজের অপেক্ষায় ছিল সেগুলো থেকে বাতাসের ঝোঁকে ঝোঁকে ঝাঁকে ঝাঁকে পাতা উড়তে আরম্ভ করেছে পাখির মতন।

শহরের মধ্যে ঢুকে তো একেবারে অবাক হয়ে গেলুম। এমন পরিষ্কার সোজা রাস্তা অন্য কোনও শহরে আর দেখি নি—সে যেন ছক কেটে তৈরি করা হয়েছে। রাস্তার দু দিকে সব বাড়িগুলোরই এক রকমের রঙ। বাড়িগুলো ঠিক যেন ছবি। রাস্তা চলতে চলতে মনে হয়, যেন রঙ্গমঞ্চের দৃশ্যপটের সামনে চলাফেরা করছি।

রাস্তা দিয়ে দলে দলে মেয়ে চলেছে। কঠিন শীতের শেষে তারা পুরাতন মোটা বসন ছেড়ে নতুন কাপড় পরেছে। সে কি রঙের বাহার—শুভ্রবসন-বিলাসী বাঙালীর চোখ ঝল্‌সে যায় তার বৈচিত্র্যে। ঝকঝকে নানাবর্ণের লহেঙ্গা অর্থাৎ ঘাগরা, উত্তরার্ধে রঙিন চোলি, তার ওপরে বিচিত্র রঙের ওড়না—কোনও কোনও ওড়নার জমিতে জরির ফুল, কোনটায় বা জরির পাড়—সূর্যের আলোতে সেগুলো ঝকমক করছে। বড় বড় গেট পার হয়ে শহরে ঢুকতে হয়। একটা রাস্তায় দেখলুম, ফুটপাথের ওপর প্রায় আধমানুষ সমান উঁচু ক'রে ছোলা, মটর, মুগ ও অন্যান্য শস্যের দোকান ব'সে গিয়েছে। রাজ্যের গোলা পায়রা ও টিয়া পাখি এসে সেই সব শস্য খাচ্ছে। দোকানদারের হাতে একটা হাত দেড়েক লম্বা লাঠি—তাই দিয়ে পায়রা ও অন্যান্য পাখি তাড়ানো হচ্ছে। পাছে তাদের অঙ্গে আঘাত লাগে সেইজন্যে লাঠির ডগায় আবার খানিকটা ন্যাকড়া বেঁধে নেওয়া হয়েছে।

সনাতন এক্কা গাড়ি আছে বটে, কিন্তু তা ছাড়াও আর এক রকমের বলদে-টানা গাড়ি দেখলুম, যার নাম রথ। চমৎকার রঙিন চাঁদোয়া দেওয়া গাড়ি, তার মধ্যে একজন কি দুজন বসবার জায়গা আছে—বাকিটা সমস্তই অলঙ্কার অর্থাৎ বাহার কিংবা বাহুল্য। বলদের চেহারাই বা কি সুন্দর! যেমন বিরাট

তাদের চেহারা, তেমনই হৃষ্টপুষ্ট চিকন তাদের দেহ—সর্বাঙ্গে লাল, নীল, বাসন্তী রঙের ছাপ-মারা, দুটি সুদৃশ্য তেল-মাখানো চকচকে বড় শিং, আবার শিংয়ের ডগায় পেতলের অলঙ্কার। তাদের চলবার ঢংই বা কি সুন্দর! যুগল বলীবর্দ যখন এক তালে ঘাড় নেড়ে নেড়ে সর্বাঙ্গ দুলিয়ে রথ টেনে নিয়ে যায় তখন মনে হয়, নিজেদের রূপ ও পোশাক সম্বন্ধে তারা অত্যন্ত বেশিমাত্রায় সচেতন।

নব বসন্তে নতুন দেশে সেই প্রাচুর্যের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেললুম। বাড়ি থেকে বেরিয়ে অবধি এতদিন আপনাকে নিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত ও বিব্রত ছিলুম। অবিশ্যি প্রয়াগের গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গম, আগ্রার তাজমহল ও অন্যান্য স্থাপত্যের নিদর্শন মনকে আকর্ষণ করেছিল বটে, কিন্তু তারা আমাকে আত্মসাৎ করতে পারে নি। তখনও ধরা পড়বার ভয় ছিল, কোনও কাজকর্ম যদি না জোটে ভবিষ্যতে কি ক'রে চলবে! কোথায় ব্যবসা করব, কিসের ব্যবসা ফাঁদব, টাকা কোথায় পাব—সব কিছুর মধ্যেই নিরন্তর এই চিন্তা মনের মধ্যে ঘুন ঘুন করছিল। কিন্তু জয়পুরে এসে প্রকৃতির এই পরিবেশের মধ্যে প'ড়ে নিজেকে একেবারে ভুলে গিয়ে আমিও এরই একটা অঙ্গবিশেষে দাঁড়িয়ে গেলুম।

মনের এই অবস্থাটার সম্যক পরিচয় দিতে পারলুম কি না বলতে পারি না। সে একটা অবস্থা, যে সময় মনটার কেবল গ্রহণ করবার ক্ষমতাই থেকে যায়, নিজে থেকে কিছু ভাববার ক্ষমতা এক রকম লোপ পেয়ে যায়। আমার সঙ্গী যারা ছিল তাদের কথা কিছু বলতে পারি না। তারা কি ভাবছে কিংবা তাদের কি ইচ্ছে তা জানবারও কোনও রকম উৎসাহ নেই—কেবল নেহাত প্রয়োজনীয় আহার ও রাত্রের আশ্রয় ছাড়া আর কোনও ভাবনাই নেই। সমস্ত দিন শহরে ঘুরে বেড়াই, দাঁড়িয়ে কোনও জিনিস দেখছি তো দেখছিই—হয়তো অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি, যা দেখছিলুম তা কখন চ'লে গেছে—শুধু দাঁড়িয়েই আছি, মনের মধ্যে থেকে কোন চিন্তাই উঠছে না। চোখে জিনিস প্রতিফলিত হচ্ছে বটে, কিন্তু ভেতরে কিছু বহন ক'রে নিয়ে যাচ্ছে না।

শহরের ঠিক বাইরেই রামনিবাসবাগ নামে চমৎকার বাগান। এই

বাগানের মধ্যে পশুশালা ও সুদৃশ্য পাথরের অট্টালিকায় যাদুঘর। কলকাতার তুলনায় এই যাদুঘরে কিছুই নেই বললেই হয়। বাড়িখানার ছাতে উঠে আমরা ঘুরে বেড়াতুম। শুধু ছাত নয়, সেখানে যত উঁচু ও দুর্গম জায়গা আছে সেখানে উঠে দৃষ্টি প্রসারিত ক'রে দিতুম দূর-দূরান্তরে। কখনও বা যাদুঘরের কোন ছায়া-শীতল জায়গায় প'ড়ে লাগাতুম ঘুম একেবারে সন্ধ্যা অবধি। কখনও বা বাগানের চিড়িয়াখানায় পশু দেখে দেখেই দিন কেটে যেত। সেদিন সে চিড়িয়াখানা ছিল অত্যন্ত মামুলী—পরে অবশ্য তার অনেক উন্নতি হয়েছে। বাগানে ঘুরতে ঘুরতে ক্লান্ত হয়ে পড়লে কখনও গাছের তলায়, কখনও ঝোপের পাশে ছায়ায় প'ড়ে ঘুমিয়েছি।

এমনই ক'রে স্রোতের মুখে কুটোর মতন উদ্দেশ্যহীন হয়ে যখন ভেসে চলেছি, সেই সময়ে একদিন সকালে এক খাবারের দোকানে ব'সে খেতে খেতে দু-তিনজন লোকের মুখে শুনলুম যে, শহর থেকে কিছু দূরে এক ধনীর বাড়িতে একজন সন্ন্যাসী এসেছেন, তাঁর বয়স পাঁচ শো বছর। একজন বললে যে, সে নিজে গিয়ে সন্ন্যাসীকে দেখে এসেছে।

জায়গাটা সেখান থেকে কত দূরে এবং কি ক'রে সেখানে যেতে হয় জিজ্ঞাসা করায় সে বললে, উট কিংবা ঘোড়ার পিঠে চ'ড়ে যেতে পার। তোমরা তিনজনে মিলে একটা উট ভাড়া করলে পাঁচ-ছ টাকার বেশি নেবে না। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই মহারাজের চরণ দর্শন ক'রে ফিরে আসতে পারবে।

সেখানে যাদের বাড়িতে সন্ন্যাসী আছেন তারা দেখতে দেবে কি না জিজ্ঞাসা করায় সে বললে, নিশ্চয় দেবে।

লোকটি আরও বললে যে, সন্ন্যাসীর নাম হচ্ছে সাধু মহারাজ। তিনি সেখানকার সরকারের অর্থাৎ রাজার গুরু। তাঁকে যারা দেখতে যাবে তাদের থাকবার, স্নান করবার ও খাবার ব্যবস্থা ওই রাজ-সরকার থেকেই হয়েছে। তোমরা দর্শন করতে গেলে রাজার হালে সেখানে থাকতে পাবে।

লোকটি সাধু মহারাজ সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক কাহিনী বলতে লাগল।

সন্ন্যাসীর কথা শুনে তাঁকে দেখতে যাবার ইচ্ছা প্রবল হ'ল বটে, কিন্তু পাঁচ-ছ টাকা ভাড়া লাগবে শুনে বাসনা আপনিই চুপসে গেল। কিন্তু লোকটা আবার বললে, আপনারা ইচ্ছা করলে হেঁটেও যেতে পারেন। অনেক ভক্ত পঞ্চাশ-ষাট মাইল পথ হেঁটে মহারাজকে দর্শন করতে যাচ্ছে—অনেক স্ত্রীলোক পর্যন্ত।

যাব কি-যাব-না দোলায় মন যখন দুলছে তখন লোকটির সঙ্গী বললে, আপনারা বাংগাল দেশের লোক তো! মহারাজের একজন বাংগালী চেলাও আছেন।

—কি বললে! বাঙালী চেলাও আছেন?

—হ্যাঁ।

—তিনি সেইখানেই আছেন?

—হ্যাঁ, তাঁকে নিজের চোখে দেখেছি। কথা বলেছি, বড় সাধু লোক তিনি।

আর বেশি বলতে হ'ল না—এ পরেশদা না হয়ে যায় না। আমরা তাদের কাছে ভাল ক'রে ঠিকানা জেনে সকালেই বেরিয়ে পড়বার ব্যবস্থা করলুম।

ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার অনেক আগেকার কথা বলছি। আরও স্পষ্ট ক'রে বলতে গেলে বলতে হয় যে, স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখবারও আগের কথা—এখন তাদের কি ব্যবস্থা হয়েছে জানি না, সে সময় জয়পুর রাজ্যে খোদ মহারাজার অধীনে বড় বড় জমিদার থাকতেন। এই জমিদারদের সর্দার বলা হ'ত। তাঁদের নিজ নিজ জমিদারির মধ্যে তাঁরা এক রকম স্বাধীনই ছিলেন। এঁদের মধ্যে অনেকের আবার কেল্লাও ছিল এবং সেখানে তাঁদের নিজেদের সৈন্য সামন্ত থাকত। খোদ মহারাজার সঙ্গে এঁদের কি সম্বন্ধ ছিল তা ঠিক বলতে পারি না, তবে সর্দারেরা নানা শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন। শুনেছি, প্রথম শ্রেণীর সর্দারেরা বাঁ পায়ে সোনার মল প'রে দরবারে উপস্থিত হতেন এবং মহারাজা নাকি সিংহাসন থেকে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁদের নমস্কার করতেন। এই রকম দ্বিতীয় তৃতীয় শ্রেণীর সব সর্দার ছিলেন। এই সব সর্দারেরা—তা তিনি প্রথম শ্রেণীর হোন অথবা তৃতীয় শ্রেণীরই হোন—নিজেদের রাজ্যে অর্থাৎ জমিদারির মধ্যে দোর্দণ্ড প্রতাপশালী হতেন। এই সর্দারদের মধ্যে একজন

কিশোর বয়সে এক সন্ন্যাসীর শিষ্য হয়েছিলেন। তিনি সেই বয়সেই রাজ্য-সম্পদ ত্যাগ ক'রে সন্ন্যাসীর সঙ্গে চ'লে গিয়েছিলেন। কিছুকাল সাধন-ভজন করবার পর গুরু তাঁকে আবার গৃহে ফিরে পাঠান। গৃহে ফিরে এলেও সেখানে স্থায়ীভাবে তিনি কখনও থাকেন না। কখনও দীর্ঘকাল গুরুর আশ্রয়ে, কখনও বা তীর্থে তীর্থে ঘুরে কাটান। বাড়িতে এলেও সেখানকার ঐশ্বর্য ও সম্ভোগ থেকে তিনি দূরে থাকেন। সেখানে তো বটেই, এমন কি জয়পুর শহরের লোক পর্যন্ত সম্ভ্রমের সঙ্গে তাঁর নাম উচ্চারণ ক'রে থাকে এবং গদিতে না বসলেও এঁকেও সকলে সেখানকার সর্দার ব'লে মানে। আমি যখনকার কথা বলছি তখন এঁর বয়স ছিল নব্বুইয়েরও বেশি। এঁর ঠাকুরদা যখন গদি পেয়েছিলেন অর্থাৎ যখন তাঁর একুশ বছর বয়েস, তখন তিনি এই সাধু মহারাজের শিষ্য হয়েছিলেন। ওখানে গুজব ছিল যে, এই সাধু মহারাজও এই সর্দার-পরিবারেরই ছেলে—ছেলেবেলায় সন্ন্যাসী হয়ে গৃহত্যাগ করেছিলেন।

যাই হোক, আমরা শুনলুম যে, সাধু মহারাজ কয়েকজন শিষ্য নিয়ে প্রায় দেড় মাস হ'ল এইখানে এসে উঠেছেন এবং মাত্র আর কয়েকদিন সেখানে থাকবেন। এও শোনা গেল যে, সন্ন্যাসীর সঙ্গে দেখা করার কোনও বাধা নেই। শুধু তাই নয়, গুরুদেব আসার উপলক্ষে সর্দারজী তাঁর প্রাসাদে সদাব্রত খুলে দিয়েছেন—গুরুদেব যতদিন আছেন ততদিন যে কেউ ইচ্ছা করলে সেখানে থাকতে খেতে পাবে—এটা নাকি সাধু মহারাজার আদেশ।

আমরা শুনলুম, সর্দারজীর রাজধানী জয়পুর শহর থেকে প্রায় বিশ মাইল পথ। স্থির করা গেল হেঁটেই এই দীর্ঘ পথ অতিক্রম করা যাবে, কারণ উট ভাড়া ক'রে এই সময় অর্থ নষ্ট করা কোন কাজের কথা নয়। সেই লোকগুলিকে জিজ্ঞাসা ক'রে জানা গেল যে, এখন যাত্রা করলে মাঝ-রাত্রি নাগাদ আমরা সেখানে গিয়ে পৌছতে পারব—রাস্তাও ভাল, পাকা সড়ক, জয়পুর থেকে একেবারে সোজা গিয়েছে সেখান পর্যন্ত।

খাওয়া-দাওয়া শেষ ক'রে বেলা প্রায় আটটা নাগাদ আমরা সাধু মহারাজের উদ্দেশে রওনা হলুম।

প্রায় পঞ্চাশ বছর আগেকার কথা, জায়গাটার নাম একদম ভুলে গিয়েছি। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আমরা শহরের হুদ্দো ছাড়িয়ে গেলুম। ফাল্গুনের মাঝা-মাঝি সময়, তখনও সে দেশে গরম পড়ে নি, আমরা আরামেই চলতে লাগলুম। ক্রমে লোকালয় পেরিয়ে গেলুম, দু পাশে শস্যক্ষেতের মাঝখান দিয়ে পাকা চওড়া রাস্তা চ'লে গিয়েছে সোজা—এরই মধ্যে কখনও বা রাস্তার ধারে সুন্দর এক-একটা বাড়ি ও বাগান দেখতে পাওয়া যায়। পথ চলতে চলতে কখনও দেখি, রাস্তায় ও মাঠের মধ্যে দলে দলে ময়ূর ঘুরে বেড়াচ্ছে—মেয়ে-ময়ূরগুলো পুরুষ-ময়ূরদের চেয়ে কত বিশ্রী দেখতে! তারই আলোচনায় খানিকক্ষণ কেটে যায়। কখনও বা হরিণের পাল দেখে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে যাই। আমাদের চোখে এসব দৃশ্য নতুন।

পথ চওড়া হ'লেও মাঝে মাঝে ধুলো উড়ে একেবারে দম বন্ধ হবার উপক্রম হয়। কোন কোন জায়গায় দু পাশের শস্যক্ষেত থেকে ফসল কেটে নেওয়া হয়েছে—দমকা হাওয়া সেখানেও ধুলো উড়িয়ে বেড়াচ্ছে। মাঝে মাঝে কেউ বা ঘোড়ায় চ'ড়ে সামনের দিক থেকে এসে আমাদের পার হয়ে চ'লে যায়। ঘোড়া ও সওয়ারের সর্বাঙ্গ ধুলোয় সাদা হয়ে গিয়েছে—আমরা অবাক হয়ে তাকে দেখি, সেও অবাক হয়ে আমাদের দেখে। কখনও বা দেখতে পাই উটের পিঠে চ'ড়ে কয়েকজন লোক চলেছে—বাংলা দেশের লোক আমরা, উট দেখা অভ্যেস নেই। বিস্ময়চকিত দৃষ্টিতে আমরা সেই দৃশ্য দেখতে থাকি—লম্বা পা ফেলে বিচিত্র ভঙ্গীতে চলতে চলতে উট আমাদের দৃষ্টির সীমা পার হয়ে চ'লে যায়। কখনও বা সেই নির্জন রাস্তায় চীৎকারের দমকা ঝড় তুলে একদল পুরুষ ও স্ত্রীলোক কলরব করতে করতে চ'লে যায়—গ্রাম্যলোক তারা, আস্তে কথা বলতে জানে না—তাদের জিজ্ঞাসা করি, আমরা ঠিক পথে চলেছি কি না? কখনও বা ক্লান্ত ধূলি-ধূসরিত দেহ নিয়ে কোন পথিক আসে অপর দিক থেকে, তাকে জিজ্ঞাসা করি—সে ঝাড়শাহী ভাষায় কি উত্তর দেয়

আমরা বুঝতে পারি না। সেও আমাদের শহুরে হিন্দী বুঝতে পারে না, কয়েক মুহূর্ত অবাক হয়ে আমাদের দিকে চেয়ে থেকে আবার নিজের পথ ধরে।

চলতে চলতে এক জায়গায় পথের ধারে কয়েকটা ধূলিমাখা খোলার ঘর দেখে দাঁড়িয়ে গেলুম। অনেকক্ষণ ধ'রে জল তেষ্টা পেয়েছিল, কিন্তু তৃষ্ণা নিবারণের কিছুই পাই নি। মাঝে মাঝে পথের ধারে বড় বড় ইঁদারা দেখেছি বটে, কিন্তু ইঁদারা দেখলে তো তৃষ্ণা নিবারণ হয় না। এইখানে জল পাওয়া যেতে পারে মনে ক'রে সেদিকে এগিয়ে গিয়ে খোঁজাখুজি ক'রে একটা চানা-ভাজার দোকানে গিয়ে বললুম, আমরা বড় তৃষ্ণার্ত, একটু জল খাওয়াতে পার?

কথা শুনে লোকটা কথা না ব'লে ইতস্তত করতে লাগল। দোকানদারের মনস্তত্ব সর্ব দেশেই প্রায় সমান। তার হালচাল দেখে বললুম, তোমার দোকান থেকে ভুজা খেয়ে আবার জল খেতে যাব কোথায়?

দোকানদার এবার সোজা জিজ্ঞাসা করলে, কত ভুজা চাই?

দু পয়সার চালভাজা ও এক পয়সার ছোলাভাজা কিনে দোকানে ব'সেই আমরা চিবোতে আরম্ভ ক'রে দিলুম। হিসাব ক'রে দেখা গেল যে, সেই রাশীকৃত চাল-ছোলা-ভাজা গলাধঃকরণ করতে দিবা অবসান হয়ে যাবে। অতএব বুদ্ধিমানের মতন সেগুলি কাপড়ের খুঁটে বেঁধে ভরপেট জল পান ক'রে সেখান থেকে রওনা হলুম। এবার কিন্তু কিছুক্ষণ চলতে না চলতে, পেটে জল পড়ার জন্যেই হোক অথবা অন্য কোন কারণেই হোক শ্রান্তিতে শরীর ভারী হয়ে আসতে লাগল। শেষকালে বেগতিক দেখে পথের ধারে এক বিরাট গাছের তলায় গিয়ে আশ্রয় নিলুম। আমি ও জনার্দন আর বৃথা কালবিলম্ব না ক'রে সেইখানেই গা ঢেলে দিলুম—কিছুক্ষণ যেতে না যেতেই ঘুম। সুকান্ত যখন আমাদের ঠেলে তুলে দিলে তখন বিকেল হয়ে গিয়েছে। তখনও হা-হা ক'রে হাওয়া বইছে বটে, কিন্তু দুপুরের হাওয়ার চাইতে তা অনেক ঠাণ্ডা। ভাগ্যে আমরা বুদ্ধি ক'রে গায়ের কাপড় নিয়ে এসেছিলুম!

উঠে আবার যাত্রা শুরু করা গেল। একজন লোক সামনের দিক থেকে

আসছিল, তাদের জিজ্ঞাসা ক'রে জানতে পারা গেল যে, আমরা প্রায় মাইল দশেক এসেছি। আমাদের লক্ষ্যস্থল আর কত দূরে জিজ্ঞাসা করায় তারা বললে, আরও তিন-চার ঘণ্টার পথ। যদি পা চালিয়ে চলতে পারি তো সন্ধ্যে-রাত্রির মধ্যেই সেখানে পৌছতে পারব।

তারা আরও একটি সংবাদ দিলে, যা শুনে প্রাণ জুড়িয়ে গেল। তারা বললে, যে, আজকাল প্রথম রাত্রে এদিকটায় বাঘের উপদ্রব বেড়েছে। সন্ধ্যে হবার ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে ঠিকানায় যদি না পৌছতে পার, তা হ'লে কোনও জায়গায় আশ্রয় নিও।

আমরা জিজ্ঞাসা করলুম, দু পাশে এই তো ধূ-ধূ করছে মরুভূমির মত মাঠ আর চষা জমি—এর মধ্যে বাঘ থাকে কোথায়?

তারা দূরের পাহাড়গুলো দেখিয়ে বললে, ওইখান থেকে সব বাঘ, বন্যবরাহ, হুঁড়ার প্রভৃতি নামে। আর দিন পনেরো বাদে অর্থাৎ গরম প'ড়ে গেলে তারা আর জমিতে নামবে না। কিন্তু শীতের এই শেষটায় তাদের অত্যাচার বাড়ে।

তারা আশ্বাস দিয়ে বললে, নির্ভয়ে চ'লে যাও। একটু পরেই গ্রামের পর গ্রাম দেখতে পাবে। একজনের বাড়িতে রাতটা কাটিয়ে দিও, কোন ভয় নেই।

এই কথা শোনার পর আর ঢিমে তেতালায় চলা চলে না—একেবারে দৌড়ে-হাঁটা আরম্ভ ক'রে দিলুম। কিন্তু হাজার হ'লেও শরীর ছিল ক্লান্ত, কতক্ষণ আর সে রকম চলা যায়! কিছুক্ষণ দৌড়েই গতি আমাদের মন্থর হয়ে গেল। দু-একটা খোলার বাড়ি পথের ধারে দেখতে পেলুম বটে, কিন্তু আমরা ঠিক করলুম যে রাত্রির প্রথম প্রহর অতীত না হ'লে বিশ্রাম নেব না।

চলতে চলতে বেলা প'ড়ে এল। সমস্ত দিন পথশ্রম। সকালে কিছু খেয়ে বেরিয়েছিলুম—কিছু খাদ্য সঙ্গে নেওয়া উচিত ছিল, কিন্তু পরেশদার সঙ্গে দেখা করার উৎসাহে সে কথা [illegible] নি। পথে যে চাল-ছোলা কিনেছিলুম তা একেবারে অখাদ্য। দিবাবসানের সঙ্গে সঙ্গে জঠরে ক্ষুধার অগ্নি জ্বলতে শুরু হ'ল দাউ দাউ ক'রে। এদিকে চরণও আর চলতে চায় না,

এমন অবস্থা। রাত্রির প্রথম প্রহর অতীত না হ'লে বিশ্রামের চেষ্টা করব না ব'লে যে সংকল্প করা গিয়েছিল তা আর রাখা চলল না।

তখনও একেবারে অন্ধকার হয় নি, আমরা একটা গাঁয়ের ভেতর দিয়ে যাচ্ছি, চওড়া রাস্তা, দু-পাশে নীচু খোলার বাড়ি। গ্রামখানা অস্বাভাবিক রকমের নিস্তব্ধ ব'লে মনে হতে লাগল। গ্রামে পৌঁছলেই সেখানকার কুকুরগুলো আমাদের অপরিচিত দেখে চেঁচাতে আরম্ভ ক'রে দেয়। সেখানটায় কোন কুকুর না দেখে আশ্চর্য বোধ হ'ল। ছোট ছোট ছেলেকেও রাস্তার ধারে খেলা করতে দেখা যায়—এখানে তাও দেখা গেল না। কোনও ঘরে আলোও দেখতে পেলুম না। জনার্দন বললে, এটা নিশ্চয় ভূতের গ্রাম।

যাহাতক ভূতের নাম শোনা, অমনি লাগালুম ছুট। যে চরণ এতক্ষণ চলতে চাইছিল না, ভূতের নামে তার গতি চতুর্গুণ বেড়ে গেল।

কিছুক্ষণ যেতে না যেতে আর একটা গ্রাম এসে গেল। তখন অন্ধকার বেশ গাঢ় হয়ে এসেছে বটে, তবুও গ্রামখানাকে অপেক্ষাকৃত সজীব ব'লে বোধ হ'ল। কুকুরও আছে দু-চারটে, কয়েকটি ছোট ছেলেপিলে দেখা গেল। একটু এগিয়ে গিয়ে দেখতে পেলুম, এক বাড়ির দাওয়ায় একজন স্ত্রীলোক মুড়িসুড়ি দিয়ে রাস্তার দিকে মুখ ক'রে উবু হয়ে ব'সে রয়েছে। তারই একটু দূরে একটা মাটির বড় ডেলার ওপরে একটা প্রদীপ বসানো রয়েছে। রাতের মত সেখানে আশ্রয় পাওয়া যাবে কি না জিজ্ঞাসা করবার জন্যে আমরা তিনজনেই সেদিকে এগিয়ে গেলুম। দূর থেকে দেখে তাকে খুব বুড়ী ব'লে মনে হয়েছিল, কিন্তু কাছে গিয়ে সেই অল্প আলোতেও বুঝতে পারা গেল সে বুড়ী নয়—বয়স প্রায় চল্লিশের কাছাকাছি হবে। যা হোক, জনার্দন তার ঢাকাই হিন্দীতে জিজ্ঞাসা করলে, মাসী, আজকে রাত্রির মতন আমাদের এই তিনজনে. আশ্রয় দেবে?

এতক্ষণ স্ত্রীলোকটি পথের দিকেই চেয়ে ছিল। জনার্দনের আওয়াজ পেয়ে মুখ তুলে [illegible] ক'রে আমাদের আপাদমস্তক দেখতে লাগল। জনার্দন আমাদের [illegible] একটু এগিয়ে ছিল। স্ত্রীলোকটির ওই রকম কটমটে চাউনি

দেখে ব্যাপার বিশেষ সুবিধের নয় বুঝে আমি তাকে ডেকে বললুম, জনা, চ'লে আয়, ব্যাপারটা যেন কি রকম ঠেকছে!

কিন্তু জনার্দন আমার কথা গ্রাহ্য না ক'রে আরও একটু এগিয়ে গিয়ে বলতে লাগল, হাঁ্যা মাসী, তোমার বোন্‌পোরা শেষকালে কি বাঘের পেটে যাবে—একটুখানি এইখানে প'ড়ে থাকব, রাতটা কাবার হ'লেই চ'লে যাব।

এবারে স্ত্রীলোকটি ধীরে-সুস্থে সেখান থেকে উঠে বাড়ির ভেতরে চ'লে গেল। জনা চেঁচিয়ে আমাদের ডেকে বললে, মাসীর দয়া হয়েছে—আজ রাত্রিটুকুর জন্যে বোধ হয় আশ্রয় পাওয়া গেল।

জিজ্ঞাসা করলুম, কি বললে মাসী?

জনার্দন বললে, মুখে কিছু বলে নি, মনে হচ্ছে বালিশ-টালিশ আনতে গেল।

আমরা এই রকম কথাবার্তা বলছি এমন সময় সেই স্ত্রীলোকটি একটা লম্বা লাঠি হাতে ক'রে তীরবেগে দরজা দিয়ে ছুটে বেরিয়ে এক মুহূর্তের মধ্যে জনার্দনকে ধড়াক ধড়াক ক'রে ঘা কয়েক জমিয়ে দিলে।

স্ত্রীলোকটি বাড়ির মধ্যে ঢুকে যাবার পর জনার্দন এক-পা দু-পা করতে করতে দাওয়ায় উঠে গিয়েছিল। হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে আঘাত পেয়ে সে "ওরে বাবা রে, গেছি রে" ব'লে এক লাফে নীচে পড়েই একেবারে রাস্তায়।

বলা বাহুল্য, আমরা আগেই রাস্তায় এসে পড়েছিলুম। স্ত্রীলোকটি কিন্তু সেইখানেই থামল না। সে লাঠি হাতে সেই ভাবে তাড়া ক'রে অনেক দূর পর্যন্ত আমাদের পেছু পেছু দৌড়িয়ে এল—আমরা এক রকম দৌড়ে গ্রামটুকু পেরিয়ে গেলুম। পেছনে কুকুরগুলো চেঁচাতে লাগল।

অন্ধকারের ভেতর দিয়ে চলেছি—সামনে, পেছনে, দক্ষিণে, বামে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। চন্দ্রহীন আকাশে তারা ফুটেছে, কিন্তু আমাদের অনভ্যস্ত চক্ষু তারার আলো দেখতে পায় না। পেছনে ফেলে আসা গ্রামপ্রান্তে গৃহস্থদের ক্ষীণ দীপরশ্মি কখন মিলিয়ে গিয়েছে—আশ্চর্য সে অন্ধকার রাত। সে যেমন নিবিড় তেমনই নিস্তব্ধ ও ভয়াবহ—গভীর, অনন্ত অন্ধকারের মধ্য দিয়ে চলেছি।

সেই সুগভীর স্তব্ধতার মধ্যে আমাদের সমস্ত প্রগল্‌ভতা একেবারে চুপ্‌সে গিয়েছে—মাঝে মাঝে বুকের ধকধকানি পর্যন্ত শুনতে পাচ্ছি। এই অন্ধকারে নিঃশব্দপদসঞ্চারে হয়তো বাঘ আসছে আমাদের অনুসরণ ক'রে—হয়তো বা অন্য কোন সাংঘাতিক জানোয়ার কিংবা কোন সরীসৃপ! প্রাকৃতিক নিয়মে সে আমাদের দেখতে পাচ্ছে, কিন্তু আমরা অন্ধ। ভয়ে আমরা হাত ধরাধরি ক'রে চলেছি। আমি মাঝখানে, এক পাশে সুকান্ত অন্য পাশে জনার্দন। মাঝখানে থাকায় মনে করছি, অন্যদের চাইতে আমি অপেক্ষাকৃত নিরাপদ! অন্ধকারে যতদূর সম্ভব সোজা চলতে চেষ্টা করছি কিন্তু তবুও মাঝে মাঝে পথের ধারের গাছের ওপর গিয়ে পড়ি—চলেছি তো চলেইছি, পলকে প্রলয় মনে হচ্ছে। অনেকক্ষণ এইভাবে চলবার পর দূরে ক্ষীণ আলো দেখা গেল। বুঝলুম, কোন গ্রামপ্রান্তে এসে পড়েছি।

আরও কিছুক্ষণ চ'লে আমরা আর একটা গ্রামে এসে পড়লুম। দু-ধারে বাড়ি, কিন্তু অধিকাংশ বাড়ির দরজা বন্ধ। আশ্রয়ের জন্যে কোথায় বলা যায় তাই ভাবতে ভাবতে এগিয়ে চলেছি, এমন সময় দেখতে পেলুম এক বাড়ির দাওয়ার ওপরে চাটাই পেতে একজন লোক একখানা ছোট [illegible] ওপর একখানা বই রেখে সুর ক'রে কি পড়ছে। বইখানার আকৃতি দেখেই মনে হ'ল তুলসীদাসী রামায়ণ—এগিয়ে গিয়ে অতি বিনীতভাবে লোকটিকে নমস্কার ক'রে বলা গেল, বাবা, আমরা অমুক স্থানে যাচ্ছি সন্ন্যাসীদর্শনে, কিন্তু রাত্রি হয়ে গিয়েছে, তার ওপর সারাদিন পথ চ'লে অত্যন্ত শ্রান্ত হয়েছি। আজ রাত্রিটুকু যদি আপনার এই দাওয়ায় আশ্রয় দেন তবে প্রাণ বাঁচে।

লোকটি আমাদের কথা শুনে বললে, উঠে এসে ব'স।

আমরা উঠে দাওয়ায় বসার পর সে বললে, সন্ন্যাসীর কথা তোমরা কোথায় শুনলে?

—জয়পুরে। তা ছাড়া সন্ন্যাসীর এক চেলা আমাদের ভাই হয়।

[illegible] জিজ্ঞাসা করলে, তোমাদের বাড়ি কোথায়?

—বাংলা দেশে।

লোকটি আর কোনও কথা না ব'লে ফট্ ক'রে উঠে বাড়ির মধ্যে চ'লে গেল। কোন কথা না ব'লে ওই রকম হঠাৎ উঠে বাড়ির মধ্যে ঢুকে যাওয়ায় আমরা একটু ভড়কে গেলুম। জনার্দন বললে, কি বাবা, মেশো আবার কি আনতে গেল!

স'রে পড়ব কি না ভাবছি, এমন সময় লোকটি অন্য একজন বয়স্ক লোক সঙ্গে নিয়ে এল। এই লোকটি এসেই বেশ হাসিমুখে পরিষ্কার বাংলা ভাষায় বললে, আপনারা বাংলা দেশ থেকে আসছেন বুঝি?

আমরা তো একেবারে অবাক! রাজপুতানার এই গ্রামের মধ্যে বাংলা কথা! বললুম, হ্যাঁ।

লোকটি অন্যজনকে আমাদের বসবার জায়গা ক'রে দিতে বললে। আমরা বসলে পর জিজ্ঞাসা করলে, আপনারা সাধুদর্শন করতে চলেছেন?

বললুম, হ্যাঁ, সাধুদর্শন করতে যাচ্ছি। পথে কয়েকজন লোক বললে, এই সময়ে এই দিকটায় বড় বাঘের উৎপাত হয়। সেজন্য রাত্রির মত যদি আমাদের একটু আশ্রয় দেন, আমরা কাল ভোরে উঠেই চ'লে যাব।

লোকটি বললে, বেশ, বেশ, তার জন্যে আর কি! আপনাদের যতদিন ইচ্ছা থাকুন—এ আপনাদেরই বাড়ি।

লোকটির কথাবার্তা অতি ভদ্র ও মিষ্ট। তিনি আমাদের বাড়ির মধ্যে নিয়ে গেলেন। বাড়ির অবস্থা দেখে মনে হ'ল, তাঁরা বেশ অবস্থাপন্ন লোক। একটা ছোট ঘরের মধ্যে গিয়ে আমরা বসলুম, দু-তিনটি ছোট ছেলেপিলেও দেখলুম লোকটির সঙ্গে আলাপ হ'ল—কলকাতার কোন বা মেটকী-রক্ষকের কাজ করেন। তিন ভাই এক জায়গায় কাজ করেন। দুজন কর্মস্থানে থাকেন আর একজন ক'রে দেশে আসেন। দেশে একজন না থাকলে চলে না, কারণ এখানে ক্ষেত-খামার বিরাট, তা ছাড়া টাকা খাটাবার কারবারও খুব ফলাও আছে। জয়পুরে গদি আছে, এক ভাইপো সেখানে

থাকে। কলকাতাতেও টাকা ধার দেওয়ার কারবার আছে। নিজেদের আপিসের বাঙালী বাবুরাই টাকা নেন, এতে টাকা মারা যাবার কোনও সম্ভাবনা নেই। এঁদের বাবা এই কাজে ঢুকে আস্তে আস্তে তিন ছেলেকে সেখানে নিয়ে গিয়েছিলেন। ছেলেবেলা থেকে বাঙালীদের সঙ্গে মেলামেশা করতে করতে তাঁরা বাংলা ভাষা বলতে, লিখতে ও পড়তে শিখে গেছেন। ইংরিজী একটু একটু জানেন, তবে ভাইপোরা ইংরিজী শিখছে ইত্যাদি—

জিজ্ঞাসা করলুম, আপনারা কি ব্রাহ্মণ?

ভদ্রলোক বললেন, ঠিক ব্রাহ্মণ নই, তবে আমাদের পৈতে আছে। আমরা আসলে হচ্ছি রাজপুত। আমাদের আদি বাড়ি ছিল যোধপুর-মাড়ওয়ারে—পূর্বপুরুষেরা এখানে এসে বাস করেছিলেন। ব্রাহ্মণের কাজও আমরা ক'রে থাকি, গ্রামের অনেক পরিবারই আমাদের যজমান।

আমরা জিজ্ঞাসা করলুম, অমুক জায়গায় যে একজন সাধু এসেছেন শোনেন নি?

তিনি বললেন, শুনেছি বইকি! আজ এক মাস হ'ল এই রাস্তা দিয়ে মেলার মত লোক চলেছে সাধুদর্শন করতে—এই চার-পাঁচ দিন লোক চলা কমেছে, তা না হ'লে দিনে রাতে সমানে লোক যাচ্ছিল সাধু দেখতে।

লোকটি আমাদের নাম জিজ্ঞাসা করলেন। তাঁর নাম বললেন, রণবীর সিং।

একটু পরে তিনি একজন লোক দিয়ে আমাদের কুয়োতলায় পাঠিয়ে দিলেন। সেখানে গিয়ে বেশ ক'রে হাত মুখ ধুয়ে ঘরে এসে আমরা চৌকিতে লম্বা হয়ে পড়লুম। ঘরের মধ্যে অন্য কোনও আসবাব নেই, প্রায় ঘরজোড়া চৌকি ছাড়া। মাত্র একটা ময়লা তাকিয়া এক দিকে প'ড়ে ছিল, সেইটেই কোনরকমে তিন জনে মাথায় ঠেকিয়ে শোয়া গেল। ঘুমোবার চেষ্টা করতে হ'ল না, শরীর তৈরিই ছিল।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলুম জানি না, রণবীর সিং আমাদের ডেকে তুলে বললেন, চলুন বাবু, গরিবদের বাড়িতে কিছু আহার করবেন।

সত্যি কথা বলতে কি, আমরা এতটা আশা করিনি, আশ্রয় পেয়েই ব'র্তে গিয়েছিলুম। খাবার জায়গায় যাওয়া গেল। একটা দাওয়ার মতন জায়গায় আমাদের আসন করা হয়েছে, আসনের সামনে শাল-পাতার মত বড় বড় পাতা —আমরা বসতেই একটি বৃদ্ধা এসে পরিবেশন আরম্ভ করলেন। গরম রুটি তাতে ঘি মাখানো আর অড়রের ডাল, একটা কিসের তরকারি আর দু-তিন রকমের আচার। সিংজী বলতে লাগলেন, আপনারা যা খান তা আমরা কোথায় পাব, তবুও ভাবলুম অতিথি না খেয়ে থাকবেন—তাই এই কষ্ট দেওয়া।

আমরা বললুম, বিদেশে রাস্তায় কোথায় বাঘের মুখে যাচ্ছিলুম, আপনি আশ্রয় দেওয়ায় প্রাণে বেঁচে গেলুম। সারাদিন অনাহারের পর এই খাদ্য আমাদের অমৃতের মতন লাগছে, ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করবেন।

ভদ্রলোক বললেন, এই যে খাবার আপনাদের দেওয়া হয়েছে এর সবই আমাদের ঘরের তৈরি—গম, ডাল, ঘি, সব।

আহারের পর কিছু দুধও খেতে দিলেন তাঁরা। খাবার পর রণবীর আমাদের ঘরে এসে কিছুক্ষণ গল্প ক'রে চ'লে যাবার সময় বললেন, কাল খুব ভোরে তুলে দেব আপনাদের, সকালবেলাতেই সেখানে গিয়ে পৌঁছতে পারবেন।

পরদিন রাত থাকতে রণবীর সিংজী এসে আমাদের তুলে জিজ্ঞাসা করলেন, চা-টা খাওয়ার অভ্যেস আছে ?

বললুম, পেলে তো বেঁচে যাই।

আমাদের জন্যে চায়ের হুকুম দিয়ে সিংজী বললেন, কলকাতায় থেকে ওইটুকু বদ্ অভ্যেস হয়ে গেছে। তারপর একথা সেকথার পর বললেন, চলুন, আমিও আপনাদের সঙ্গে যাই, সাধুদর্শন ক'রে আসি।

—বেশ তো, চলুন না।

সিংজী বললেন, আপনারা সেখানে পুরো একটা দিন-রাত থেকে বিশ্রাম ক'রে ফিরবেন, আমি দর্শন ক'রেই ফিরে আসব। ফেরবার সময় আবার আমাদের এখানে এক রাত্রি কাটিয়ে যাবেন।

হু গেলাস গরম গরম চা মেরে আমরা বেরিয়ে পড়লুম। আগের দিন রাত্রে বেশ ভাল আহার ও সারারাত্রি নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে শরীর ও মন বেশ ঝরঝরে হওয়ায় আমরা খুব দ্রুত হাঁটতে লাগলুম। রণবীর সিংজী তাঁদের দেশের গল্প করতে থাকায় পথশ্রম অনেক ক'মে গেল। সূর্যোদয়ের কিছু পরেই আমরা লক্ষ্যস্থলে গিয়ে উপস্থিত হলুম।

আমরা সেখানে পৌঁছেই বুঝতে পারলুম যে, মেলা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। দূর-দূরান্তর থেকে লোক আসা ক'মে গিয়েছে, কাছাকাছির লোকেরা, যারা প্রায়ই আসে তারাই আসছে যাচ্ছে। সদাব্রতের ধুমধাম আর নেই, লোকজনের উৎসাহ যেন ক'মে এসেছে।

জমিদারের প্রকাণ্ড বাড়ি। কত যে ঘোড়া তার আর ঠিক নেই, উটও দেখলুম অনেক রয়েছে, একটা হাতীও বাঁধা রয়েছে। এক দিকের উঠোনে অসংখ্য গোলা পায়রা—তখন তাদের খেতে দেওয়া হচ্ছিল। এ সব ছাড়িয়ে প্রকাণ্ড বাগান, এই বাগানের এক দিকে একখানা ছোট মত সুদৃশ্য বাড়ির একতলায় সাধু মহারাজ থাকেন।

ঘরের মধ্যে ঢুকে দেখলুম, ধপধপে সাদা চাদর পাতা একটা ছোট গদিতে সাধু মহারাজ ব'সে আছেন। সাধুর মাথায় প্রকাণ্ড জটা, একমুখ দাড়ি ও গোঁফ সাদা থেকে লাল হয়ে গিয়েছে। তাঁর পাশে গদির নীচেই একটি লোক ব'সে আছেন, তাঁকে দেখলে মনে হয় সত্তর পার হয়ে গিয়েছে, তাঁরও সাদা ধপধপে দাড়ি গোঁফ। এই লোকটিকে দূর থেকে দেখলেও বিশিষ্ট লোক ব'লে মনে হয়, চোখ বুজে স্থির হয়ে সাধুর পাশে ব'সে আছেন। শুনলুম যে ইনিই সরকার অর্থাৎ রাজা, যাঁর বাড়িতে সাধু মহারাজ বাস করছেন। ইনি বাল্যকালেই সাধুর শিষ্য হয়ে তাঁর সঙ্গে চ'লে গিয়েছিলেন হিমালয় পাহাড়ে। সেখান থেকে দশ বছর পরে দেশে ফিরে আসেন। তারপর সারা জীবন ধ'রে নানা তীর্থে ঘুরে বেড়িয়েছেন, কখনও বা গুরুর কাছে কাটিয়েছেন। বিবাহাদি করেন নি, বিষয়-আশয় তাঁর ভাইপোর বংশধরেরা ভোগ করে, বর্তমান রাজা

তাঁর ভাইয়ের নাতি হ'লেও জয়পুরের রাজসরকার এখনও এঁকেই রাজা ব'লে মানেন। বর্তমান রাজা এঁর প্রতিনিধি মাত্র।

সাধুর সামনে আরও কয়েকজন লোক ব'সে আছেন। সাধু মহারাজ মাঝে মাঝে তাদের সঙ্গে দু-একটা কথা বলছেন। আমরা প্রথমে একেবারে সাধুর কাছে না গিয়ে একটু দূরে দাঁড়িয়ে রইলুম—অনেকক্ষণ সেইভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে হ'ল। সেইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সাধু মহারাজকে যতটুকু দেখতে পেলুম তাতে মনে হ'ল, যে সাধু এসে পরেশদাকে নিয়ে গিয়েছিল এ যেন সে সাধু নয়। অবিশ্যি পরেশদার গুরুকে আমরা দূর থেকে কয়েক সেকেণ্ড, বড় জোর এক কি দেড় মিনিট দেখেছিলুম, তাতে মনে হয়েছিল তাঁর যেন এক বিরাট চেহারা। এই সাধুর মূর্তি বড় হ'লেও ঠিক যেন তাঁর মতন নয়। আমি এদিক ওদিক দেখতে লাগলুম যদি জুগ্‌নুর দেখা পাওয়া যায়! কিন্তু তাকে দেখতে পেলুম না। ইতিমধ্যে সাধুর সামনে যারা ব'সে ছিল তারা একে একে উঠে যেতেই প্রথমে রণবীর সিং তারপরে আমরা গিয়ে তাঁকে প্রণাম করলুম।

সাধু মহারাজ আমাদের প্রত্যেকের দিকে চাইতে লাগলেন—হাসি হাসি মুখ, চোখ দুটোও যেন হাসতে লাগল। মনে হতে লাগল যেন কত আপনার লোক তিনি—অনেক দিন বাদে আমাদের দেখা পাওয়ায় খুব খুশি হয়েছেন। আমরা দাঁড়িয়ে আছি দেখে ইঙ্গিতে ডেকে আমায় বললেন, আও, বয়ঠো।

আমরা তাঁর সামনেই ব'সে পড়লুম। সিংজী কিন্তু দাঁড়িয়েই রইল। সাধু মহারাজের আশেপাশে আরও কয়েকজন লোক ব'সেছিলেন—তাঁদের দেখে মনে হ'ল, হয় তাঁরা সেই বাড়িরই লোক, নয়তো সর্বদাই তাঁর কাছাকাছি থাকেন। এঁদের উদ্দেশ ক'রে সন্ন্যাসী বললেন, এই ছেলেরা খুবই ভক্তিমান, অনেক দূর থেকে সাধুদর্শন করতে এসেছেন।

এই অবধি ব'লে সন্ন্যাসী পাশে উপবিষ্ট সরকার বাহাদুরকে ডাক দিলেন, বাড়ে!

সরকার বাহাদুর চোখ চাইতে তিনি বললেন, দেখো বড়ে, এই ছেলেরা বাংলা দেশ থেকে এসেছে!

সরকার বাহাদুর হাসিমুখে আমাদের দিকে চাইতে আমরা তাঁকে নমস্কার করলুম। সাধু মহারাজ বললেন, এখানে আসতে পথে কোনও কষ্ট হয় নি?

বললুম, মহারাজ, আপনার আশীর্বাদে আমাদের কোনও কষ্টই হয় নি। ঠাণ্ডা দিন ছিল, শ্রান্তি বোধ করলেই গাছের ছায়ায় বিশ্রাম করেছি—রাত্রে এই সিংজীর আশ্রয়ে আনন্দে কাটিয়েছি।

সাধু এতক্ষণে মুখ তুলে রণবীর সিংকে দেখে বললেন, ব'সো।

সাধু আমাদের বললেন, আমার একটি ছেলে আছে, যার বাড়ি তোমাদের দেশে। দেখা করবে তার সঙ্গে?

বললুম, নিশ্চয়। কোথায় তিনি?

সাধু বললেন, কে আছ, আনন্দ্‌কে ডেকে দাও তো?

দু-তিনজন লোক চেঁচামেচি করতে লাগল, এ আনন্দ্‌ মহারাজ—সদানন্দ্‌ বাবা—সদানন্দ্‌জী—

আশা হতে লাগল, এ আমাদের পরেশদা না হয়ে যায় না। বুকের মধ্যে টিপটিপ করতে লাগল, মনের মধ্যে কল্পনার ভিড় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল, কিন্তু হায়, বিধির ইচ্ছা ছিল অন্য প্রকার!

অনেক ডাকাডাকি ও হাঁকাহাঁকির পর সদানন্দজী তো এসে হাজির হলেন, কিন্তু পরেশদার সঙ্গে তাঁর কোনও সাদৃশ্যই নেই।

সদানন্দ মহারাজকে দেখে মনে হ'ল, তাঁর বয়স চল্লিশের কিছু বেশি। দীর্ঘ দেহ, মাথায় কুণ্ডলী-পাকানো জটা, মুখ দাড়ি-গোঁফে ভরা, তাতে একটু পাক ধরেছে। দেহের বাঁধুনি ব্যায়ামবীরের মতন। তিনি ছুটতে ছুটতে এসে সাধুর সামনে দাঁড়াতেই অতি মধুর স্বরে তিনি বললেন, বেটা, তোমার জন্মভূমি যেখানে, এঁরা সেই দেশের লোক।

আমরা সদানন্দজীকে নমস্কার করতেই তিনি হাত দুটো জোড় ক'রে নিজের

বুকে ঠেকিয়ে সেইভাবেই দাঁড়িয়ে রইলেন। সাধু আবার বললেন, আনন্দ, এই ছেলেরা বড় ভক্তিমান। এঁরা দূরান্তর থেকে পদব্রজে সাধুদর্শন করতে এসেছেন। এঁদের ক্লান্তি দূর করবার ব্যবস্থা কর, এঁদের বিশ্রাম ও আহারের যেন কোনো ত্রুটি না হয়।

গুরুর কথা শুনেই সদানন্দ মহারাজ আমাদের বললেন, চলুন।

কিন্তু তখুনি সেখান থেকে ওঠবার ইচ্ছা আমাদের মোটেই হচ্ছিল না। উঠতে তা-না-না-না করছি দেখে যেমন ক'রে ছেলে ভোলায় তেমনি মিষ্টি সুরে সাধু মহারাজ আমাদের বললেন, যাও বেটা, তোমরা ক্লান্ত, এখন বিশ্রাম কর গিয়ে। সন্ধ্যার সময় এখানে ভজন কীর্তন হবে, তখন এসো।

এর পর আর সেখানে ব'সে থাকা চলে না, উঠতেই হ'ল। আমাদের সঙ্গে সঙ্গে রণবীর সিংজীও সাধুকে প্রণাম ক'রে বেরিয়ে এলেন। বললেন, ভাগ্যে আপনারা আমার বাড়িতে এসেছিলেন, তাই তো মহাপুরুষ দর্শন হয়ে গেল, এই জন্যেই লোকে সৎসঙ্গের কামনা করে, ইত্যাদি।

রণবীর সিং বললেন, আপনারা যদি দু-চার দিনের মধ্যে ফেরেন, তবে আমার ওখানে হয়ে যাবেন। আমি শীগগিরই কলকাতায় ফিরব। তার আগে জয়পুরের গদিতে কিছু কাজ সারতে হবে, আপনাদের সঙ্গেই জয়পুরে ফেরা যাবে।

ফেরবার সময় তাঁর ওখানে একদিন থাকব প্রতিশ্রুতি দিলাম।

রণবীর সিং চ'লে গেলেন। আমরা সদানন্দজীর সঙ্গে বাগান পেরিয়ে একটা দোতলা বাড়িতে এসে উপস্থিত হলুম। তিনি সঙ্গে ক'রে ওপরে নিয়ে গেলেন। বললেন, এটা রাজাদের পান্থশালা। একটা ঘরে আমাদের নিয়ে গিয়ে বললেন, এই ঘরে আপনারা বিশ্রাম করুন।

ঘরখানা বাড়ির তুলনায় একটু ছোট মনে হ'লেও অমন চমৎকার ঘর আজও দেখি নি। ঘরের মেঝে থেকে প্রায় এক মানুষ উচু অবধি ফিকে নীল পংকের কাজ—মনে হয় যেন দেওয়ালে নীল কাচ বসিয়ে দেওয়া হয়েছে—তার

ওপরের বাকি দেওয়াল ও সিলিংয়ে ফিকে সবুজ রঙের জমিতে গাঢ় সবুজ রঙের পদ্মপাতা ও সাদা পদ্মফুল—সমস্তটাই তেলের কাজ। ঘর জোড়া শতরঞ্চি, তাকে কার্পেট বললেই হয়। এক দিকে একটু উঁচু গদির ওপরে সাদা চাদর টান ক'রে পাতা, তার ওপর চার-পাঁচটা গোল মোটা মোটা গিদ্দে।

সদানন্দজী আমাদের বসতে ব'লে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনারা এখুনি আস্নান করবেন, না আর একটু বিশ্রাম করবেন?

একটু পরে আস্নান করব ব'লে তাঁকে বললুম, আনন্দ্‌জী, আপনার সঙ্গে একটু আলাপ করতে চাই, বিশেষ ব্যস্ত আছেন কি?

সদানন্দজী টপ ক'রে ব'সে প'ড়ে বললেন, আমি আপনাদের সেবক।

প্রথমে আমরা তাঁর নিজের কথা জিজ্ঞাসা করলুম। বাংলা দেশে বাড়ি অথচ বাংলা বলতে পারেন না কেন—প্রশ্ন করায় তিনি বললেন, আমি বাংলা দেশে জন্মেছি মাত্র। খুব ছেলেবেলায় আমাকে নিয়ে আমার মা বাবা হরিদ্বারে কুম্ভমেলায় গিয়েছিলেন। সেখানে অসুখ হয়ে মৃত্যু হওয়ায় তাঁরা আমার দেহটা নদীতে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। একদিন 'বড়ে' নদীতে স্নান করছিলেন, এমন সময় আমার মৃতদেহটা তাঁর গায়ে এসে ঠেকল। তিনি জলের ঝাপটা দিয়ে দিয়ে সেটাকে আবার স্রোতের মধ্যে ঠেলে দিলেন বটে, কিন্তু দেহটা আশ্চর্যভাবে ঘুরে আবার তাঁর কাছে ফিরে আসতেই তিনি সেটাকে জল থেকে তুলে একেবারে গুরুর কাছে নিয়ে এসে সব খুলে বললেন। গুরু দেখে সেটাতে প্রাণসঞ্চার ক'রে মানুষ ক'রে তুললেন, সেই ছেলে হচ্ছি আমি।

গুরুর কাছে শুনেছি, প্রথম প্রথম আমার মুখ দিয়ে বাংলা বুলি বেরিয়েছিল, তার পরে ক্রমে ক্রমে হিন্দী কথা বলতে আরম্ভ ক'রে দিলুম।

আমরা জিজ্ঞাসা করলুম, ওই যে 'বড়ে' বললেন, সেই 'বড়ে'টি কে?

সদানন্দজী বললেন, 'বড়ে' হচ্ছেন এখানকার রাজা অর্থাৎ সরকার। উনি দশ-বারো বছর বয়সে রাজ্য-সংসার সব ছেড়ে দিয়ে গুরুর অনুগামী হয়েছিলেন।

'বড়ে' মহারাজের পিতামহ, তিনিও এখানকার রাজা ছিলেন—তিনিও আমাদের গুরুর শিষ্য ছিলেন, তবে তিনি ছিলেন গৃহী। 'বড়ে' মহারাজ সংসারত্যাগী, উনি নানা তীর্থে ঘুরে বেড়ান, মাঝে মাঝে এখানেও এসে থাকেন। তবে গৃহ-সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক তাঁর কোন কালে ছিলও না এখনও নেই। বিষয় ও রাজত্বের সঙ্গে কোন সম্পর্ক না থাকলেও এখানকার বর্তমান রাজা—যিনি ওঁর ছোট ভাইয়ের নাতি, রাজপরিবারের সকলে ও প্রজারা তাঁকে রাজার মতনই সম্মান ক'রে থাকেন। এ ছাড়া আমাদের গুরুদেবের সঙ্গে এই পরিবারের সম্পর্ক প্রায় দুশো বছরের। এখানকার রাজপরিবারের প্রায় সমস্ত স্ত্রী-পুরুষই সাধু মহারাজের শিষ্য ও শিষ্যা।

জিজ্ঞাসা করলুম, আপনি বললেন, এই পরিবারের সঙ্গে আপনার গুরুর সম্বন্ধ প্রায় দুশো বছরের, কিন্তু আপনার গুরুর বয়স হয়েছে কত?

সদানন্দ মহারাজ সহাস্যে বললেন, তা আড়াই শো বছরের কিছু বেশি হবে। ত্রৈলঙ্গ স্বামীজী ও আমার গুরু প্রায় একই বয়েসী।

জিজ্ঞাসা করলুম, 'বড়ে' মহারাজের কত বয়স হবে?

—ওঁর নব্বুই পার হয়ে গিয়েছে।

জিজ্ঞাসা করলুম, আপনার কত বয়স হবে আনন্দজী? ষাট পেরিয়েছে?

আনন্দজী হো-হো ক'রে হেসে উঠে বললেন, বাবুজী, আমার উমর আশী পেরিয়ে গিয়েছে। 'বড়ে' মহারাজ যখন আমাকে কুড়িয়ে পান তখন আমার আন্দাজ পাঁচ বছর বয়স ছিল। এখন 'বড়ে'র বয়স বিরানব্বুই বছর—আমার চেয়ে তিনি এগারো বছরের বড়।

সদানন্দজীর কথা শুনে বিস্ময়ে আমাদের মুখ দিয়ে কিছুক্ষণ আর বাক্য নিঃসরণ হ'ল না।

সত্যিই এই সদানন্দ মহারাজ অদ্ভুত মানুষ ছিলেন—ছিলেন বললে বোধ হয় ভুল হবে, কারণ আমার বিশ্বাস তিনি এখনও জীবলোকেই আছেন এবং আমরা পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে চ'লে যাবার অনেক পরেও থাকবেন।

মানুষের মধ্যে যত প্রকার শ্রেণী আছে—অর্থাৎ জ্ঞানী, অজ্ঞানী, বিদ্বান, বুদ্ধিমান, বিবেচক, অবিবেচক, ধূর্ত, নির্বোধ, সুবোধ, দুর্বোধ—এদের কারুকেই স্রেফ দেখেই বোঝা যায় না যে, কোন্ শ্রেণীর মানুষ! কিন্তু একটি বিশেষ শ্রেণীর মানুষ আছে, যারা পরশমণির ছোঁয়া পেয়েছে—তাদের দেখলেই চিনতে পারা যায়। অন্তত এই শ্রেণীর যত লোকের সাহচর্যে আমি এসেছি, তাদের দেখেই চিনতে পেরেছি। গৃহত্যাগ করবার বছরখানেক আগে সর্বপ্রথমে এই শ্রেণীর একজনের সান্নিধ্যে আসবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। যদিও সে কুড়ি-পঁচিশ মিনিটের বেশি হবে না, তবুও সে মূর্তির প্রতিচ্ছবি আমার মানসপটে এখনও জ্বলজ্বল করছে।

এই মহাপুরুষ রবীন্দ্রনাথের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বিভিন্ন হিন্দু-ধর্মগ্রন্থ থেকে ব্রাহ্মধর্ম ও সমাজের অনুকূল কয়েকটি শ্লোক সঙ্কলন ক'রে 'ব্রাহ্মধর্ম' নাম দিয়ে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন। এই বইয়ের কুড়ি-পঁচিশটি সংস্কৃত শ্লোক আমাদের সুর ক'রে পড়তে শেখানো হয়েছিল। শেখাতেন মহর্ষির ভূতপূর্ব সভাপণ্ডিত এবং রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনের প্রথম সংস্কৃত অধ্যাপক পণ্ডিত শিবধন বিদ্যার্ণব মশায়। ছেলেরা যখন সমবেত কণ্ঠে সুর ক'রে সেই সব শ্লোক আবৃত্তি করতে শিখে গেল তখন অভিভাবকেরা স্থির করলেন, তাঁদের এ হেন কেরামতিটা মহর্ষিকে একবার শুনিয়ে আসা চাই।

সে সময়ে দেবেন্দ্রনাথের বয়স আশী পেরিয়ে গিয়েছিল। অধিকাংশ সময় শুয়েই থাকেন, পরের সাহায্য ব্যতীত ওঠা-চলা করতে পারেন না। কানে একেবারেই শুনতে পান না। তাঁর কর্মচারী ও পার্শ্বচর প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মশায়

তাঁর ক্যান্‌ক্যানে গলায় চীৎকার ক'রে বললে কিছু কিছু শুনতে পান মাত্র। তবুও বালকেরা তাঁর কাছে আসতে চায় এবং 'ব্রাহ্মধর্মে'র শ্লোক শোনাতে চায় জেনে তিনি শুনতে রাজী হলেন।

মনে পড়ে একদিন—বোধ হয় রবিবার সকালে স্নান ক'রে পরিষ্কার ধুতি-জামা প'রে আমরা কয়েকটি ছেলে জোড়াসাঁকোতে মহর্ষিভবনে গিয়ে উপস্থিত হলুম। ব্যবস্থা আগে থাকতেই ঠিক করা ছিল। সেখানে উপস্থিত হওয়ার কিছু পরে একটা ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে আমাদের তেতলায় ছাতের ঘরে নিয়ে যাওয়া হল। ঘরের মধ্যে আমাদের সামনে একটা পর্দা ছিল, সেটাকে সরিয়ে দিতেই দেখলুম একখানা বড় আরাম-কেদারায় ব'সে আছেন বিরাট এক পুরুষ, নবোদিত সূর্যের মতন। সাদা পাজামা ও সাদা পাঞ্জাবি পরা—ধপধপে সাদা গায়ের রঙ, মাথার চুল দাড়ি তুষারশুভ্র—অদ্ভুত সে দৃশ্য! মানুষ যে এ রকম দেখতে হতে পারে তার ধারণা এর আগে আমার ছিল না। শুধু যে আয়তনেই তিনি বিরাট পুরুষ ছিলেন তা নয়। আমরা ঘরে বাইরে মন্দিরে মহোৎসবে নিত্য যে সব লোকের সংস্পর্শে আসি—দেখলেই বুঝতে দেরি হয় না যে, এ মানুষ সে শ্রেণীর নয়, তার চেয়ে অনেক বড়।

দেখতে লাগলুম, মহর্ষির সমস্ত শরীরটা স্থির রয়েছে, কিন্তু মাথাটা ধীরে ধীরে কাঁপছে। দুই চক্ষু মুদিত—মৃদুমন্দ বাতাসে চুল দাড়িগুলো একটু একটু নড়ছে আর সর্বাঙ্গে একটা দৈবী দ্যুতি ঝলমল করছে।

আমরা একে একে সকলে তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম ক'রে পায়ের কাছে অর্ধবৃত্তাকার হয়ে ব'সে শ্লোকগুলি সুর ক'রে আবৃত্তি করলুম। এই সমস্তক্ষণটাই আমি তাঁর মুখের দিকে চেয়ে ছিলুম। মহর্ষির দুই চক্ষু নিমীলিত থাকলেও দেখলুম, মাঝে মাঝে তাঁর মুখখানা লাল হয়ে উঠছে আবার সাদা হয়ে যাচ্ছে। আমরা গান শেষ করতেই তিনি পরিষ্কার কণ্ঠে কিছু বললেন, তারপরে আমরা প্রণাম ক'রে উঠে এলুম।

এর কয়েক মাস পরেই মহর্ষি দেহরক্ষা করেন।

এই সদানন্দ মহারাজের সঙ্গে মহর্ষির চেহারার অবশ্য তুলনা হয় না। মহর্ষির বর্ণ ছিল তুষার-শুভ্র এবং যৌবনে তিনি নিশ্চয় দেখতে অতি সুন্দর ছিলেন। চেহারার দিক দিয়ে সদানন্দজীকে খুব সুন্দর তো দূরের কথা, সুন্দরই বলা চলে না। অঙ্গে তাঁর কোনও জন্মে বোধ হয় আবরণ পড়ে নি। রোদে, জলে, শীতে গায়ের যে রঙ হয়েছে তার কোনও সংজ্ঞা অভিধানে পাওয়া যায় না। মাথায় জটা, মুখ দাড়ি-গোঁফে ভরা, তাও অযত্ন-রক্ষিত। কিন্তু আশী বছর বয়সে কিশোরের মতন লাফালাফি ক'রে তাঁকে চলতে ফিরতে দেখেছি—মনে হয়েছে প্রতি ভঙ্গীতে যেন আনন্দ ছল্‌কে পড়ছে। সদানন্দ নাম তাতে সার্থক হয়েছিল। কথাবার্তার মধ্যে দিয়ে মানুষের মনের আনন্দ বুঝতে পারা যায়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, বেশি কথা তাঁকে বলতে দেখি নি—সত্যি কথা বলতে কি, প্রথমে তাঁকে গম্ভীর মানুষ ব'লেই মনে হয়েছিল। কিন্তু তাঁর চোখ মুখ—তাঁর প্রতিটি কথা, প্রতিটি কার্য ও সেবার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পেতে লাগল তাঁর মনের আনন্দ। তাঁর জীবনের ইতিহাস শুনে প্রথমে আমাদের দুঃখ হয়েছিল। মনে হয়েছিল, ঈশ্বর যদি তাঁকে বাঁচিয়েই দিলেন তবে অমন ক'রে সারা জীবন আপনার জন থেকে তাঁকে বিচ্ছিন্ন রাখলেন কেন? কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই মনে হতে লাগল যে, গৃহে থাকলে এই অপূর্ব শক্তির অধিকারী তিনি কিছুতেই হতে পারতেন না। একমাত্র গুরুর কৃপাতেই তিনি আজ সর্ববিষয়ে সত্যিকারের সদানন্দ হয়েছেন।

একটু বিশ্রাম ক'রে চাঙ্গা হতেই সদানন্দ মহারাজ এসে আমাদের নিয়ে গিয়ে বাগানে এক কুয়ো থেকে স্নান করিয়ে নিয়ে এলেন। আমরা টানা-হেঁচড়া ও নানা রকম আপত্তি করা সত্ত্বেও সেই আশী বছরের বৃদ্ধ-যুবক, সেই সদানন্দ-সন্ন্যাসী ডুলি ক'রে জল তুলে তুলে আমাদের স্নান করালেন। বললেন, আপনারা আমাদের অতিথি। আমার গুরু নিজে ব'লে দিয়েছেন আপনাদের সেবা করতে—এই অতিথিসেবা থেকে অনুগ্রহ ক'রে আমায় বঞ্চিত করবেন না। আজ থেকে অনেক—অনেক দিন পরে আপনাদের বয়স যখন আমার

মতন হবে, তখন এই সাধুদর্শনের কথা মনে হ'লেই আমার কথাও মনে হবে আর সহৃদয়তার সঙ্গে আমাকেও স্মরণ করবেন। সন্ন্যাসীর কথা বৃথা যায় না—আজ এই জাতক লিখতে লিখতে সদানন্দ মহারাজের কথা মনে হচ্ছে আর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতায় অন্তর লুটিয়ে পড়ছে তাঁর পায়ে, চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হয়ে উঠছে।

স্নান সারা হয়ে গেলে আমরা গেলুম প্রাসাদের অন্য এক মহলে। সেখানে পাতা পেতে খাওয়া হ'ল—পুরি তরকারি, জোঁদা টক ঝোলো দই আর শুকনো বোঁদে। সদানন্দজী নিজের হাতে আমাদের পরিবেশন করলেন।

আহার সেরে আমরা নিজেদের ঘরে ফিরে এলুম। সদানন্দজী বললেন, আপনারা বিশ্রাম করুন, সন্ধ্যাবেলা যখন ভজন হবে তখন সাধুর কাছে নিয়ে যাব। ইতিমধ্যে যদি আপনাদের ভাল লাগে, তবে এদিক ওদিক বেড়িয়ে আসতে পারেন।

কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে আমরা রাজপ্রাসাদ থেকে বেরিয়ে জায়গাটাকে ভাল ক'রে দেখে বেড়াতে লাগলুম। রাজপুতানার গ্রাম দেখবার সুযোগ ইতিপূর্বে আর হয় নি। কিছুক্ষণ এদিক ওদিক ঘুরে কাছেই একটা বৃক্ষলতাশূন্য ছোট পাহাড় দেখতে পেয়ে সেখানে গিয়ে উঠলুম। এইখানে ব'সে ব'সে আমরা ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে মতলব আঁটতে লাগলুম।

বিস্কুটের টিন খালি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনের জোরও নিঃশেষ হয়ে আসছিল। জনার্দন বললে, তার বাড়িতে লিখলে কিছু টাকা তারা পাঠিয়ে দিতে পারে। সেখান থেকে যদি টাকা আসে তো তা দিয়ে ব্যবসা ফাঁদা যেতে পারে। ব্যবসায় যদি আমরা লাভ দেখাতে পারি, তা হ'লে বাড়ি থেকে আরও টাকা পাওয়া যেতে পারে।

আমি কিন্তু বেশ বুঝতে পারছিলুম যে, টাকার অভাবই আমাদের একমাত্র অভাব নয়। একটা অদৃশ্য শক্তি প্রতিপদেই আমাদের বাধা দিয়ে চলেছিল। আগ্রার পরেশদার মা যদি আর কিছুদিন বাঁচতেন তা হ'লে আমাদের একটা

গতি নিশ্চয় হয়ে যেত। আমাদের একজনেরও অন্তত কাজকর্ম একটা কিছু জোটবার পর মা যদি মারা যেতেন তা হ'লেও না হয় বুঝতুম। কিন্তু তিনি যেন আমাদের জন্যেই অপেক্ষা করছিলেন, আমরা আসার পরই চ'লে গেলেন। আগ্রাতেই সত্যদার কল্যাণে অমন মহাজন জুটল—লোকের কপালে একটা জোটে না, আমাদের জুটল তো ছপ্পর ফুঁড়ে দু-দুটো জুটল; কিন্তু কোথা থেকে শনি এসে প্রবেশ করলেন বাঁদরের রূপ ধ'রে—সব এমন ফেঁসে গেল যে পালাতে পথ পেলুম না। তার পরে ভরতপুরে ও গোয়ালিয়রে—বেশ বুঝতে পারছিলুম একটা শক্তি আমাদের রক্ষা করবার, পোষণ করবার চেষ্টা করছে, আর একটা শক্তি চেষ্টা ক'রে চলেছে আমাদের ধ্বংস করবার, আমাদের যা কিছু প্রয়াস তা নষ্ট করবার।

তাই, জনার্দন যখন তার বাড়ি থেকে টাকা নিয়ে এসে ব্যবসা করবার কথা খুব উৎসাহের সঙ্গে বলতে লাগল, তখন আমি বিশেষ উৎসাহিত হতে পারলুম না। আগেই বলেছি যে, জয়পুরে এসে অবধি আমি নিজের মধ্যে একটা পরিবর্তন বুঝতে পারছিলুম। আমি বন্ধুদের কাছে প্রস্তাব করলুম, আচ্ছা, কিছু করবার চেষ্টা করা বন্ধ ক'রে দেখলে হয় না?

তারা বললে, সে কি ক'রে সম্ভব হয়! তাই যদি করা হয়, তা হ'লে বাড়ি থেকে বেরুবার প্রয়োজনই বা কি ছিল!

আমি বললুম, আচ্ছা, এই সন্ন্যাসীদের সঙ্গে ভিড়ে গেলে কেমন হয়?

জনার্দন বললে, কি সর্বনাশ! সন্ন্যেসী হব কি রে! তার চেয়ে বাড়ি ফিরে গিয়ে দাদার ব্যবসায়ে লেগে যাব।

সুকান্ত বললে, তার এক দাদা আহমেদাবাদে থাকেন। বাংলা দেশের প্রতি কৃতজ্ঞতাস্বরূপ আহমেদাবাদের কাপড়ের কলওয়ালারা জন কয়েক বাঙালী ছেলেকে কলের কাজকর্ম শেখাতে রাজী হওয়ায় কয়েকটি বাঙালী ছেলে সেখানে থাকে। মিলওয়ালারা তাদের কাজ শেখাবার জন্যে পয়সাকড়ি কিছু নেয় না। দু-তিন বছর কাজ শেখবার পর তারা ওখানেই চাকরি পাবে। কিছুদিনের

জন্যে ওখানেই তাদের চাকরি করতে হবে, তার পর অন্যত্র যেতে পারে। বিনা পয়সায় কাজ শেখবার ব্যবস্থা থাকলেও ছেলেদের সেখানে নিজের খরচায় থাকতে হয়।

সুকান্ত বলতে লাগল যে, তার এক দাদা সেখানে থেকে মিলের কাজ শেখেন, সে সেখানে চ'লে যাবে।

আমি বললুম, সন্ন্যাসীদের সঙ্গে আগে আমি কথা বলি। আমাকে যদি তারা নিতে রাজী হয় তা হ'লে তোমরা যার যেখানে ইচ্ছা চ'লে যেয়ো, না হ'লে আবার দেখা যাবে।

সেদিন বিকেল হতে না হতে ঘরে ফিরে এলুম। মন এত ভারী যে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তাই বন্ধ হয়ে গেল। বিছানার এক-একটা কোণ এক-একজন দখল ক'রে গুম হয়ে ব'সে রইলুম। চারদিকে ক্রমেই অন্ধকার হয়ে এল। কিছুক্ষণ পরে সদানন্দ মহারাজ একটা আলো হাতে নিয়ে এসে বললেন, চলুন, এবার ভজনের আয়োজন হচ্ছে।

আলোটা ঘরে রেখে সদানন্দ মহারাজ আমাদের নিয়ে চললেন। সাধুর কাছে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করতেই সকালবেলাকার মত সস্নেহ দৃষ্টিতে আমাদের সম্ভাষণ ক'রে ইঙ্গিতে কাছেই এক জায়গায় বসতে বললেন। ঘরের মধ্যে দুটো ঝাড়ে বোধ হয় পঞ্চাশটা মোমবাতি জ্বলছে। খুব ভিড় নেই। বোঝা গেল, যাঁরা সেখানে উপস্থিত রয়েছেন তাঁরা সকলেই বিশিষ্ট শ্রেণীর লোক। সকালবেলায় যাঁদের ব'সে থাকতে দেখেছিলুম, তাঁদের পোশাকে এমন পারিপাট্য দেখি নি। তীব্র একটা আতরের গন্ধে ঘর একেবারে আমোদিত। বলা বাহুল্য, সেটা আগন্তুকদের কারুর অঙ্গ থেকে বেরুচ্ছিল। আর একটা দৃশ্য দেখলুম, যা সেবার কিংবা তার পরেও রাজপুতানার অন্য কোথাও দেখি নি। ঘরের এক দিকে দেখলুম একদল মহিলা ব'সে আছেন। সে দিকটা অপেক্ষাকৃত অন্ধকার। মনে হ'ল, মহিলারা বসবেন ব'লে ইচ্ছা ক'রেই সে দিকটা আলোকিত করা হয় নি। রাজপুতানার সাধারণ মেয়েদের মধ্যে পর্দা নেই বটে, কিন্তু এই

সর্দারদের বা অন্য বড় ঘরের মেয়েদের মধ্যে খুবই কড়া পর্দার রীতি প্রচলিত আছে। ঘরের মধ্যে সব চুপচাপ, শুধু মাঝে মাঝে নারীকণ্ঠের চাপা আওয়াজ শুনতে পাওয়া যাচ্ছিল। সাধু মহারাজের একদিকে বড়ে মহারাজ ব'সে আছেন। মুণ্ডিত মস্তক, পরিচ্ছদেরও কোনো বাহুল্য নেই। সকালে তাঁকে মুদিত-চক্ষু অবস্থায় দেখেছিলুম, এ বেলায় দেখলুম চোখ খুলেই ব'সে আছেন। চোখ তুলে যখন সামনে চাইছেন তখন মনে হচ্ছে, সামনের কোন জিনিসের প্রতি তাঁর নজর পড়ছে না—সে দৃষ্টি সুদূরপ্রসারিত, এ সব ছাড়িয়ে অন্য কোথাও কিসের অন্বেষণে সে দৃষ্টি ঘুরে বেড়াচ্ছে। সাধু বাবার অন্য পাশে ব'সে আছেন আর একজন সন্ন্যাসী, তাঁকে বড়ে মহারাজের চেয়ে বেশি-বয়সী ব'লে বোধ হয়। এঁর সামনে একটা প্রকাণ্ড একতারা মাটিতে রাখা হয়েছে। এত বড় একতারা এর আগে কখনও দেখি নি—প্রথম দৃষ্টিতে সেটাকে তম্বুরা ব'লে বোধ হয়।

ইতিমধ্যে সাধু মহারাজ একবার হাসিমুখে আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, বেটা, তোমাদের বিশ্রামের কোনও ব্যাঘাত হয় নি ?

বললুম, বাবা, আপনার দয়ায় আমাদের আহার ও বিশ্রাম হয়েছে। অনেক দিন এমন পরিতৃপ্তির সঙ্গে ভোজন করি নি।

মহারাজ বললেন, পরমাত্মা তোমাদের মনে এমনিই ভক্তি জাগিয়ে রাখুন।

আবার পায়ের ধুলো নিয়ে বললুম, আপনি আশীর্বাদ করুন।

মহারাজ আবার আমার মাথায় হাত ঠেকিয়ে আশীর্বাদ করলেন। ইতিমধ্যে পূর্বের সেই সাধু একতারাটা তুলে নিয়ে ছেড়তে অর্থাৎ আওয়াজ করতে আরম্ভ করলেন। যন্ত্রটা নামেই একতারা, কারণ তা থেকে আওয়াজ হতে লাগল তানপুরার মতন। আর একজন সাধু একটা খঞ্জনি লাগানো কাঠের খটখটি নিয়ে পাশে ব'সে গেলেন। এই সময় দেখা গেল, সাধু মহারাজের সঙ্গে আট-দশজন চেলা এসেছেন, সকালবেলায় এঁদের সকলকে দেখতে পাই নি।

যাই হোক, কিছুক্ষণ সেই একতারার আওয়াজ হতে না হতে অত বড় ঘর

একেবারে সুরে গম-গম করতে লাগল, মেয়েদের গুঞ্জন পর্যন্ত থেমে গেল। অনেকের চক্ষুই নিমীলিত হ'ল।

সন্ন্যাসী একে একে গুটি তিনেক মীরার ভজন গাইলেন। প্রথম গানটা মনে আছে, ফাগুনকো দিন যায়—যায় রে।

যিনি গাইলেন, তাঁর কণ্ঠ মধুর। গান শুনেই বুঝতে পারা যায় যে, অশিক্ষিতপটুত্বের স্বাভাবিক শক্তির জোরে তিনি গাইছেন না, বহুদিনের শিক্ষা ও সাধনা তাঁর এই অভিব্যক্তির পেছনে রয়েছে। তা ছাড়া, শুধু সুকণ্ঠ ও শিক্ষা থাকলেই এমন গান গাওয়া যায় না। এই সুরের পেছনে রয়েছে এমন এক রহস্যময় দুর্জ্ঞেয় সত্তার আকস্মিক আত্মোদ্দীপন, যা মানুষের বুদ্ধির মূঢ় তটসীমাকে অতিক্রম ক'রে হৃদয়কে পৌঁছে দেয় কোন এক চিরবেদনার অতল গভীরতায়, যেখানে যুগযুগান্ত ধ'রে বিরহী মানুষের অশ্রুর তরঙ্গ উদ্বেল হয়ে উঠছে।

গান আরম্ভ হবার কিছু পরেই অপেক্ষাকৃত অন্ধকার থেকে মেয়েরা এগিয়ে এসে একেবারে সামনেই বসলেন। আমি দেখতে লাগলুম, সাধুরা এবং আরও অন্যান্য যাঁরা সেখানে বসেছিলেন ক্রমে একে একে তাঁদের সকলের চোখ বন্ধ হয়ে আসতে লাগল, এমন কি মেয়েদের মধ্যেও অনেকেই চোখ বন্ধ ক'রে হাত জোড় ক'রে বসলেন। আমি জোর ক'রে চেষ্টা ক'রেও একাধারে চোখ খুলে রাখতে পারলুম না। একবার চোখ বন্ধ করি আবার জোর ক'রে খুলে সবাইকে দেখি—এমনই করতে করতে আমার সমস্ত দেহ যেন ভারী হয়ে আসতে লাগল। স্পষ্ট দেখলুম, অনেকেরই দুই চক্ষু দিয়ে অশ্রু ঝরছে। কেন এ অশ্রু? এই অশ্রুর উৎস কোথায়? চিন্তা করতে করতে অনুভব করলুম, আমারও দুই চক্ষু দিয়ে অশ্রু ঝরছে। দেখলুম, আমার পাশে জনার্দন ও সুকান্ত চোখ বুজে হাত জোড় ক'রে ব'সে আছে। এই কয়মাস নিরন্তর তাদের সঙ্গে একত্র বাস করছি; কিন্তু তাদের দেখে মনে হতে লাগল, এ কি অদ্ভুত মূর্তি, এ মূর্তি এতদিন তো চোখে পড়ে নি! মনে হতে লাগল, যেন দুটি দেবশিশু ধ্যানে ব'সে আছে। শুধু আমার বন্ধুরা নয়—সেখানে যত লোক

ব'সে ছিল, পুরুষ কিংবা স্ত্রী, সকলেই সেই গানের প্রভাবে যেন দিব্যান্বিত হয়ে উঠল। দেখতে দেখতে আমি একেবারে ডুবে গেলুম, তার পরে কিছুক্ষণ আর কিছু মনে নেই। শৈশবে একদিন ব্রহ্মমন্দিরে নামগানবিহ্বল ভক্তদের ভাবাকুল অশ্রুপাতের যে অতল রহস্য বিস্মিত মনে, হাস্যমুকুলিত চক্ষে নিরীক্ষণ করেছিলুম, আজ সেই অকূল রহস্যের কিনারায় পৌঁছনো মাত্র এক অনাস্বাদিতপূর্ব নির্মম বেদনার নিপীড়নে আমার দু চোখের দৃষ্টি স্তব্ধ-রোদনের অশ্রুভারে নিমীলিত হয়ে গেল।

সম্বিত ফিরে পেয়ে চোখ খুললুম। গান তখন থেমে গিয়েছে, ঘর একেবারে নিস্তব্ধ। সাধুদের চোখ তখনও বন্ধ, আরও অনেকে যাঁরা সেখানে ব'সে ছিলেন তাঁরা কেউ কেউ চোখ খুলছেন। মেয়েদের কেউ কেউ অশ্রুসিক্ত চোখ মার্জনা করছেন। বোধ হয় মিনিট দুই-তিন এইভাবে কাটবার পর আবার গান শুরু হ'ল, আবার সকলের চোখ বন্ধ হ'ল।

জ্ঞানোন্মেষ হবার আগে থেকেই ঈশ্বরের নামগান কীর্তন প্রভৃতির আসরে বসতে আমি অভ্যস্ত। সমবেতভাবে নিয়মিত ধ্যান ও নাম-কীর্তন হয় এমন সমাজে আমি জন্মেছি এবং সেই আবহাওয়ায় পালিত হয়েছি; কিন্তু এ রকম অভিজ্ঞতা আমার জীবনে এর আগে হয় নি। প্রাণস্পর্শী গান শুনে মনের মধ্যে ভক্তির উদয় হয়েছে—কখনো বেশি, কখনো কম। জ্ঞান বুদ্ধি দিয়ে সে প্রবাহকে সংযত করতে বেশি বেগ পাই নি। কিন্তু জ্ঞান, বুদ্ধি ও অহঙ্কারকে অতিক্রম ক'রে আর একটা হিল্লোল নিজের মধ্যে জেগে উঠছে—বেশ বুঝতে পারছি, নিজের মধ্যে একটা কিছু হচ্ছে এবং সেই একটা কিছু যে ঘটিয়ে তুলছে সে আসছে ওই গানের রূপ ধ'রে।

পরে জেনেছি যে, ভাগবতী সচেতনায় সচেতন যে আধার সে জ্ঞাতসারে কিংবা অজ্ঞাতসারেও দৈবী চেতনা সঞ্চারিত করতে পারে অন্য আধারে—অবশ্য পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি ও যাদের মধ্যে শক্তি সঞ্চারিত হবে তাদের আধারও সে অবস্থার অনুকূল হওয়া চাই।

গান শেষ হয়ে যাবার পর প্রথমে সাধুর চেলারা উঠে গেলেন, তার পরে বাইরের কয়েকজন যাঁরা ছিলেন তাঁরা প্রণাম ক'রে চ'লে গেলেন। মেয়েরা আরও এগিয়ে এসে সাধুর কাছে বসলেন। আমরা উঠে প্রণাম করতেই সাধু মহারাজ আমাদের জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা রাত্রে থাকবে তো?

বললুম, হ্যাঁ, আজ রাত্রে বিশ্রাম ক'রে কাল বেরুব।

নির্দিষ্ট কক্ষে ফিরে গিয়ে বিছানায় গা ঢেলে দেওয়া গেল। একটু পরেই সুকান্ত ও জনার্দন দুজনেই বলতে আরম্ভ করলে, সাধু মহারাজ যদি তোকে শিষ্য করেন তবে আমিও তাঁর শিষ্য হব—এমনি ক'রে ঘুরতে আর ভাল লাগে না, সত্যিই যদি তাঁর চরণে আশ্রয় পাই তো বেঁচে যাই।

সুকান্ত ও জনার্দন আমাকে এমনভাবে খোশামোদ করতে আরম্ভ করলে যেন আমি ইতিমধ্যে সাধু মহারাজের চেলা হয়ে একজন বড়দরের সন্ন্যাসীতে পরিণত হয়েছি। অথচ সেই দিনই বিকেলবেলা সেই পাহাড়ে ব'সে আমি যখন তাদের বলেছিলুম যে, আমি সাধু মহারাজের শিষ্য হয়ে তাঁদের সঙ্গে চ'লে যাব, তখন আমার সঙ্গে যোগ দেবার জন্যে তাদেরও অনুরোধ করেছিলুম—তারা দুজনেই সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান তো করেইছিল, উপরন্তু মৃদু বিদ্রূপ করতেও ছাড়ে নি। রাত্রের সেই কীর্তনসভায় ব'সে তাদের মতামত শুধু যে পালটে গেল তা নয়, দেখলুম তারা ভগবদ্ভক্তিতে জরজর হয়ে পড়েছে। বৈষ্ণবচূড়ামণি শ্রীরূপ গোস্বামী এক জায়গায় বলেছেন যে, অতি রুক্ষস্বভাববিশিষ্ট লোকেরও সদ্‌গোষ্ঠীর সহবাসে সত্ত্বগুণ জাগ্রত হয়—আমার বন্ধুদ্বয়ের নিশ্চয় সেই অবস্থা হয়েছিল।

জনার্দন তো কেঁদেই ফেললে আর তখুনি সাধু মহারাজের পায়ে ধ'রে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করবার সঙ্কল্পে তাঁর কাছে যাবার উদ্যোগ করতে লাগল। তখনকার মতন তাকে নিবৃত্ত ক'রে ক'রে আমরা তিনজনে পরামর্শ ক'রে ঠিক করলুম যে, রাত্রে আহারাদির পর আমি সদানন্দজীকে আমাদের সঙ্কল্পের কথা জানাব। তিনি কি পরামর্শ দেন তাই শুনে পরে যা হয় করা যাবে।

সদানন্দজীর অপেক্ষা করতে লাগলুম, কিন্তু তাঁর দেখাই নেই। ঘণ্টা-দুই তাঁর জন্যে অপেক্ষা ক'রে রাত্রে বোধ হয় আর খেতে-টেতে দেবে না মনে ক'রে শুয়ে পড়েছি, এমন সময় সদানন্দজী হাসিমুখে ঘরের মধ্যে এসে বললেন, চলুন, ভোজন করবেন।

আমরা জিজ্ঞাসা করলুম, কটা বেজেছে?

সদানন্দ বললেন, তা বোধ হয় বারোটা বেজে গিয়েছে।

খাবার জায়গায় গিয়ে দেখলুম, অনেক লোক খেতে বসেছে, দুপুরবেলা এত লোক দেখি নি। জিজ্ঞাসা ক'রে জানলুম যে, তারা সব সাধু দর্শন করতে এসেছে। আজ রাতে আর মহারাজের সঙ্গে দেখা হবে না, তিনি মেয়েদের সঙ্গে কথাবার্তা বলছেন। মেয়েরা চ'লে গেলেই তাঁর ঘরের দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। এরা সব আজ রাত্রিটা এখানে থাকবে। এদের ব্যবস্থা করতে হ'ল ব'লেই আমাদের ভোজনের দেরি হয়ে গেল।

খাওয়া-দাওয়া চুকে যাবার পর সদানন্দজী আমাদের সঙ্গে সঙ্গে এসে পৌঁছে দিয়ে চ'লে যাচ্ছিলেন, এমন সময় আমি তাঁকে বললুম, মহারাজ, যদি অসুবিধা না হয় তো আমাদের সঙ্গে একটু ঘরে চলুন না—প্রয়োজন আছে।

সদানন্দ মহারাজ বেশ প্রসন্নমনেই বললেন, বেশ তো, চলুন।

ঘরের মধ্যে এসে তাঁকে বসিয়ে আমরা তিনজনে তাঁকে ঘিরে বসলুম। প্রথমটা বলতে ইতস্তত করছি দেখে তিনি নিজেই জিজ্ঞাসা করলেন, কি বলতে চাইছেন বলুন?

তাঁর আশ্বাসবাণী শুনে বুক ঠুকে ব'লেই ফেললুম, মহারাজ, এই বলছিলুম কি যে, এখানে আসবার কিছুকাল আগে থেকেই আমাদের মন বড় উচাটন হয়েছে, সংসারের কিছুতে আর মন বসছে না। আমরা সন্ন্যাস গ্রহণ করব—আপনি যদি দয়া ক'রে আপনার গুরুকে আমাদের মতন অধমদের শিষ্য করতে রাজী করান তা হ'লে তাঁর কাছে দীক্ষা পেয়ে আমরা ধন্য হই।

আমার কথা শুনে সদানন্দজী কিছুক্ষণ গুম হয়ে ব'সে থেকে বললেন,

বাবুজী, আপনাদের তিনজনের মধ্যে কারুরই সন্ন্যাস গ্রহণ করবার সময় এখনও হয় নি। তারপরে আপনারা বোধ হয় জানেন না যে, আমাদের গুরুদেব কাল সকালে দেহত্যাগ ক'রে ইহলোক থেকে চ'লে যাবেন।

—অ্যাঁ!!! দেহত্যাগ করবেন মানে?

কথাটা কানের মধ্যে ঢুকে সেইখানেই ঘুরপাক খেতে লাগল—মগজ অবধি পৌঁছল না।

সদানন্দজী আবার বললেন, হাঁ বাবুজী, আমাদের গুরু কাল সকালে দেহত্যাগ করবেন। কাল ফাল্গুনী পূর্ণিমা—ওই দিনই দেহত্যাগ করবার উপযুক্ত সময় ব'লে বিবেচিত হয়েছে। গুরুদেব এই দেশেই জন্মেছিলেন এবং এইখানেই দেহ রাখবেন ব'লে এসেছেন। কিছুদিন থেকে তাঁর দেহে জরা দেখা দিয়েছে—এবার দেহত্যাগ ক'রে চ'লে যাবেন। কাল বেলা বারোটার মধ্যেই তিনি চ'লে যাবেন।

অপরম্বা কিম্ ভবিষ্যতি! মাথার মধ্যে ঝিম্‌ঝিম্ করতে লাগল। আর একটা কথাও জিজ্ঞাসা করা হ'ল না। কিছুক্ষণ ব'সে থেকে সদানন্দ মহারাজ উঠে চ'লে গেলেন।

আমাদের কারুর মুখে আর বাক্যি নেই। দেখলুম, জনার্দন ও সুকান্ত কিছুক্ষণ ব'সে থেকে থেকে শুয়ে পড়ল। অল্পক্ষণের মধ্যেই তারা ঘুমিয়ে পড়ল ব'লে মনে হ'ল—আমি নিজের জায়গাটিতে ব'সে ব'সে ভাবতে লাগলুম।

ব'সে থাকতে থাকতে আলোটা গেল নিবে। ঘর অন্ধকার হয়ে পড়ায় আমিও শুয়ে পড়লুম, নানারকম চিন্তায় মাথা গরম হয়ে উঠতে লাগল। ওরই মধ্যে এপাশ-ওপাশ করতে করতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলুম জানি না, হঠাৎ কি রকম একটা ভয় পেয়ে ঘুম ছুটে গেল। মনে হ'ল, কে যেন আমার দেহটা স্পর্শ করছে। ঠিক রক্তমাংসের হাতের স্পর্শ নয়—স্পর্শটা ঠাণ্ডা কন্‌কনে। খুব ঠাণ্ডা বাতাস গায়ে লাগলে যে রকম অনুভব হয় অনেকটা সেই রকমের। অথচ হাওয়া যেমন ঝোঁকে ঝোঁকে লাগে এবং শরীরের অনেকখানি জায়গায়

অনুভূত হয় এ যেন সে রকম নয়। শরীরের সব জায়গায় নয়—কখনো একদিকের গালে, কখনো বা একটা হাতের ওপর, কখনো বুকের খানিকটার ওপর শীতল বায়ুর স্পর্শ। ভয়ে আমার শরীরে কাঁটা দিতে লাগল। এর ওপরে কাদের ফিসফিস ক'রে কথা বলার আওয়াজ যেন কানে আসতে লাগল—খুব ক্যান্‌ক্যানে গলায় যতদূর সম্ভব আস্তে বলা হ'লে যে রকম শুনতে হয়, অনেকটা সেই রকমের।

অনেকক্ষণ কান পেতে শুনতে শুনতে মনে হ'ল, বাইরে হাওয়ায় শুকনো পাতা ওড়ার শব্দ হওয়ায় হয়তো আমার ওই রকম মনে হয়েছিল। ঘরের জানলাগুলো বন্ধই ছিল, অনেক সাহস সঞ্চয় ক'রে ঘষ্‌টে ঘষ্‌টে গিয়ে একটা জানলা খুলে দেওয়া গেল। জানলা খুলতেই এক ঝলক চাঁদের আলো বিছানা ও মেঝের খানিকটা ভাসিয়ে দিয়ে ছলকে গিয়ে পড়ল সামনের দেওয়ালে। বাইরে শেষ রাত্রের জ্যোৎস্নায় সমস্ত ঝকঝক করছিল, ওপর-নীচের প্রত্যেকটি জিনিস স্পষ্ট দেখা যেতে লাগল। মাঝে মাঝে হাওয়ার এক-একটা হলকায় এক রাশি শুকনো পাতা খড়খড় ক'রে উড়ে চলেছে—জানলার ধারে ব'সে এই দৃশ্য দেখতে দেখতে একটু সাহস ফিরে এল। হঠাৎ একবার ঘরের মধ্যে মুখ ফেরাতেই অদ্ভুত এক দৃশ্য দেখতে পেলুম। ঘরের মধ্যে যে জ্যোৎস্না এসে পড়েছিল এবার স্পষ্ট দেখলুম যে, ছোট ছোট খুব হালকা ধোঁয়ার পিণ্ডের মতন কতকগুলো ছায়া ভেসে ভেসে সেই জ্যোৎস্নাটুকু পার হয়ে উড়ে যাচ্ছে—একটা দুটো পরে পরে অনেকগুলো ছোট বড় নানা আকারের ছায়া—কোনটা খুব ফিকে, একেবারে চাঁদের আলোর সঙ্গে মিশে আছে, কতকগুলো অপেক্ষাকৃত গাঢ় রঙের, যেন হাওয়ায় ভেসে ভেসে সেই জ্যোৎস্নাটুকু পার হয়ে দেওয়ালে গিয়ে ঠেকে মিলিয়ে যাচ্ছে। ভয়ে আমি সেখান থেকে উঠে জানলা থেকে দূরে গিয়ে ব'সে লক্ষ্য করতে লাগলুম—এবার যেন ঝাঁকে ঝাঁকে সেই ছায়ার দল ঢুকে ঘর ভ'রে যেতে আরম্ভ করল। আমি বেশ বুঝতে পারলুম, মাঝে মাঝে একটা দুটো ছায়ার টুকরো আমার মুখ হাত পায়ের ওপর দিয়ে বুলিয়ে যেতে লাগল আবার সেই শীতল স্পর্শ।

কিছুক্ষণ এই রকম চলবার পর একেবারে সব পরিষ্কার হয়ে গেল। জনার্দন ও সুকান্তকে ডাকব কি না ভাবছি, এমন সময় সুকান্ত ধড়মড় ক'রে উঠে চারিদিকে চাইতে লাগল। চাঁদের আলোতে স্পষ্ট দেখলুম, ভয়ে তার মুখখানা আতকে উঠেছে। কয়েক মুহূর্ত এদিক ওদিক চেয়ে আমায় দেখতে পেয়ে তাড়াতাড়ি এসে পাশে ব'সে হাঁপাতে লাগল।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, কি রে, কি হয়েছে ?

সুকান্ত জিজ্ঞাসা করলে, কি বল্ দিকিন্ এগুলো ?

—কোন্‌গুলো !

—এই যে সব দেখতে পাচ্ছিস না! এই যে—এই যে—এই—এই গায়ের ওপর এসে পড়ছে !

সুকান্তর হালচাল দেখে মনে হ'ল, আমি এতক্ষণ যে দৃশ্য দেখছিলুম সেও তাই দেখছে ; কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে, সে সময় আমি কিছুই দেখতে পেলুম না। সুকান্ত বলতে লাগল, কিছুই দেখতে পাচ্ছিস না ?

আমি বললুম, তুই ঘুম থেকে ওঠবার আগে দেখতে পাচ্ছিলুম বটে, কিন্তু এখন আর দেখতে পাচ্ছি না।

সুকান্ত বলতে লাগল, এই দেখ্, এই একটা—এই উড়ে যাচ্ছে—

কিন্তু আমি কিছুই দেখতে পেলুম না। এই রকম কিছুক্ষণ 'এই—এই—এই যাচ্ছে' করার পর সে একটু চুপ ক'রে থেকে বললে, কিছু শুনতে পাচ্ছিস ? খুব কান পেতে শোন্।

অনেকক্ষণ এক মনে শোনবার চেষ্টা করতে করতে যেন শুনতে পেলুম, কে ফিসফিস ক'রে কি বলছে! এই শব্দকেই কিছু আগে বাতাসে পাতা-ওড়ার শব্দ ব'লে মনে করেছিলুম। কখনও কখনও মনে হতে লাগল, অনেক লোক যেন ফিসফিস ক'রে কথা বলছে। তার পরে শুনতে পেলুম বাজনার আওয়াজ —অপূর্ব সে সঙ্গীত! শুনতে শুনতে মনে হতে লাগল, এ সঙ্গীত এর আগেও যেন আরও কোথাও শুনেছি। স্মৃতিসাগর মন্থন করতে করতে মনে প'ড়ে

গেল, ছেলেবেলায় জলে ডুবতে ডুবতে জ্ঞান হারাবার ঠিক পূর্ব-মুহূর্তে এই ধরনের সঙ্গীত শুনেছিলাম। মনে হ'ল, কারা যেন অনেক দূরে নানা রকমের বাজনা বাজাচ্ছে। শুনতে শুনতে মনে হ'ল, তার মধ্যে মানুষের কণ্ঠস্বরও মিলিয়ে রয়েছে। সে কণ্ঠ নারী কি পুরুষের, তা ঠিক ঠাহর করতে না পারলেও অশ্রুতপূর্ব সেই স্বর ক্রমে স্পষ্ট হতে স্পষ্টতর হতে লাগল। মনে হ'ল, কে যেন গাইছে—ফাগুনকো দিন যায়—যায় রে !!

গান শুনতে শুনতে স্তব্ধ গম্ভীরা প্রকৃতিও যেন চঞ্চলা হয়ে উঠতে আরম্ভ করলে। প্রথমে ধীরে ধীরে, তার পরে একটু একটু ক'রে বাড়তে বাড়তে বাতাস একেবারে হা-হা ক'রে এলোমেলো ভাবে ছুটোছুটি করতে আরম্ভ ক'রে দিলে। সেই মনোহর নতুন পুষ্পপত্রে ভরা সুন্দরী বসন্ত একেবারে উদাসিনী হয়ে দাঁড়াল। এমন অনুরাগিণী প্রকৃতির অন্তরে যে এমন বৈরাগিণী লুকিয়ে আছে, তা এর আগে এমন ক'রে উপলব্ধি করি নি। মাথায় জোরে বাতাস লাগতে লাগতে শরীরটা ঝিমঝিম করতে লাগল। বালিসটা জানলার কাছে টেনে নিয়ে আবার শুয়ে পড়লুম—একটু চেষ্টা করতে না করতেই ঘুমিয়ে পড়লুম।

ঘুম ভেঙে দেখি, খোলা জানলা দিয়ে এক রাশ রোদ্দুর ঢুকে ঘর ভেসে যাচ্ছে। বেশ বেলা হয়েছে, জনার্দন ও সুকান্ত তখনও অকাতরে ঘুমুচ্ছে। দূরে কারা যেন সমবেত কণ্ঠে রামনাম করছে—"দশরথনন্দন রাজারাম, পতিতপাবন সীতারাম"—অপূর্ব মধুর লাগতে লাগল তুলসীদাসের সেই সঙ্গীত, যে সঙ্গীত অনেক ঘাটের জল খেয়ে এখন—"ঈশ্বর আল্লা তেরো নামে" পরিণত হয়েছে। কিন্তু যেতে দাও সে কথা—

তাড়াতাড়ি উঠে জনার্দন ও সুকান্তকে টেনে তুলে মুখ-টুখ ধুয়ে ছুটে গেলুম সাধু মহারাজের ওখানে। সেখানে গিয়ে দেখি, লোকে একেবারে ঘর ভরতি।

মহারাজের কপালে মুখে হাতে সব চন্দন মাখানো হয়েছে। তাঁর গলায় ফুলের মালা, পাশে বড়ে মহারাজ ব'সে আছেন, তাঁরও গলায় দেখলুম মালা

ঝুলছে। মহারাজের বিছানায় নতুন চাদর পাতা হয়েছে—তাঁর পেছনে পাহাড়ের মতন উঁচু ক'রে বালিশ সাজানো রয়েছে। নরনারী আসছে, সাধুকে প্রণাম করছে—কেউ বা এক পাশে দাঁড়াচ্ছে, কেউ বা মুহূর্তের জন্ত দাঁড়িয়েই আবার চ'লে যাচ্ছে। সাধু বাবা হাসিমুখে সকলকেই আশীর্বাদ করছেন। আমরাও গিয়ে প্রণাম করতেই তিনি হাত তুলে সকলকে যেমন আশীর্বাদ করছিলেন, আমাদেরও তেমনই আশীর্বাদ করলেন। আর একদিকে চার-পাঁচজন লোক ব'সে রামনাম গান করছেন। বাড়ির মেয়েরাও অনেকে এসেছেন, আরও দু-একজন ক'রে আসছেন। আমরা কোথায় বসব—এদিক-ওদিক করছি, এমন সময় সেই ভিড়ের মধ্যে থেকে সদানন্দজী বেরিয়ে এসে আমাদের নিয়ে গিয়ে একেবারে সাধুর সামনেই বসিয়ে দিলেন।

কাল সাধু বাবাকে সকাল-সন্ধ্যায় দুবার দেখেছি—দুবারই তাঁকে ধীর, স্থির, শান্ত দেখেছি ; কিন্তু আজ দেখে মনে হ'ল, তিনি যেন ছটফট করছেন। মুখে হাসি লেগে আছে বটে, কিন্তু কখনও বালিশে হেলান দিচ্ছেন, কখনও বা সামনে এগিয়ে এসে হাত তুলে লোককে আশীর্বাদ করছেন। মুখে হাসি সত্ত্বেও মনে হচ্ছে, কি যেন বিড়বিড় ক'রে ব'কে চলেছেন।

ক্রমে লোক আসা-যাওয়া ক'মে আসতে লাগল। শেষকালে সাধু মহারাজের শিষ্যেরা, বাড়ির মহিলারা ও আমাদের মত মাত্র জন কয়েক ছাড়া একে একে সকলেই বেরিয়ে চ'লে গেল। যাঁরা এতক্ষণ রামনাম গান করছিলেন, তাঁরা আবার জলদে শুরু করলেন। আর সকলেই চুপচাপ, আমার দৃষ্টি সাধু বাবার ওপরে স্থির নিবদ্ধ। দেখলুম, আস্তে আস্তে তাঁর দীপ্ত চোখ দুটো বন্ধ হয়ে গেল। পা দুটো তখনও আসন-পিঁড়ি ক'রে বসা। একবার সেই পেছনে বালিশের দেওয়ালে হেলান দিয়ে যেন আরাম ক'রে বসলেন। ইতিমধ্যে সেই রামনাম শেষ হয়ে গেল—ঘরের মধ্যে সুরের রেশ গুমরে গুমরে ফিরতে লাগল।

সকলে নিস্তব্ধ, কারুর মুখে কোনও কথা নেই, এমন সময় সেই অস্বস্তিকর

নিস্তব্ধতার মধ্যে বড়ে মহারাজ সেই প্রকাণ্ড একতারাটি তুলে নিয়ে কয়েকবার ঝঙ্কার দিয়ে গান শুরু করলেন।

দেখলুম, বড়ে মহারাজও গাইয়ে লোক। তাঁর কণ্ঠও শিক্ষিত ও সুললিত; কিন্তু বয়সের জন্যেই হোক অথবা আসন্ন গুরুবিচ্ছেদ-বেদনায় হোক, প্রথমটা মনে হয়েছিল যেন তিনি কিছু অভিভূত হয়ে পড়েছেন। মিনিট কয়েকের মধ্যেই কিন্তু তিনি সেই বাধাটুকু কাটিয়ে উঠলেন।

বড়ে মহারাজ শুরু করলেন ভজন—কবীরের সেই বিখ্যাত গুরুবন্দনার অনুকরণে তাঁর নিজের রচিত ভজন—হে গুরু, আমার মোহ নাশ করবার জন্য তুমি জ্ঞান-কাটারি দিয়েছ, জ্ঞানরূপ গৃহের চাবি তুমি আমার হাতে দিয়েছ; হে পিতা, তুমি তোমার এই অধম সন্তানকে অমৃত পান করিয়েছ। অমৃতপানে অনভ্যস্ত এই অধম কতবার অমৃত ভেবে বিষপান ক'রে অসুস্থ হয়েছে, তুমি তাকে বাঁচিয়েছ—হে পিতা, এই অধম সন্তানকে তুমি চরণে স্থান দিও। সংশয়ের ঘোর অন্ধকারে কতবার পথভ্রষ্ট হয়েছি, তুমি আমার হাত ধ'রে চালিত করেছ সত্যপথে। আমার হাতে সত্য ও জ্ঞানের বর্তিকা দিয়েছ—হে গুরু, তুমি আমায় ভুলো না, অসময়ে দেখা দিও। আমার জীবনের উষায় প্রদীপ্ত ভাস্করের মত উদয় হয়ে সারা দিনমান তুমি কিরণ বিকীরণ করেছ—এখন রাত্রির ঘনতমসা আমাকে গ্রাস করতে উদ্যত—হে গুরু, ত্রস্ত এই সন্তানকে তুমি রক্ষা কর—তুমি যেখানেই থাক, তোমার মঙ্গলহস্তের অভয়স্পর্শ যেন পাই।

সেই করুণ মিনতি শুনতে শুনতে অনেকেরই চোখ ভিজে উঠতে লাগল। মেয়েরা অনেকেই চক্ষু মার্জনা করতে লাগলেন—গায়কের কণ্ঠস্বরও আর্দ্র হয়ে উঠল। সাধু মহারাজকে দেখলুম সেইভাবেই হেলান দিয়ে শুয়ে আছেন—চক্ষু মুদিত, ঠোঁট দুটি যেন একটু ফাঁক হয়ে গেছে—নিস্পন্দ, নির্বাক।

বড়ে মহারাজ গেয়ে চললেন, তুমি আমার অন্তরে বাতি জ্বালিয়েছ। ঝড়ে দুর্যোগে এই দীপশিখাটিকে তুমিই রক্ষা করেছ—তুমি দেখো, শেষ পর্যন্ত যেন পারে উত্তরিতে পারি—হে গুরু, তুমি আমাকে চরণে রেখো, তুমি স্মরণে রেখো।

বড়ে মহারাজের গান শেষ হতে না হতে আবার রামনাম শুরু হ'ল, জয় জয় রাম—জয় জয় রাম। সকলেই, এমন কি মেয়েরা পর্যন্ত গলা দিলেন—জয় জয় রাম—জয় জয় রাম—

এই রকম বেশ কিছুক্ষণ চলার পর সাধু মহারাজের এক শিষ্য চীৎকার ক'রে উঠলেন, চ'লে গেছেন—চ'লে গেছেন।

আবার সকলে সেই সুরে শুরু করলেন, জয় জয় গুরু—জয় জয় গুরু—

শিষ্যেরা গুরুর দেহটা বিছানা থেকে তুলে অন্যত্র শুইয়ে রাখলে। ঘরের সমস্ত বিছানা তুলে ফেলা হ'ল। প্রকাণ্ড ঘটির আকারের তামার চাদরে তৈরি ঘড়া ঘড়া গঙ্গাজল প্রাসাদের কোথা থেকে বাহকেরা সব ব'য়ে নিয়ে আসতে আরম্ভ করলে। এই কয় সপ্তাহ ধ'রে নাকি প্রতিদিন হরিদ্বার থেকে গঙ্গাজল এসেছে।

মৃতদেহকে বসিয়ে দুজন শিষ্য পেছন থেকে ধ'রে রইলেন আর দুজনে মিলে এক-একটা ঘড়া তুলে নিয়ে মৃতদেহের মাথায় জল ঢালতে লাগলেন। স্নানপর্ব শেষ হয়ে গেলে মৃতদেহে নতুন কাপড় পরানো হ'ল—চন্দন-তিলকও বাদ পড়ল না। মেয়েরা এবং আরও অনেকে ফুলের মালা পরিয়ে দিতে লাগল মৃতদেহের গলায়। তার পরে শিষ্যরা মৃতদেহ ব'য়ে নিয়ে গেল বাগানের একদিকে। সেখানে গর্ত খুঁড়ে পোড়াবার জায়গা আগে থাকতেই ঠিক ক'রে রাখা হয়েছিল। দেখলুম, দমাদ্দম গাছ কাটা চলেছে—চন্দনকাঠও এল এক রাশি।

চিতা সাজিয়ে গুরুর মৃতদেহ চড়িয়ে দেওয়া হ'ল। বড়ে মহারাজ চিতায় প্রথম অগ্নিসংযোগ করলেন—তার পরে একে একে সব শিষ্যই পরে পরে আগুন দিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে কাঁচা কাঠ ধু-ধু ক'রে জ্ব'লে উঠল—বোধ হয় ঘণ্টা তিনেকের মধ্যেই সব শেষ হয়ে গেল। আবার ঘড়া ঘড়া গঙ্গাজল ঢেলে শিষ্যেরা চিতা নিবিয়ে দিলে।

সাধু মহারাজের শিষ্যেরা ও অন্যান্য সকলে প্রাসাদের দিকে চ'লে গেল। আমরা ইঁদারার ধারে গিয়ে স্নান সেরে সদানন্দ মহারাজের খোঁজ করতে

লাগলুম। কিন্তু কি আশ্চর্য! এতক্ষণ যেখানে লোকারণ্য ছিল, এখন সেখানে একজনকেও দেখতে পেলুম না। আমাদের খাওয়াবার জন্যে যেখানে ঢুবার নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, সেদিকটায় একবার যাওয়া গেল—সকাল থেকে পেটে কিছুই পড়ে নি, যদি খাবার-দাবার কিছু ব্যবস্থা হয়ে থাকে তা হ'লে খাওয়া যাবে, নয়তো সেখানে কোন লোকের দেখা পেলে সাধুরা কোথায় আছেন তার সংবাদ পাওয়া যাবে; কিন্তু সেখানে দেখলুম, সব ভোঁ-ভাঁ—কেউ কোথাও নেই। ফিরে চলেছিলুম, এমন সময় ভাগ্যক্রমে সদানন্দজীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তাঁকে বললুম, আমরা এবার জয়পুরে ফিরে যাচ্ছি; কিন্তু যাবার আগে আপনার সঙ্গে দেখা না ক'রে যেতে পারছিলুম না—যাক, ভাগ্যক্রমে দেখা হয়ে গেল।

সদানন্দজী বললেন, এখুনি কেন যাচ্ছেন? রাত্রে পথে কষ্ট হতে পারে। আজ মধ্যরাত্রে আমরা এখান থেকে বেরুব জয়পুরের দিকে—আপনারা আমাদের সঙ্গে যেতে পারেন। আমরা উটের গাড়ি ক'রে যাব—যদি আমাদের সঙ্গে যান তো অনেক পরিশ্রম বেঁচে যাবে।

সদানন্দজী আরও বললেন যে, আজ তাঁদের গুরুর তিরোভাব হওয়ায় তাঁরা সকলে উপবাসী থাকবেন—সেই জন্যেই সদাব্রত বন্ধ আছে। আপনারা ইচ্ছা করলে বাজারে গিয়ে খাবার খেয়ে আসতে পারেন।

শহরের দিকে গাড়ি যাবে শুনে তো আমরা বেঁচে গেলুম। সদানন্দ মহারাজকে বললুম, আমরা আপনাদের সঙ্গেই যাব। কিন্তু অত রাত্রে আমরা খবর পাব কি ক'রে?

—আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন। সময় হ'লে আমিই আপনাদের ডেকে আনব।

সন্ন্যাসীকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমরা কাল বিকেলে যে ন্যাড়া পাহাড়টার ওপর গিয়ে বসেছিলুম, তারই চূড়োয় গিয়ে বসলুম। সেদিন সকাল থেকেই হু-হু ক'রে বাতাস বইছিল, বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাতাসের বেগও যেন বাড়তে আরম্ভ করলে। পাহাড়ের ওপর সেই এলোমেলো বাতাস লাগতে লাগতে আমার ঘর-ভোলা মন আরও উদাস হয়ে পড়তে লাগল। মনের মধ্যে

সাধু মহারাজের সেই হাসিমাখা মুখ ও চোখ ছুটো বারে বারে ভেসে উঠতে লাগল। মনে হতে লাগল, আড়াই শো বছর আগে এই মানুষটি এই দেশেরই কোন এক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কোন্ পরশমণির ছোঁয়া পেয়ে তাঁর মনে আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠল সেই অজানাকে জানবার? তারপর একদিন এই অজানা সংসার-সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়লেন গৃহের স্নেহবন্ধন পেছনে ফেলে। এই আড়াই শো বছরে ইতিহাসের কত পৃষ্ঠা লেখা হয়ে গেল, কত রাজা কত রাজ্য এল গেল—তার সন্ধান রাখবার অবকাশ ছিল না—যে আশা নিয়ে ঘরছাড়া হয়েছিলেন তাই লাভ করবার জন্যে পর্বতে কন্দরে কত বিষম কৃচ্ছ্রসাধন ও তপস্যায় তাঁর দিন কেটেছে তা কে জানে! অবশেষে সেই পরমপদ লাভ ক'রে আজ স্বেচ্ছায় মৃত্যুকে বরণ ক'রে তিনি চ'লে গেলেন। সকালে যিনি সশরীরে সকলকে আশীর্বাদ করেছেন, এখন তাঁর দেহভস্ম নিয়ে বাতাস খেলা করছে। এ কিছু নতুন ব্যাপার নয়, আবহমানকাল থেকে এই ব্যাপার ভারতভূমিতে হয়ে আসছে। এই আমার জন্মভূমি—আমার মাতৃভূমি। মনে হতে লাগল, আমি কোথাকার লোক, আমার শিক্ষা সংস্কৃতি সবই ভিন্ন; কিন্তু কি ঘটনাচক্রের মধ্যে দিয়ে এইখানে এসে পড়লুম! এ সবই কি অকস্মাতের খেলা! না, এ সব আগে থেকেই অবধারিত ছিল! বিস্ময়—বিস্ময়—বড় বিস্ময় লাগে।

আমরা ঠিক করলুম, সাধু মহারাজার শিষ্যদের মতন তাঁর তিরোধান উপলক্ষ্যে আমরাও সেদিন উপবাস করব। সন্ধ্যা অবধি পাহাড়ে কাটিয়ে ফিরে এলুম ছুদিনের সেই বাসায়, যেখানকার অভিজ্ঞতা সারা জীবন ধ'রে স্মৃতিফলকে জলজ্বল করছে।

সন্ন্যাসীরা জয়পুর শহর অবধি গেল না। তারা আমাদের শহর থেকে কয়েক মাইল দূরে নামিয়ে দিয়ে অন্য এক রাস্তায় চ'লে গেল। বললে, এখনও কয়েক জায়গায় ঘুরে বর্ষার পরে তারা হিমালয়ে ফিরে যাবে।

রাস্তায় নেমে আমরা পথের ধারে প্রকাণ্ড একটা গাছের নীচে গিয়ে

বসলুম। কি জানি কেন, নিজেকে অত্যন্ত অসহায় ব'লে মনে হতে লাগল। রোগমূর্ছিত দেহে প্রথম চেতনা সঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে যে অসহায়তা রোগীর মনকে আচ্ছন্ন করে—অনেকটা সেই রকম। মাত্র কয়েক ঘণ্টার পরিচিত সেই সন্ন্যাসীরা আমাদের এত আপনার হয়ে পড়েছিলেন! মাত্র কয়েক ঘণ্টা! কে জানে কত জন্ম-জন্মান্তরের আত্মীয়তার বন্ধন এই—তাই বুঝি তাদের সঙ্গে এই বিচ্ছেদের সময় আত্মীয়বিচ্ছেদের ব্যথা অনুভব করলুম। দেখতে লাগলুম জনমানবহীন পথ প'ড়ে রয়েছে জন্মান্তরের বিস্মৃতির মতন। একখানা কালো মেঘের আড়াল থেকে অস্তগমনোন্মুখ সূর্য বেরিয়ে আসতেই হঠাৎ তীব্র পিঙ্গল রৌদ্রচ্ছটায় সমস্ত পথ ঝলসে উঠল! মনে হ'ল, এ কোন্ আত্মবিস্মৃতির মধ্য দিয়ে আমার এতটা কাল কেটে গেল! ওই রৌদ্রচ্ছটার মতন তীব্র উজ্জ্বল এ কোন্ চেতনায় আমার অস্তিত্বটা ভাস্বর হয়ে উঠল! মনে হতে লাগল, ওই যে অদ্ভুত জীব অদ্ভুত গাড়িতে অদ্ভুত মানুষগুলিকে ব'য়ে নিয়ে চলেছে দূর থেকে ক্রমশই দূরে, তাদের সঙ্গে সংসারের কোন্ সম্বন্ধে আমি আবদ্ধ! হৃৎকমল ছিন্ন ক'রে নিয়ে ওই যে মানসহংস উড়ে চলেছে এক আকাশ থেকে আর এক আকাশে, তার সঙ্গে মৃণালসূত্রের সম্পর্ক তো এখনও ছিন্ন হয় নি—দীর্ঘ থেকে সেও তো দীর্ঘতর হয়ে চলেছে। ওই যে মানুষটি কাল আড়াই শো বছর পরে ছিন্নবস্ত্রখণ্ডের মত অবলীলায় দেহটাকে ফেলে চ'লে গেলেন, তিনি কি এতদিন আমারও শ্রদ্ধানিবেদনের প্রতীক্ষায় ছিলেন?

পায়ে পায়ে গাড়িখানা একেবারে দৃষ্টির সীমারেখায় গিয়ে পৌঁছল। ওই দেখা যায়—এখনও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে—ওই আর দেখা যায় না।

সূর্য ডুবে গেল, সেই কালো মেঘখানা পশ্চিমের রক্ত আকাশের আলোকে আড়াল ক'রে দাঁড়াতেই দেখতে দেখতে সন্ধ্যার অন্ধকার রাত্রির তারাগুঞ্জনে মুখর হয়ে উঠল।

জয়পুর শহরে যখন প্রবেশ করলুম, তখন বেশ রাত্রি হয়ে গিয়েছে। প্রায় দুদিন পেটে কিছু পড়ে নি—ক্ষুধায় প্রাণ যায় অবস্থায় এক দোকানে ঢুকে কিছু

খেয়ে আমাদের ডেরায় গিয়ে উপস্থিত হওয়া গেল। সেখানে জিনিসপত্র যা কিছু ছিল তা বগলদাবা ক'রে স্টেশনে গেলুম। একখানা ট্রেন সামনেই দাঁড়িয়ে ছিল, একখানা খালি কামরা দেখে তাতে উঠে পড়লুম। টিকিট কাটবার ঝঞ্ঝাট নেই, কোথায় যাবে, কখন যাবে তাও জানবার কোন প্রয়োজন নেই। টিকিট-চেকারের কাছে ধরা পড়বার ভয়ে আত্মগোপন করবার সতর্কতা নেই। উঠেই মাথায় পুঁটুলি গুঁজে লম্বা হয়ে পড়া গেল—যেখানে যায়, যখন যায় কিংবা থাকে, ভাগ্যের হাতে নিজেকে ছেড়ে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমের কোলে আত্মসমর্পণ করলুম।

এই ভাবে রাজস্থানের শহর, জঙ্গল ও মরুভূমিতে পাক খেতে খেতে বর্ষণমুখর এক রাত্রে আহমেদাবাদে গিয়ে পৌঁছনো গেল। স্টেশনে পৌঁছবার অনেক আগেই বৃষ্টি শুরু হয়েছিল। দেখলুম, প্রকাণ্ড ইষ্টিশন, কিন্তু লোকজন বিশেষ কিছু নেই। আমাদের সঙ্গে আরও অল্প কয়েকজন যাত্রী নামল। নামতেই সামনে দেখি, একজন টিকিট-কালেক্টর দাঁড়িয়ে। তাকে দেখে আমরা স'রে পড়বার তাল খুঁজছি, কিন্তু সে অবসর না দিয়ে লোকটা যেন ঝাঁপিয়ে এসে পড়ল—টিকিট!

—আজ্ঞে, টিকিট তো নেই।

—তবে কি আছে, বার কর। তিনজনের তিন টাকা লাগবে।

লোকটার আগ্রহ দেখে বেশ বুঝতে পারা যেতে লাগল যে, সেদিন তার বরাতে বিনা-টিকিটের যাত্রী মোটেই জোটে নি।

তিন টাকা চাইতে স্পষ্টই বলা গেল, হুজুর, তিন টাকা তো দূরের কথা, আমাদের কাছে তিনটে পয়সা নেই।

বেশ, তা হ'লে চল তোমাদের পুলিসের হাতে সমর্পণ করি—ছ মাস খাটলেই আক্কেল হয়ে যাবে।

বাঁচা গেল! অন্তত মাস ছয়েকের জন্যে আহার ও আশ্রয়ের ব্যবস্থা হয়ে গেল মনে ক'রে লোকটার সঙ্গে সঙ্গে চেকারদের ঘরে যাওয়া গেল। সেখানে কাঠের রেলিং দিয়ে ঘেরা একটা ছোট জায়গায় আমাদের ঢুকিয়ে দিয়ে সে একটা

টুলে গিয়ে বসল। সেই ঘেরা জায়গাটায় দেখলুম, আরও দু-তিনজন লোক ব'সে রয়েছে। তাদের দেখে উত্তর-প্রদেশের লোক ব'লে মনে হ'ল। জিজ্ঞাসা করলুম, কি বন্ধু, কতক্ষণ হ'ল এসেছ ?

একজন বললে, বিকেলের ট্রেনে।

আর একজন বললে, সন্ধ্যার ট্রেনে।

অপরাধ একই। বিনা টিকিটের যাত্রী সব। ওদিকে একটা বড় গোল টেবিল ঘিরে ব'সে আরও কয়েকজন চেকার হাসিঠাট্টা গান করতে লাগল। হঠাৎ একজনের দৃষ্টি আমাদের দিকে পড়ায় সে সঙ্গীদের বললে, আজকে জালে তো অনেক মাছ পড়েছে দেখতে পাচ্ছি।

গুজরাটী ভাষা শুনে শুনে তখন কিছু কিছু বুঝতে শিখেছিলুম। সেই লোকটা আবার বললে, এগুলিকে যথাস্থানে জিম্মা ক'রে দিয়ে জায়গা খালি কর না—আবার তো মেল আসছে—

আর এক ব্যক্তি বললে, দূর দূর! পুলিসের হাতে দিলে তারা বেশ ক'রে মেরে হাতের সুখ ক'রে ছেড়ে দেয়। আর তাদেরই বা দোষ কি বল ? তিন দিন খরচ ক'রে খাইয়ে-দাইয়ে আদালতে নিয়ে যাবার পর হাকিম দেয় ছেড়ে—পুলিসের হাতে দেওয়ার চাইতে নিজেরাই হাতের সুখ ক'রে নিই।—ব'লেই একটা চেকার সেই কাঠের রেলিংয়ের দরজা খুলে আমার সামনেই যে হিন্দুস্থানী লোকটি ব'সে ছিল, তার চুল ধ'রে হ্যাঁচড়াতে হ্যাঁচড়াতে বাইরে টেনে নিয়ে গিয়ে তাকে কিল লাথি মারতে লাগল ধড়াধ্বড়।—বাপ রে, সে কি মার! সেই মার দেখে আমাদের দিব্যজ্ঞান হয়ে গেল। আমরা ইতিমধ্যে গুজগুজ ক'রে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগলুম যে, আমাদের মধ্যে একজনকেও যদি ওরা মারে তো আমরা তিনজনে মিলে সে ব্যক্তিকে আক্রমণ করব। চেকারদের টেবিলের ওপরে রুল, তা ছাড়া পাথর ও লোহার অনেকগুলো কাগজ-চাপা এদিক ওদিক ছড়িয়ে ছিল—ঠিক করলুম, ওরই গোটা কয়েক তুলে নিয়ে বাগিয়ে ছুঁড়তে পারলে অন্তত দুটোকে নিশ্চিন্তপুরের কাছাকাছি পাঠাতে

পাওয়া যাবে। রোদে বৃষ্টিতে অনাহারে নিরাশ্রয় অবস্থায় ঘুরে ঘুরে, অনিদ্রায় পথশ্রমে আমাদের চেহারাগুলোও প্রায় খুনের মত হয়ে উঠেছিল। কখনো কোনো আয়নায় নিজেদের প্রতিচ্ছায়া দেখলে শিউরে উঠতুম। মাথার চুলগুলো রুক্ষ, প্রায় জট ধ'রে এসেছে, চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসছে, শরীর মেরে গেছে পাক্‌তেড়ে—দেখে কখনো কখনো নিজেরাই হাসাহাসি করতুম আর বলতুম, আঃ, উন্নতি যা হচ্ছে সে আর ক'য়ে কাজ নেই—

যা হোক, ঠিক সেই সময় কোনো একটা বিশেষ ডাকগাড়ি স্টেশনে এসে পড়ায় চেকাররা সদলবলে স্টেশনের দিকে বেরিয়ে গেল। এদের ঘরেরই আর এক দিকে একটা দরজা দিয়ে স্টেশনের বাইরে যাওয়া যায় দেখে আমরা আর কালবিলম্ব না ক'রে সেই দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে পড়লুম—আমাদের দেখাদেখি অন্য আর যারা ধরা পড়েছিল তারা সবাই বেরিয়ে এল। শুধু যে ব্যক্তি মার খাচ্ছিল সে ব'সে রইল, বোধ হয় আরও কিছু দক্ষিণার প্রতীক্ষায়। এরেই বলে, এক যাত্রায় ভিন্ন ফল।

বাইরে তখন মুষলধারায় বৃষ্টি পড়ছে, অনেক লোক স্টেশনের গাড়ি-বারান্দার নীচে দাঁড়িয়ে। কিন্তু সেখানে দাঁড়াতে আমাদের সাহস হ'ল না। পাছে আবার ধরা পড়ি, সেই ভয়ে বৃষ্টির মধ্যেই রাস্তায় বেরিয়ে পড়া গেল।

ঝম্ ঝম্ ক'রে বৃষ্টি পড়ছে, পথে লোকজন নেই, রাস্তার বাতিগুলো পর্যন্ত বৃষ্টির ঝাপটে ঘোলা হয়ে উঠেছে। এই আলো-আঁধারি অস্বচ্ছতার ভেতরে সেই অপরিচিতা নগরীর সঙ্গে আমাদের প্রথম পরিচয় ঘটল।

প্রায় এক পোয়া পথ চ'লে পথের ধারে একটা সাজানো চক্‌চকে চায়ের দোকান দেখতে পেয়ে সেখানে গিয়ে ঢুকলুম। বেঞ্চিতে ব'সে তিন কাপ চায়ের অর্ডার করা গেল। সামনেই একখানা বড় আয়না টাঙানো ছিল, তাতে আমাদের চেহারা দেখে তো পরম পুলকিত হলুম। একে সেই মূর্তি, তার ওপর বৃষ্টিতে ভিজে যেন সে রূপ একেবারে অপরূপে দাঁড়িয়েছে। চা-ওয়ালারা কিছুক্ষণ আমাদের সেই বৃষ্টি-ভেজা নব কলেবর দেখে নিজেদের মধ্যে কি সব আলোচনা ক'রে

বললে, চা নেই, রাত্রি হয়ে গিয়েছে এখন আর চা পাওয়া যাবে না—উঠে যাও।

দোকানের লোকগুলো যে রকম ভাষা প্রয়োগ ক'রে এবং যে ভাবে দোকান থেকে আমাদের তাড়িয়ে দিলে তাতে অন্য কোনও দিন হ'লে অন্তত আমরা কিছু প্রতিবাদ করতুম ; কিন্তু তখন বিনা টিকিটে রেলে চড়ার অপরাধ সম্বন্ধে মনটা খুবই সজাগ থাকায় আর বৃথা বাক্যব্যয় না ক'রে সেখান থেকে নেমে পড়া গেল। খানিক দূর গিয়ে একটা অপেক্ষাকৃত গরিব দোকানে জিজ্ঞাসা করলুম, চা পাওয়া যাবে ?

দোকানদার বেশ ভদ্রভাবে আমাদের ভেতরে আহ্বান করায় সেখানে ঢোকা গেল। তিন কাপ চায়ের অর্ডার করা মাত্র চা এসে হাজির হ'ল। বেশ ভাল চা, দাম দু পয়সা ক'রে কাপ।

চা খাচ্ছি, দোকানদার জিজ্ঞাসা করলে, তোমাদের উগ্‌রা শির কেন ?

প্রথমটা তার প্রশ্ন বুঝতেই পারলুম না। আবার জিজ্ঞাসা করলে, তোমাদের মাথা খালি কেন ?

হঠাৎ এ প্রশ্নের কি জবাব দেব তা ঠিক ক'রে উঠতে পারলুম না। এমন একটা প্রশ্ন ভবিষ্যতে কোনও দিন ওঠবার সম্ভাবনা আছে এমন চিন্তাও মনের মধ্যে কখনও জাগে নি। ভেবে-চিন্তে বলা গেল যে, আমাদের দেশের লোক মাথায় টুপি ব্যবহার করে না।

জবাব শুনে তারা আবার প্রশ্ন করলে, কোন্ দেশের লোক তোমরা ?

এই প্রশ্নের মধ্যে একটা সুর প্রচ্ছন্ন ছিল, যেটাকে সরল করলে বলতে হয়, সে কোন্ অসভ্য দেশ, যেখানকার লোকে মাথা খালি রাখে !

বললুম, আমরা বাংলা দেশের লোক। বাংলা দেশের লোক শুনে দোকানের খদ্দেররা পর্যন্ত হুমড়ি খেয়ে এগিয়ে এসে আমাদের নিরীক্ষণ করতে লাগল। তারা নিজেদের মধ্যে আমাদের সম্বন্ধে আলোচনাও করলে কিছুকাল। বেশ বোঝা গেল যে, বাংলা দেশের জীবগুলি সম্বন্ধে তাদের বিশেষ কৌতূহল

আছে। আমরা জিজ্ঞাসা করলুম, তোমরা কি ইতিপূর্বে বাংলার লোক দেখ নি?

দোকানদার বললে, না। তবে শুনেছি এখানে জনকয়েক বাংলা দেশের লোক কাপড়ের কলে কাজ করে, কিন্তু তাদের চোখে দেখি নি।

পঞ্চাশ বছর আগে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে জানাশোনা খুবই কম ছিল। বাংলা দেশের শহরের লোকেরা জানত বেহারী মাড়োয়ারী ও ওড়িয়াদের। বেহারীদের বলা হ'ত খোট্টা, মাড়োয়ারীদের মেড়ো ও উড়িষ্যা-বাসীদের উড়ে বলা হ'ত। বিহার, উত্তর-প্রদেশ, পাঞ্জাব ও মাড়োয়ারীদের মধ্যে যে পার্থক্য আছে তা খুব কম লোকেই বুঝতে পারত। তেমনই উড়িষ্যা, অন্ধ্র, মাদ্রাজ, মহীশূরবাসী সকলকেই ওড়িয়া ব'লে মনে করা হ'ত। খুব শিক্ষিত লোক ছাড়া এদের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পারত না।

স্বদেশী আমলের পর থেকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের লোকদের মধ্যে পরস্পরের জানাশোনা বাড়তে থাকে। আজ ভারতের যে সব প্রদেশের লোক বাঙালীর নাম শুনলেই উষ্ণতমুখর হয়ে ওঠেন তাঁদের জ্ঞাতার্থে নিবেদন করছি যে, এই বাঙালীরাই সর্বপ্রথম ভারতের সমস্ত প্রদেশকে একত্রে গাঁথবার চেষ্টা করে—তাদের উপন্যাসে, কাব্যে ও গানে।

যাই হোক, কিছুক্ষণ চায়ের দোকানদারের সঙ্গে আলাপের পর বুঝতে পারা গেল যে, বাংলা দেশের লোকের প্রতি তাদের শ্রদ্ধা আছে বটে, কিন্তু যারা মাছ খায় তারা ইত্যাদি ইত্যাদি—। ওইটুকু সময়ের মধ্যেই বুঝে নিতে দেরি হ'ল না যে, সেখানে ছুৎমার্গ খুবই প্রবল।

এদিকে রাত্রির জন্যে আশ্রয় একটু চাই। নতুন জায়গা, পথে প'ড়ে থাকা চলে না। ওদিকে বৃষ্টি থেমে যাওয়ায় দোকানদার দোকান বন্ধ করবার ব্যবস্থা করছে দেখে আমরা তাকে জিজ্ঞাসা করলুম, এখানে রাত্রে থাকবার মতন কোন জায়গা-টায়গা আছে?

ওঃ, ঢের।—ব'লেই সে দোকানের একটি ছোট ছেলেকে কি বললে। তার পরে আমাদের বললে, আপনারা এর সঙ্গে যান।

ছেলেটি দোকানের কাছেই আমাদের একটা বাড়িতে নিয়ে গেল। সেটা ঠিক হোটেল কিংবা ধর্মশালা না হ'লেও সেখানে ঘর ভাড়া পাওয়া যায়। সেইখানে একটা যাচ্ছেতাই ঘরে কোন রকমে রাতটা কাটিয়ে দেওয়া গেল।

সকালবেলা ঠিক করা গেল যে, সেই দিনই সুকান্তর সেই দাদার সঙ্গে দেখা ক'রে কাজকর্মের একটা ব্যবস্থা ক'রে ফেলব। এদিকে আমাদের ধুতি জামা সব ছিঁড়ে গিয়েছিল, ওদিকে বিস্কুটের টিনও প্রায় খালি। সুকান্তর দাদার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার আগে পরিচ্ছদের একটা ব্যবস্থা হওয়া দরকার মনে ক'রে বাড়িওয়ালাকে তার প্রাপ্য চুকিয়ে দিয়ে পথে বেরিয়ে পড়লুম।

বেশ মনে পড়ে, কয়েকটা দোকান ঘুরে আমরা তিন জোড়া ধুতি ও তিনটে পকেটহীন সেই-দেশীয় জামা খরিদ করলুম। এই আহমেদাবাদ শহরে একটি নতুন রকমের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা গেল, যা ইতিপূর্বে ভারতবর্ষের অন্য কোন শহরে হয় নি। আমরা দোকানে জিনিস কিনতে ঢুকে দোকানদারকে বললুম, ধুতি দেখি।

দোকানদার ধুতি দেখাবে কি, সে অবাক হয়ে হাঁ ক'রে আমাদেরই দেখতে লাগল। যে ভাষার মাধ্যমে এতদিন আমাদের ভাব ও অভাবের আদান-প্রদান চলেছিল, দেখা গেল এখানকার লোক সে ভাষা একদম বুঝতে পারে না। সেখানকার জনসাধারণ হিন্দী ও উর্দু বোঝা তো দূরের কথা, শোনে নি বললেও চলে—বরঞ্চ ইংরেজী বললে তার চেয়ে বেশি বুঝতে পারে। তার ওপর আমাদের চেহারাই তাদের কাছে একটা দ্রষ্টব্য জিনিস হয়ে দাঁড়াল। আমরা দোকানদারকে বলি, কি রকম জামা আছে দেখাও দিকিন। দোকানদার হাঁ ক'রে মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। অনেক বকাবকির পর হয়তো বললে, তোমাদের মাথায় টুপি নেই কেন?

ভ্যালা বিপদেই পড়া গেল! যা হোক, অনেক কষ্টে ধুতি জামা কিনে তো

রাস্তায় বেরিয়ে পড়া গেল। কিন্তু পথ চলব কি! চলতে চলতে দেখি, রাস্তার লোক আমাদের দেখে দাঁড়িয়ে যায়, অবাক হয়ে মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। কেউ বা সাহস ক'রে আমাদের মস্তকের টুপিহীনতার কথা জিজ্ঞাসা করে, কোথাও বা নিজেদের মধ্যে এই অত্যাশ্চর্য কাণ্ডের আলোচনা করে।

দু-চার জন রাস্তার লোককে আমাদের লক্ষ্যস্থানের ঠিকানা জিজ্ঞাসা করলুম, অবিশ্যি সঙ্গে সঙ্গে উগ্‌রা শিরের কারণও বলতে হ'ল। প্রায় ঘণ্টা দুই রাস্তায় ঘুরে ঘুরে গলির গলি তস্য গলির মধ্যে প্রকাণ্ড একটা বাড়িতে এসে পৌছলুম। এখন আহমেদাবাদে কি রকম হয়েছে জানি না, সে সময় দেখেছি অধিকাংশ বাড়ির কাঠামোটা ইট কিংবা পাথর দিয়ে তৈরি হ'লেও প্রচুর পরিমাণে কাঠ ব্যবহার করা হ'ত। অনেক বাড়িতে কাঠের থাম, বাহারের জন্যে কাঠের কার্নিশ এবং নানারকম খোদাই কাঠের ব্যবহার দেখেছি। খুব সম্ভব, কাঠের এই প্রাচুর্যের জন্যে সেখানে কাঠ-বেরালের সংখ্যাও ছিল প্রচুর। এখনকার কথা ঠিক বলতে পারি না, তবে তখনকার দিনে বিহার, উত্তর-প্রদেশ প্রভৃতি দেশে মাছির উপদ্রব যত ছিল, আহমেদাবাদে কাঠ-বেরালের উপদ্রব তার চেয়ে কিছু কম ছিল না।

যা হোক, আমরা তো নানা রাস্তা ঘুরে ঘুরে বেলা প্রায় দশটা নাগাদ সেই বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হলুম। প্রকাণ্ড বাড়ি—একতলাটা খাঁ-খাঁ করছে। কেউ কোথাও নেই। বেরিয়ে এসে আবার পাড়ার লোকদের জিজ্ঞাসা করায় তারা বললে, সিঁড়ি দিয়ে সোজা তেতলায় উঠে যাও। সিঁড়িটা অত্যন্ত পুরনো, বোধ হয়, পঞ্চাশ বছর ধ'রে ধুলো জ'মে তার ওপরে পুরু আস্তরণ প'ড়ে গিয়েছে। পরে শুনেছিলুম, বাড়িটা ভূতের বাড়ি, অনেক দিন ধ'রে খালি প'ড়ে ছিল—ওখানকার কোন এক ধনী শেঠের বাড়ি। সে ব্যক্তি দয়া ক'রে বাঙালী ছাত্রদের থাকতে দিয়েছে—ভাড়া-টাড়া লাগে না।

সিঁড়ি বেয়ে ঘুরতে ঘুরতে তো তেতলায় ওঠা গেল। তেতলায় প্রকাণ্ড একটা হল-ঘর। সেখানে তিন-চারটি বাঙালী যুবক নিজের নিজের বিছানায়

ব'সে আছেন—বিছানাগুলি ঘরের মেঝেতে পাতা। ঘরের মধ্যে আরও দশ-বারোটা বিছানা গোটানো অবস্থায় রয়েছে। তিন-চারটে দড়ি টাঙানো—তাতে গামছা ইত্যাদি ঝুলছে। মেঝেতে আরও টুকিটাকি জিনিস এলোমেলোভাবে ছড়ানো রয়েছে।

ঘরে ঢুকে একজনকে জিজ্ঞাসা করলুম, রমেশবাবু আছেন?

উত্তর পেলুম, রমেশবাবু নেই, তিনি সকালবেলা কাজে বেরিয়েছেন, এগারোটা সাড়ে-এগারোটায় এসে পড়বেন। আপনারা কোথা থেকে আসছেন?

—আমরা কলকাতা থেকে আসছি।

কলকাতার নাম শুনেই তাঁরা চঞ্চল হয়ে উঠলেন। বাংলা দেশ থেকে বহুদূর সেই আহমেদাবাদে ব'সে কলকাতা থেকে আগত কারুকে দেখলে বাঙালীর প্রাণ যে একটু চঞ্চল হবে সে আর বেশি কথা কি!

দেখলুম, তাঁরা আমাদের সম্বন্ধে অনেক কথাই জানেন। আমাদের নিয়ে ইতিমধ্যে তাঁদের মধ্যে আলোচনাদিও হয়ে গেছে। একজন জিজ্ঞাসা করলেন, আপনাদের মধ্যে রমেশদার ভাই কেউ আছেন?

সুকান্ত বললে, আজ্ঞে, আমি তাঁর ভাই।

হলের মধ্যে অনেক খালি জায়গা তখনও প'ড়ে ছিল। একজন উঠে আমাদের সেই দিকটায় নিয়ে গিয়ে বললেন, আপনারা এখানে বিছানা পেতে বিশ্রাম করুন, রমেশদা এখুনি এসে পড়বেন।

সেইখানে ব'সে ব'সে আমরা তাঁদের কাছ থেকে খবর সংগ্রহ করতে লাগলুম। জানা গেল যে, ওখানে বাংলা দেশের নানা জায়গা থেকে প্রায় কুড়িটি ছেলে এসে কাপড়ের কলে কাজ শিখছে। বছর তিনেক লাগে কাজ শিখতে—পরে মিলে চাকরি পাওয়া যায়। ভাল ক'রে কাজ শিখতে পারলে ভবিষ্যতে উন্নতির সম্ভাবনা আছে। ওখানে মাসে চোদ্দ-পনেরো টাকা খরচ লাগে। এখানকার ছেলেদের মধ্যে একদল সেই ভোরে উঠে কাজে বেরিয়ে যায় আর ফিরে আসে দশটা নাগাদ—আবার যেতে হয় একটা নাগাদ আর ছুটি

হয় বেলা পাঁচটায়। আর একদল যায় দশটায় আর ফিরে আসে বেলা পাঁচটায়। যাই হোক, সকলেই বলতে লাগল, ভারি খাটুনি—বাঙালীর ছেলের পক্ষে এত খাটুনি সহ্য করা মুশকিল।

আমরা বললুম, ওই কাজে ঢুকব ব'লেই তো এখানে এসেছি।

আমাদের কথা শুনে সকলেই বেশ একটু গম্ভীর হয়ে পড়লেন। একটু পরে একজন বললেন, খাটুনি সহ্য করতে পার তো ভালই। প্রথমটা খুবই কষ্ট হয়, তারপরে সহ্য হয়ে যায়।

আর একজন একটু পরেই বললেন, এখানে ঢোকা খুবই শক্ত—ঢুকব বললেই ঢোকা যায় না।

এই রকম সব কথাবার্তা চলছে, এমন সময় স্থকান্তর দাদা রমেশবাবু ও আর কয়েকজন সকালের কাজ থেকে ফিরে এলেন। চার ঘণ্টা মিলে খেটে, তার ওপরে প্রায় মাইলখানেক পথ হেঁটে এসে গলদঘর্ম শরীরে তেতলায় উঠে রমেশবাবু আমাদের দেখে তো পরম পুলকিত হয়ে উঠলেন। একটি গেলাস ঠাণ্ডা জল টেনে ও আর একটি গ্লাস জল সামনে রেখে ভদ্রলোক আমাদের—বিশেষ ক'রে স্থকান্তকে গাল পাড়তে আরম্ভ করলেন। ভদ্রলোক গাল দিতে দিতে মাঝে মাঝে উত্তেজিত হয়ে স্থকান্তকে মারতে যান, আর অন্যান্য সকলে ধ'রে ফেলে—এই রকম ক'রে প্রায় বেলা একটা অবধি গালাগালি দিয়ে আর একটি গেলাস জল টেনে তখনকার মতন স্নান করতে নেমে গেলেন। এতক্ষণ যে যুবকটি আমাদের সঙ্গে আলাপ করছিলেন ও বেশ সহানুভূতির সঙ্গে কথা বলছিলেন, তিনি এবং অন্যান্য প্রায় সকলেই আমাদের সম্বন্ধে বেশ চটকদার টিপ্পনি কাটতে আরম্ভ করলেন। ইতিমধ্যে রমেশদা স্নান ক'রে এলেন। স্নানের ফলে মেজাজ ঠাণ্ডা হওয়ার পরিবর্তে দেখা গেল, তাঁর উষ্মা বেড়েই গিয়েছে।

রমেশদা বললেন, তোমরা যে সেখান থেকে এমন ক'রে পালিয়ে এলে—সেখানকার অবস্থা কিছু জান ? সেখানে যে তোমাদের জন্যে মারপিট খুনখারাপি চলেছে তার কিছু খবর রাখ ?

সুকান্ত চুপ ক'রে রইল। বড় ভাইয়ের কথার ওপর কোন কথা বলা সে-যুগে ভদ্ররীতির বহির্ভূত ছিল। আমি কিছুক্ষণ সহ্য ক'রে থেকে বললুম, আমরা চ'লে এসেছি—কারুর কিছু ক্ষতি ক'রে তো আসি নি। যদি ক্ষতি ক'রে থাকি তো নিজেদেরই করেছি—

আমার কথা থামিয়ে দিয়ে একজন বললেন, খুব লম্বা লম্বা কথা ছাড়ছ যে ছোকরা! জান, তোমাদের জন্যে সেখানে কি হচ্ছে ?

—কি হচ্ছে ?

—যা তো শচে, নীচে থেকে কাগজগুলো নিয়ে আয় তো।

বলামাত্র একজন উঠে গিয়ে একতাড়া খবরের কাগজ নিয়ে এল। দেখলুম, সবগুলোই কলকাতার কাগজ, তার মধ্যে বাংলা সংবাদপত্রও আছে।

—এই দেখ।—ব'লে কাগজের তাড়াটা রমেশদা আমাদের দিকে এগিয়ে দিলেন। দেখলুম, অনেকগুলো কাগজের নানা জায়গায় সব লাল পেনসিল দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে। সেই সব স্থান দেখিয়ে রমেশদা বললেন, প'ড়ে দেখ।

কাগজ প'ড়ে বুঝতে পারা গেল যে, আমরা কলকাতা ছাড়বার আগে ছেলে-ধরা ব্যাপার নিয়ে যে হাঙ্গামা সেখানে শুরু হয়েছিল, আমাদের পলায়নের পর সে হাঙ্গামা আরও বেড়ে উঠেছে। এই নিয়ে এক খবরের কাগজ বলছে যে, ছেলে-ধরা-টরা কিছুই নয়—এই সব বালকেরা অতি দুর্বৃত্ত, অতি খলিফা—কলকাতার নামজাদা ছেলে এরা—এদের ধ'রে নিয়ে যায় এমন ছেলে-ধরা এখনও জন্মায় নি। এই তিনটির মধ্যে দুটির স্বভাবই হচ্ছে বাড়ি থেকে পালানো ইত্যাদি ইত্যাদি। অপর দল পুলিস ও গবর্মেণ্টের প্রতি দোষারোপ করছেন। তাঁরা বলছেন—ছেলেধরার কথা তো অনেক দিন থেকেই শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। গুজব মনে ক'রে আমরা এতদিন চুপচাপই ছিলুম, কিন্তু অমুকের মতন অমন সোনারচাঁদ ছেলেও যখন গায়েব হতে আরম্ভ করেছে তখন এ সম্বন্ধে আর নীরব থাকা অন্যায় হবে। এই ব'লে পুলিসের অসতর্কতা ও গবর্মেণ্টের উদাসীনতাকে লক্ষ্য ক'রে তুড়ে খিস্তি করেছে।

টুর্গেনিভের বিখ্যাত সেই চুটকি গল্পের নায়ক মাল টেনে গাড়ি চাপা প'ড়ে খবরের কাগজে নিজের নাম দেখে নিজেকে যেমন বিখ্যাত লোক ব'লে মনে করেছিল—এই খবরের কাগজগুলো প'ড়ে আমাদের মনেরও প্রায় সেই অবস্থা হ'ল। রমেশদা যতই বকতে থাকেন ও তাঁর আশপাশ থেকে যুবকেরা যতই বিনামূল্যে পরামর্শ বিতরণ করতে থাকেন—মনে হতে লাগল, তাঁরা আমাদের চেয়ে ঢের ঢের নিম্নশ্রেণীর জীব। আর যাই হোক না কেন, আমরা হচ্ছি সেই শ্রেণীর লোক যাদের নিয়ে খবরের কাগজে আন্দোলন চলতে থাকে।

বলা বাহুল্য, এক 'স্টেট্‌সম্যান' ছাড়া সে কাগজগুলির একখানিও আজ জীবিত নেই।

আমাদের বকুনি দিতে দিতে রমেশদা ও অন্যান্য অনেকে সেদিন কাজে যেতেই ভুলে গেলেন—রমেশদা তো খেতেই ভুলে গেলেন।

বেলা চারটের পর আমরা নীচে নেমে স্নান ক'রে এলুম। রমেশদা জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের কাছে টাকাকড়ি কিছু আছে?

আমাদের বিস্কুটের টিন প্রায় খালিই হয়ে এসেছিল। বললুম, টাকাকড়ি বিশেষ কিছু নেই।

আগ্রাতে আমরা ধরা প'ড়েও ফাঁকি দিয়ে পলায়ন করেছিলুম ব'লে রমেশদা আবার এক পকড় বক্-বক্ শুরু করলেন। তারপরে প্রায় সন্ধ্যা অবধি এই ভাবে কাটিয়ে আমাকে ও জনার্দনকে বললেন, তোমরা বাড়িতে টাকা চেয়ে চিঠি লিখে পাঠাও। এখান থেকে কলকাতার ভাড়া আঠারো টাকা—এখানে ক'দিন খাওয়া-দাওয়ার খরচ আছে। ত্রিশটি টাকা চেয়ে পাঠাও। আমি সুকান্তর বাড়িতে টাকার জন্যে চিঠি লিখছি।

এত সব সত্ত্বেও আমরা মিনতি ক'রে বললুম যে, আমরা কলে কাজ শিখব ব'লে এসেছি। তা না হ'লে কোথাও কিছু নেই খামকা তাঁদের খপ্পরে এসে পড়বার অন্য কোন কারণই নেই। দয়া ক'রে আমাদেরও মিলের কাজে ঢুকিয়ে দিন, এখানে থাকার খরচা আমরা বাড়ি থেকে আনিয়ে নেব।

আমাদের কথা শুনে রমেশদা তো বটেই, তা ছাড়া উপস্থিত প্রায় সকলেই অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন।—কী, আস্বা তো তোমাদের কম নয়! বাড়ি থেকে পালিয়ে এসে এ কথা বলতে লজ্জা করছে না!

অবিশ্যি ওখানে থাকতে থাকতেই আমরা জানতে পেরেছিলুম যে, সেখানকার অনেকগুলি ছেলেই বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছে।

কিছুক্ষণ বাদে ঘরে বাতি জ্বালার পর আমরা উঠে পড়লুম। বিস্কুটের টিনটি রমেশদা ইতিপূর্বেই হাতিয়ে রেখেছিলেন। আমরা বললুম, বিস্কুটের টিনটা দেখি!

—আবার কেন?

—আজ্ঞে, ওতে এখনও কিছু অর্থ আছে। বাজারে যাই, কিছু খেতে-টেতে হবে তো—উপদেশ আর বকুনি খেয়ে তো পেট ভরবে না।

আমাদের কথা শুনে একজন বললেন, বুক্‌নি-টুক্‌নি তো বেশ শিখেছ ছোকরা!

কি আর বলব! চুপ ক'রে থাকাই সমীচীন বোধ করলুম। রমেশদা বললেন, তোমাদের সঙ্গে বকাবকি ক'রে সারাদিন আমারও খাওয়া হ'ল না। চল, আমরা যে হোটেলে খাই সেখানে তোমাদেরও বন্দোবস্ত ক'রে দিই—দু বেলা গিয়ে সেখানে খেয়ে আসবে।

আহমেদাবাদে সে সময় চায়ের দোকানের মতন যেখানে-সেখানে 'ভিসি' দেখা যেত—'ভিসি' বলে ভাত ও রুটির হোটেলকে। সেখানে অসংখ্য লোক দু বেলা এই সব ভিসিতে খেত। যে সময়ের কথা বলছি, সে সময় কলকাতাতেও যত্রতত্র ভাতের হোটেল দেখতে পাওয়া যেত। তখনকার দিনে এই সব হোটেলে একজন প্রমাণ লোকের পেট ভ'রে খেতে লাগত ছ পয়সা। ছ পয়সায় ভাত, একটা নিরামিষ তরকারি, ডাল ও মাছের ঝোল পাওয়া যেত—তাতে এক টুকরো মাছ থাকত। সাত পয়সা দিলে একটা ভাজা মাছ পাওয়া যেত। কলকাতার এই সব ভাতের হোটেলে সকাল ও সন্ধ্যায় অসংখ্য লোক

খেত বটে, কিন্তু সে সব জায়গা ছিল নোংরার ডিপো। পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে কোন নিয়মেরই ধার সেখানে ধারা হ'ত না। তার ওপরে বাঙালীর খাবারই এমন যে, একদল লোক খেয়ে গেলে সেখানে আর একদল বসা প্রায় অসম্ভব। আহমেদাবাদে সে সময় জীবনযাত্রার খরচ ছিল কলকাতার প্রায় দ্বিগুণ। ভিসিগুলোতে এক বেলা খেতে দশ কি বারো পয়সা লাগত। খাবার দিত খুব মিহি চালের ভাত, পাতলা রুটি, একটা তরকারি—শুকনো ঝুরো মতন, জলের মতন ডাল, ঘি ও চিনি—যে যত পায়। খাদ্য হিসাবে কলকাতার তুলনায় সে কিছুই নয় বটে, কিন্তু সেখানকার পরিচ্ছন্নতা অনুকরণীয়। গুজরাটীরা যে পরিচ্ছন্ন জাতি, তার প্রমাণ এই সব ভিসিতে পাওয়া যায়।

যা হোক, সন্ধ্যাবেলায় আমাদের নিয়ে রমেশদা ভিসিতে উপস্থিত হলেন। তখনও বুভুক্ষুর দল আসতে আরম্ভ করে নি। তকতকে পরিষ্কার ঘরের তিন দিকের দেওয়াল ঘেঁষে কাঠের পিঁড়ে পাতা রয়েছে, দেখেই চক্ষু জুড়িয়ে গেল। সকালবেলা রমেশদাদের উদ্দেশ্যে যাত্রা করবার আগে এক কাপ ক'রে চা পেটে পড়েছিল। সমস্ত দিন আহার নেই—তারপর সেই বেলা বারোটা থেকে সন্ধ্যে অবধি নিরবচ্ছিন্ন গালাগালি খেতে খেতে মন একেবারে ঝিমিয়ে উঠেছিল। কিন্তু চক্রবৎ পরিবর্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ—ভিসিতে গিয়ে আমাদের সর্বসন্তাপ কোথায় উবে গেল। আপনারা হয়তো মনে করছেন, গুজরাটী আহার্য দেখে একেবারে মোহিত হয়ে গেলুম! কিন্তু তা নয়। ভিসিওয়ালা ছিল খুব উঁচুদরের মনস্তত্ত্ববিদ। পার্থিব আহার্যের সঙ্গে সঙ্গে খদ্দেরদের মনের কথাটা সে একেবারে ভুলে যায় নি।

রাস্তা থেকে একটা কাঠের সিঁড়ি বেয়ে তো ভিসিতে ওঠা গেল। পিঁড়ি পাতার কথা আগেই বলেছি। আরও দেখলুম, ঘরের খানিকটা জায়গা ইঁট দিয়ে উঁচু ক'রে সেখানটা মাটি দিয়ে লেপা হয়েছে। এই জায়গাটা হচ্ছে চৌকা অর্থাৎ এইখানেই রান্না হয়। পাশাপাশি তিনটে উনুন জ্বলছে—যতদূর মনে পড়ে কাঠকয়লার উনুন। একজন ব্রাহ্মণ রন্ধনকার্যে ব্যস্ত—ব্রাহ্মণের দীর্ঘ

চেহারা, যেমন লম্বা তেমনই চওড়া। টকটক করছে গায়ের রঙ—দেখলে মনে হয় বাড়ি তার ছান্দোগ্য-উপনিষদে।

ব্রাহ্মণ রন্ধন করছিলেন দাঁড়িয়ে, তাঁরই পায়ের কাছে একটি মেয়ে ব'সে—শাঁখের মতন লাল্চে সাদা তার দেহের বর্ণ, একটি মোটা সাদা থান পরা, তুলি দিয়ে আঁকা মুখখানি, টিকোলো নাকে একটা হীরে অথবা সাদা পোখরাজের নাকছাবি ঝক্ঝক করছে। অঞ্চল দিয়ে যতটা সম্ভব অঙ্গ আবৃত, ডান বাহু ও বাঁ হাতের খানিকটা দেখা যাচ্ছে—সুন্দর গড়ন, যেন অমিয় ছানিয়া সে দেহ তৈরী—ঘাড় হেঁট ক'রে একমনে রুটি বেলে যাচ্ছে। সামনেই তিনটে গন্‌গনে উনুন, তারই লাল আভা প'ড়ে তার মুখখানি ক্লান্ত দেখাচ্ছিল—এমন সুশ্রী মেয়ে খুব কমই দেখেছি। প্রথম দর্শনেই কবির লাইন মনে প'ড়ে গেল। ইচ্ছে হ'ল ব'লে ফেলি—এত শ্রম মরি মরি, কেমনে চলেছ করি, কোমল করুণ ক্লান্ত কায়?

তারপর অনেক দিন অতীত হয়েছে—এই দুর্দ্ধর্ষ দুর্ভাগার বন্ধুর দীর্ঘ জীবনপথে সেই সপ্তদশী আমায় ত্যাগ করে নি। আজ বিশেষ ক'রে তার মুখখানা মনে পড়ছে—সে যেখানেই থাক্, তাকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা পাঠিয়ে দিলুম।

ভিসিতে উঠে একটা পিঁড়িতে গিয়ে বসতেই সেই ব্রাহ্মণ—'আও শেঠ' ব'লে রমেশদাকে অভিবাদন ক'রে বললে, ও-বেলা আসা হয় নি কেন?

রমেশদা বললেন, আমার এক ভাই ও তার দুই বন্ধু বাড়ি থেকে পালিয়ে আমাদের এখানে এসে উঠেছে। সেই হাঙ্গামায় ও-বেলা খেতে পর্যন্ত আসতে পারি নি। এই তিনজনকে চিনে রাখ—এরা এখন দিন কয়েক এখানে দু বেলা খেয়ে যাবে।

রমেশদার কথা শুনে মুহূর্তের জন্যে সেই সুন্দরী একবার মুখ তুলে কমল-নয়ন দিয়ে মাল তিনটিকে দেখে নিলেন—এই একবার ছাড়া দিন দশেকের মধ্যে তাকে আর ঘাড় তুলতে দেখি নি।

আহমেদাবাদে আমাদের অবস্থা হ'ল এক অদ্ভুত রকমের। কলে কাজ

শেখবার যে সব কল্পনা নিয়ে সেখানে গিয়েছিলুম, তা কল্পনাতেই পর্যবসিত হ'ল। গোড়াতেই এক কথায় রমেশদা আমাদের আশার বাতি ধমকের ফুৎকারে নিবিয়ে দিয়েছিলেন। তার ওপর রমেশদার নির্দেশমত কি না জানি না, দ্বিতীয় দিন থেকে সেখানকার সকলেই আমাদের সঙ্গে বাক্যালাপই বন্ধ ক'রে দিলেন। নেহাত কোনও কথা গায়ে-প'ড়ে জিজ্ঞাসা করলে কেউ কেউ উত্তরমাত্র দিতেন, কেউবা তাও দিতেন না—কেবল রমেশদা প্রতিদিন একবার ক'রে জিজ্ঞাসা করতেন, বাড়ি থেকে কোন খবর এল ?

বলতুম, এখনও কোনও জবাব আসে নি।

বলা বাহুল্য যে, বাড়িতে কোনও চিঠিপত্রই লেখা হয় নি—কিন্তু এ রকমও যে বেশি দিন চলতে পারে না তাও বেশ বুঝতে পারছিলুম। ঘটনার স্রোতে গা ভাসিয়ে দেওয়া ছাড়া অন্য উপায় আর ছিল না। মনে মনে আশা করতে লাগলুম, আমাদের অনুকূলে নিশ্চয় একটা কিছু ঘটবে।

সকালবেলা সকলে কাজে বেরিয়ে যাবার পর আমরাও স্নান ক'রে রাস্তায় বেরিয়ে পড়তুম। চা পান বা বিড়ি ফোঁকা বন্ধ, কারণ ট্যাঁকে একটা পয়সাও নেই। তখন আবার বর্ষাকাল—আহমেদাবাদে বর্ষা নেমেছে। জলে কাদায় পথে পথে ঘুরে বেড়িয়ে বেলা দশটা নাগাদ খেয়ে-দেয়ে আবার ঘুরতে বেরুই। বিকেল অবধি ঘুরে ঘুরে একটু দিন থাকতে থাকতেই ভিসিতে গিয়ে ঠাকুরের সঙ্গে গল্প জমাবার চেষ্টা করি—উদ্দেশ্য সেই সুন্দরীর রূপসুধা পান করা। তার-পরে সেখানে অন্যান্য খদ্দের আসতে আরম্ভ করলেই খেয়ে-দেয়ে চ'লে আসি।

একদিন রাত্রিবেলা আশ্রয়ে ফিরে শুনলুম যে, সুকান্তর বাড়ি থেকে টাকা এসে গিয়েছে। আমরা বাড়িতে চিঠি লিখেছি কি না, সে বিষয়ে রমেশদা সন্দেহ প্রকাশ করতে লাগলেন। শেষকালে তিনি আমাদের কাছ থেকে বাড়ির ঠিকানা চেয়ে নিলেন। গত্যন্তর না দেখে সত্যি ঠিকানাই দিয়ে দিলুম।

পরের দিন সেখানকার ভিক্টোরিয়া পার্কে একটা বেঞ্চির ওপর ব'সে আমরা পরামর্শ করছি, এমন সময় দেখতে পেলুম দুটি গুজরাটী ভদ্রলোক পথ চলতে

চলতে আমাদের দেখে দাঁড়িয়ে গেল। আহমেদাবাদে এসে অবধি এ রকম দৃশ্য দেখতে দেখতে আমরা অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলুম। আশা করতে লাগলুম, এখুনি এগিয়ে এসে তারা প্রশ্ন করবে—কোথায় বাড়ি তোমাদের? তোমাদের মাথায় টুপি নেই কেন?

নিজেদের মধ্যে এই সব কথা বলাবলি করতে না করতে দেখলুম, তারা আমাদের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। আমাদের কাছাকাছি এসে তাদের মধ্যে একজন পরিষ্কার বাংলা ভাষায় বললে, মশায়দের আমারই সমগোত্রীয় ব'লে বোধ হচ্ছে! কতদিন হ'ল ভেগেছেন?

সুকান্ত ব'লে উঠল, আসতে আজ্ঞা হোক। বুলি শুনে মনে হচ্ছে যেন একই গাছের বাসিন্দা আমরা। আমরা ছ-সাত মাস হ'ল হাওয়া হয়েছি। আপনি?

—আমার প্রায় ছ-সাত বছর হবে।

—তা হ'লে তো আপনি আমাদের দাদা—বসতে আজ্ঞা হোক।

লোকটি তার সঙ্গীকে বললে, শেঠজী, আপনি দোকানে যান। এরা আমার দেশের লোক, এদের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথাবার্তা ব'লে আমি আপনার ওখানে যাচ্ছি।

লোকটির কথা শুনে তার সঙ্গী আমাদের নমস্কার ক'রে তাকে বললে, তা হ'লে আসবার সময় আপনার এই বন্ধুদেরও নিয়ে আসবেন, আমাদের ওখানেই চা খাবেন।

সঙ্গী চ'লে যেতে লোকটি আমাদের কাছে এসে বসলেন। মাথা থেকে টুপি খুলে ফেলে বললেন, ভাই, যস্মিন দেশে যদাচার। মাথায় টুপি না থাকার কৈফিয়ৎ দিতে দিতে মাথা বিগড়ে যাওয়ার পর এই টুপি ধরেছি।

ভদ্রলোকের বয়স পঁচিশ থেকে ত্রিশের মধ্যে। একহারা চেহারা। সুকান্ত ঠিকই ধরেছিল, কথায় সামান্য পূর্ববঙ্গীয় টান আছে, দিব্যি মজলিসী ও দিলখোলা লোক ব'লে মনে হ'ল।

ভদ্রলোক বলতে লাগলেন, লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে ঘরের খেয়ে বনের মোষ

তাড়িয়ে বেড়াচ্ছিলুম, দু-এক জায়গায় চাকরির চেষ্টা যে করি নি তা নয়, কিন্তু কোথাও কিছু হয়ে উঠল না। ছ-সাত বছর আগে একদিন কি রকম মনে হ'ল, বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়তে না পারলে আর কিছুই হবে ব'লে মনে হচ্ছে না। যাহা মনে হওয়া অমনি বেরিয়ে পড়া—নানা অবস্থার মধ্যে দিয়ে নানা জায়গায় ঘুরতে ঘুরতে শেষকালে এক জংলী রাজার ওখানে চাকরি পেয়ে গেলুম। রাজার অন্যান্য কর্মচারীরা আমাকে প্রাইভেট সেক্রেটারি বলত, কিন্তু আসলে করতে হ'ত রাজার মোসাহেবি।

রাজা মশায় ঘুম থেকে উঠতেন দুপুর বারোটায়। তখন থেকে বেলা প্রায় তিনটে অবধি তাঁর সঙ্গে থাকতে হ'ত। ওই সময় তিনি স্নানাহার করতে চ'লে যেতেন, আমার ছুটি হ'ত। তারপর রাত্রি এগারোটার পর তিনি আবার দেখা দিতেন। রাজার তিন স্ত্রী থাকেন হারেমে, আর তিনটি রক্ষিতা রাত্রিবেলা প্রাসাদে আসতেন—আসতেন মানে, প্রতিদিন একটি একটি ক'রে তাদের নিয়ে আসা ও রাত্রি তিন-চারটের সময় একটি একটি ক'রে তাদের বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া—এই ছিল আমার খাশ ডিউটি।

রাজা বলতেন, প্রাইভেট সেক্রেটারিকেই এই সব প্রাইভেট কাজ করতে হয়।

রাত্রিবেলা রাজার সঙ্গে সমানে মদ খেতে হ'ত—মদ খেয়ে তাসখেলা ছিল তাঁর শখ। রাত্রি তিনটে অবধি তাস খেলে যেদিন যে রক্ষিতার ওপর প্রসন্ন হতেন তাকে রেখে অন্যদের ছুটি দিতেন।

এই রকম নিত্যি প্রাইভেট কাজ করতে করতে আমি একটির প্রেমে প'ড়ে গেলুম। শুধু আমি প্রেমে পড়লে ক্ষতি ছিল না, দুর্ভাগ্যক্রমে সেও আমার প্রেমে পড়ল। উভয়ে উভয়ের প্রেমে মশগুল—আমাদের আর দিনরাত্রি জ্ঞান নেই, এমন সময় ব্যাপারটা রাজার অন্যান্য কর্মচারীদের কানে উঠল। দু-একজন কর্মচারী আমাকে সাবধান ক'রে দিয়ে বললে, তুমি এখান থেকে পালাও, নইলে রাজা মশায়ের কানে যদি এই কথা ওঠে তবে আর প্রাণ নিয়ে ফিরে যেতে হবে না।

আমি স্থির করলুম, মরতে হয় মরব, তাকে ছেড়ে কোথাও যাব না। ক্রমে প্রাসাদের প্রায় সবাই ব্যাপারটা জেনে গেল। শত্রু মিত্র সকলেই আমাকে পরামর্শ দিতে লাগল, পালাও—পালাও—নইলে মরবে।

আমি প্রতিদিন সকাল ও বিকালে লুকিয়ে যেতুম আমার প্রিয়তমার কাছে। সেদিন বিকেলবেলা সেখানে যাওয়ামাত্র সে বললে, তুমি এখুনি পালাও। আমি জানতে পেরেছি যে, আজ ওরা তোমাকে এইখানেই মেরে ফেলবে।

আমি বললুম, আমি মরতে রাজী আছি, কিন্তু তোমাকে ছেড়ে যাব না।

সে আমায় ধিক্কার দিতে লাগল। বললে, একটা বেশ্যার জন্যে এই অমূল্য মানব-জীবন কেন নষ্ট করবে? পালাও—পালাও, নইলে আমি মরব।

সে এক শিশি বিষ নিয়ে এসে বললে, এই দেখ, আমি ঠিক ক'রে রেখেছি তোমাকে মারলেই আমিও বিষ খেয়ে মরব। আমায় যদি ভালবাস তো আমার কথা শোন, এখুনি পালাও।

সে-ই আমায় টাকাকড়ি দিলে। নিজের সব জিনিস, এমন কি টাকাকড়ি পর্যন্ত সব প্রাসাদে প'ড়ে রইল—আমি সেই এক কাপড়েই বেরিয়ে পড়লুম।

বললুম, দাদা তো একেবারে বিল্বমঙ্গল! "ভেবে দেখ মন, কত তোরে নাচায় নয়ন। ছিলি ব্রাহ্মণকুমার—"

ভদ্রলোক বাধা দিয়ে বললেন, ব্রাহ্মণকুমার নয় ভাই—আমি কায়স্থকুমার। নাম উপেন্দ্রনাথ ঘোষ। সেই থেকে আজ বছর দেড়েক ধ'রে ঘুরেই বেড়াচ্ছি।

এই অবধি ব'লে ভদ্রলোক বললেন, এবার ভাই তোমাদের কথা বল। নিজের কথা বলতে বলতে হাঁপিয়ে উঠেছি।

আমরা আমাদের কাহিনী বললুম এবং বর্তমানে অবিলম্বেই একটা সুরাহা না হ'লে যে পিঞ্জরাবদ্ধ হতে হবে, সেটাও জানিয়ে ফেললুম। ভদ্রলোক বললেন, কুছ পরোয়া নেই—সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি ভাই সঙ্গীর অভাবে বড় কষ্ট পাচ্ছি। সারাজীবন ধ'রে আড্ডাই মেরে এসেছি। বুদ্ধিশুদ্ধি সবই ছিল, কিন্তু আড্ডার জন্যে কিছুই করতে পারি নি। এখন মাঝে মাঝে মনে হয়, এই নিঃসঙ্গ

জীবন অবসান ক'রে দিই। একলা এই বাগানের নির্জন কোন জায়গায় ব'সে কবিতা লিখি, নয়তো ব'সে ব'সে ভাবতে থাকি, আমি কি হ'তে পারতুম আর কি হয়েছি! এবার ভগবান যখন তোমাদের মিলিয়ে দিয়েছেন, তখন আর ছাড়ছি না। আমরা চারজনে মিললে কত কাজ করতে পারি।

দেখলুম, ভদ্রলোক আমাদের চাইতেও আশাবাদী। তাঁর কথা শুনতে শুনতে আবার আশায় বুক ভ'রে উঠতে লাগল। পৃথিবী আবার সোনার রঙে রঙিন হয়ে উঠল। উপেনদাকে বললুম, এক্ষুনি আহমেদাবাদ থেকে আমাদের স'রে পড়তে হবে, অথচ ট্যাঁকে একটি কপর্দকও নেই।

উপেনদা বললে, কুছ পরোয়া নেই—আমার কাছে একশোটা টাকা আছে। তা ছাড়া ওই যে গুজরাটী লোকটি আমার সঙ্গে দেখলে, ও সোনারূপোর গয়না তৈরি করে—ওকে আমি শান-পালিশের কাজ ও সে-কাজের জন্যে শানটা কি দিয়ে তৈরি করতে হয় তা শিখিয়ে দিয়েছি—এখানকার কেউ তা জানে না। এ জন্যে ওর কাছ থেকে একশোটা টাকা পাব। এই দুশো টাকায় আমাদের অন্তত দু মাস তো চলবে, তারপরে দেখা যাবে কি হয়!

বাগান থেকে উঠে আমরা সেই গুজরাটী স্যাকরার ওখানে গেলুম। মাঠ-কোঠার মতন বাড়ির দোতলায় রাস্তার দিকের একখানা ঘরে দোকান। দক্ষিণ দেশে ছোট বড় প্রায় সব বাড়িতেই বসবার ঘরে একটা ক'রে কাঠের দোলনা টাঙানো থাকে। একখানা কাঠের বড়-গোছের পিঁড়ি, যাতে জন দুই লোক বসতে পারে—তারই চার কোণে ছ্যাঁদা ক'রে লোহার শিক বা শিকল দিয়ে ছাতের সিলিংয়ে টাঙানো হয়। এই দোলনা খুব খাতিরের আসন। আমরা উপস্থিত হওয়া মাত্র দোকানদার খাতির ক'রে দুজনকে সেই দোলনায় বসালে। খবর পাওয়া মাত্র দোকানদার ও আরও অন্যান্য বাড়ির মেয়েরা আমাদের অর্থাৎ বাঙালীদের দেখতে আসতে লাগল। দেখলুম, দোকানদার ও তার বাড়ির মেয়েরা উপেনদাকে একেবারে দেবতার মত ভক্তি করে। চায়ের কথা বলা মাত্র তখুনি ডালচিনির আরক দেওয়া চা এসে হাজির হ'ল, বিড়িও

এসে পড়ল এক বাণ্ডিল। বিস্কুটের টিন হাতছাড়া হওয়ার পর থেকে চায়ের আস্বাদ ভুলেই গিয়েছিলুম। কয়েকদিন পরে চা খেয়ে বিড়ি টেনে ধাতস্থ হওয়া গেল। খানিক পরে দোকানদার উপেনদার শেখানো সেই 'শান' বের করলে। সেটাকে কি ক'রে বসিয়ে কেমন ক'রে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে গয়না পালিশ করতে হয়, তা উপেনদা দেখিয়ে দিতে লাগল।

সব দেখাশোনা হয়ে গেল বটে, কিন্তু টাকা সেদিন পাওয়া গেল না, দোকানদার বললে, কাল তিনটের মধ্যে নিশ্চয় টাকা দিয়ে দেবে।

সেখান থেকে বেরিয়ে একটা চায়ের দোকানে ঢুকে চা খেতে খেতে আমরা পরামর্শ করতে লাগলুম, কি করা যায়! ঠিক করা গেল, স্যাকরার কাছ থেকে টাকাটা আদায় হলেই কাল চারটের ট্রেনে আমরা আহমেদাবাদ ত্যাগ ক'রে বরোদা যাব।

সে সময় রমেশচন্দ্র দত্ত মশায় ছিলেন বরোদা রাজ্যের দেওয়ান। স্থির করা গেল যে, সেখানে গিয়ে তাঁকে ধ'রে সে রাজ্যে একটা কাজ জুটিয়ে নেব। সেখানে কিছু না হয়, চ'লে যাব সুরাটে—সেখানে না হয়, বোম্বাই শহরে। আমরা চারজনেই চিরদিন কিছু বেকার ব'সে থাকব না। একজনের একটা কিছু জুটে গেলেই ক্রমে সকলেরই হবে, তারপরে ব্যবসা তো আছেই।

পরামর্শ ঠিক হয়ে যাবার পর উপেনদার কাছ থেকে বিদায় নেওয়া গেল। কথা রইল, কাল বেলা তিনটের মধ্যে আমরা সেই স্যাকরার ওখানে গিয়ে জুটব। উপেনদা আমাদের এই বিপদের সময় যে রকম ঈশ্বরপ্রেরিত হয়ে উপস্থিত হলেন, তাতে মনে হতে লাগল ভগবান বুঝি এতদিন বাদে আমাদের পানে মুখ তুলে চাইলেন।

মহা উৎসাহ বুকে নিয়ে ভিসিতে গিয়ে উপস্থিত হওয়া গেল। আমাদের সুন্দরী সেই ঘাড় হেঁট ক'রে রুটি বেলে চলেছেন। মনে মনে বলতে লাগলুম, তোমায় ছেড়ে চললুম সুন্দরী। তুমি রুটি বেলছ বটে, কিন্তু এখানে আমার রুটির সংস্থান হ'ল না। তার ওপরে তোমার মতন রূপসীর যেখানে আগুনের

সামনে ব'সে দিনরাত রুটি বেলতে হয়—রূপের উপাসকের অবস্থা সেখানে আর কি হবে! তবুও তোমায় নিয়ে চললুম বুকের মধ্যে ক'রে—সারাজীবন তুমি সেইখানেই থাকবে।

প্রাণপণে ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করতে লাগলুম, যদি একবার সে ঘাড় তুলে আমার দিকে চায়! কিন্তু ইচ্ছাশক্তি যদি ঈপ্সিতের ওপর কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারত, তবে অধিকাংশ সুন্দরীর পক্ষেই দুনিয়ায় বাস করা অসম্ভব হ'ত। খাওয়া শেষ হয়ে যাবার পরও অনেকক্ষণ ব'সে থাকলুম, কিন্তু প্রেয়সী মুখ তুললে না দেখে আস্তে আস্তে ভিসি থেকে বেরিয়ে এলুম।

পরের দিন ছেলেরা সকালবেলাকার কাজ সেরে বাড়ি ফেরবার আগেই স্নান সেরে আমাদের ছোট ছোট পুঁটলিগুলি বগলদাবা ক'রে বেরিয়ে পড়লুম। তাড়াতাড়ি আহারপর্ব শেষ ক'রে ভিক্টোরিয়া বাগানে বেলা প্রায় আড়াইটে অবধি কাটিয়ে সেই স্যাকরার ওখানে গিয়ে হাজির হওয়া গেল। গিয়ে দেখি, উপেনদা সেখানে খুব জমিয়েছে। তার চারদিকে স্যাকরার ও তার প্রতিবেশীদের বাড়ির মেয়েরা বসেছে—তাদের মধ্যে ফলাও ক'রে সে গীতার মাহাত্ম্য বোঝাচ্ছে।

আমরা উপস্থিত হতেই সে বললে, ওই দেখ, আমার বন্ধুরা এসে পড়েছে, বেলা চারটেয় আমাদের গাড়ি। এবার আমায় বিদায় কর।

উপেনদার কথা শুনে স্যাকরা উঠে গিয়ে তার প্রকাণ্ড লোহার সিন্দুক খুলে একটা আংটি বার ক'রে এনে তার আঙুলে পরিয়ে দিলে। উপেনদা তখুনি আংটিটা আঙুল থেকে খুলে হাতের তেলোয় ফেলে ওজন দেখে বললে, তা আধ ভরির ওপর হবে হে!

ইতিমধ্যে স্যাকরা আর একটি বাক্স খুলে তিনখানা দশ টাকার নোট নিয়ে উপেনদার সামনে ধরতেই সে তো চ'টে আগুন! সে বলতে লাগল, কি! এই ক'টি টাকার জন্যে কি আমি তোমাদের এই গুপ্তবিদ্যা শিখিয়ে দিলুম!

দুই পক্ষে ধস্তাধস্তি লেগে গেল। উপেনদাও নেবে না, তারাও এর বেশি

দেবে না—শেষকালে স্যাকরা-গিন্নী তার আঁচলের খুট খুলে আর একটা দশ টাকার নোট বের ক'রে বললে, আমরা তোমার ছেলে-মেয়ে, এই নিয়ে ছেলে-মেয়েদের অব্যাহতি দাও।

উপেনদা বললে, তা হ'লে আমার এক পয়সাও চাই না। আমি মনে করব আমার ছেলে-মেয়েদের একটা বিদ্যা শিখিয়ে দিয়েছি।

উপেনদা আমাদের দিকে ফিরে বললে, চল ভায়া, আমাদের ট্রেনের দেরি হয়ে যাচ্ছে। ঘরের এক কোণে তার ছোট বিছানা বাঁধা প'ড়ে ছিল, সেই পুঁটলিটা তুলে বগলদাবা ক'রে উপেনদা তাদের বললে, আচ্ছা, তা হ'লে চললুম, তোমাদের ভাল হোক।

উপেনদার কাণ্ড দেখে স্যাকরা, স্যাকরা-বউ কাঁদতে আরম্ভ ক'রে দিলে। শেষকালে তারা আরও দশটা টাকা বের করতে তবে শান্তি হ'ল।

একখানা টাঙ্গা ভাড়া ক'রে তখুনি ছুটলুম স্টেশনে। উপেনদাকে বললুম,—দাদা, টিকিট কিনে ট্রেনে চড়া তো একদম ভুলেই গিয়েছি।

উপেনদা বললে, ট্যাঁকে যখন পয়সা রয়েছে তখন টিকিট কিনতে আপত্তি হওয়া উচিত নয়। ট্যাঁকে যখন থাকে না, তখন আমিও টিকিট কাটি না। ব্রাদার, এ সবই 'গিভ্ অ্যাণ্ড টেক্'-এর প্রশ্ন।

টিকিট কাটা হ'ল বটে, কিন্তু তবুও বিনা টিকিটের যাত্রী হয়ে এসে এই স্টেশনে যে ধরা পড়েছিলুম, সে কথা ভুলি নি। তাই অতি সন্তর্পণে চেকারদের এড়িয়ে একখানা তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় ঢুকে পড়া গেল।

আহমেদাবাদ থেকে বরোদা খুব বেশি দূর নয়। বরোদায় গিয়ে যখন গাড়ি পৌঁছল, তখন সন্ধ্যে হতে দেরি আছে। স্টেশনে নেমেই দেখি, সামনেই দু-তিনজন প্যাণ্টালুনধারী লোক দাঁড়িয়ে—তাদের মধ্যে একজনের হাতে একখানা মোটা বাঁধানো খাতা। লোকগুলো যেন আমাদের অভ্যর্থনা করবার জন্যেই দাঁড়িয়ে ছিল। আমরা প্ল্যাটফর্মে পদার্পণ করা মাত্র তাদের

মধ্যে একজন বেশ একটু অভ্যর্থনাসূচক হাসি হেসে বললে, আসুন। কোথা থেকে আসা হচ্ছে মশায়দের ?

—আজ্ঞে, আমরা আসছি এই আহমেদাবাদ শহর থেকে।

—কিন্তু আপনাদের দেখে তো গুজরাটের লোক ব'লে মনে হচ্ছে না। দেশ কোথায় বলতে আজ্ঞা হয়।

বললুম, আমাদের দেশ বাংলা দেশে।

লোকটি তার সঙ্গীদের দিকে চেয়ে একটু অর্থসূচক হাসি হেসে বললে, তাই বলুন। এখন আমাদের সঙ্গে আসতে আজ্ঞা হয়।

লোকটির সঙ্গে সঙ্গে প্ল্যাটফর্মের পুলিস-আপিসে যাওয়া গেল। তারা খাতির ক'রে বসবার জন্যে আমাদের টুল দিলে।

তারপরে সেই প্রকাণ্ড খাতায় আমাদের নাম ধাম ইত্যাদি লিখে নিয়ে বললে, দেখুন, এটা গাইকোয়াড়ী জায়গা—এখানে অন্য জায়গা থেকে লোক আসবার নিয়ম নেই। আপনারা কি করতে এখানে এসেছেন ?

উপেনদা খুব বিনীতভাবে বললে, দেখুন, আপনাদের জ্ঞাতার্থে নিবেদন করছি যে, আমরা ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের প্রজা—ভারতবর্ষের সমস্ত দেশে যাবার অধিকার আমাদের আছে। যদি আমরা কোনও অপরাধ করি তো ধ'রে সাজা দেবার অধিকার আপনাদের আছে।

উপেনদার কথা শুনে লোকগুলো চ'টে একেবারে কাঁই হয়ে গেল। একজন বেশ উত্তেজিত হয়ে বললে, আপনারা এখানে কি করতে এসেছেন তা না বললে এ রাজ্য থেকে চ'লে যেতে হবে।

উপেনদা এবার বললে, আপনাদের রাজ্যের দেওয়ান সার্ রমেশচন্দ্র দত্তের সঙ্গে আমরা সাক্ষাৎ করতে চাই।

ঘরের মধ্যে আরও অনেকগুলি লোক ব'সে ছিল—কথাটা শুনে তাদের মধ্যে একটা চাঞ্চল্যের সাড়া প'ড়ে গেল। নিজেদের মধ্যে কিছুক্ষণ গুজগাজ ফুসফাস ক'রে কোথায় যেন টেলিফোন করলে। খানিকক্ষণ পরে আমাদের

বললে, দেখুন, আমাদের দেওয়ান সাহেব তো এখন এখানে নেই। বিশেষ কাজে তিনি ইংলণ্ড গিয়েছেন—ফিরতে দু-তিন মাস দেরি হ'তে পারে।

বলা বাহুল্য, এবারকার সুর অনেক নরম।

—তা হ'লে এখানে থাকবার আর আমাদের কোনও প্রয়োজন নেই। শহরটা একটু দেখে কাল এই ট্রেনেই আমরা আপনাদের এই স্বর্গরাজ্য ছেড়ে চ'লে যাব।

আমরা এত সহজেই চ'লে যাচ্ছি দেখে লোকগুলো খুশি হয়ে উঠল।

জিজ্ঞাসা করলুম, তোমাদের এখানে ধর্মশালা আছে? আজ রাত্রির মতন একটু আশ্রয় পাওয়া যেতে পারে?

দেওয়ানের সঙ্গে যারা দেখা করতে চায় তারা ধর্মশালায় আশ্রয় খুঁজছে দেখে তারা বেশ আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, হোটেলের কথা বলছেন? ভাল ভাল হোটেল আছে এখানে—টাঙ্গাওয়ালাকে বললেই নিয়ে যাবে।

বেরিয়ে আসবার সময় লোকগুলো বললে, কাল যখন চ'লে যাবেন তখন আমাদের এই আপিসে দয়া ক'রে একটু খবর দিয়ে যাবেন।

স্টেশনের সামনেই বিরাট ধর্মশালা। সেখানে জিনিসপত্র রেখে তখুনি শহর দেখতে বেরুনো গেল। পরের দিন যথাসময়ে সুরাট যাত্রা করলুম। বরোদা ত্যাগ করবার সময়ে ইচ্ছা ক'রেই পুলিসে কোনও খবর দিলুম না। যা হোক, রাত্রি দশটা এগারোটার সময় সুরাটে পৌছলুম। স্টেশনের কাছেই একটা হোটেলে তখনকার মত গিয়ে ওঠা গেল। এই সব জায়গায় খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা নেই, অনেকটা আগ্রার হোটেলের মত। মাথা-পিছু বা ঘর-পিছু দৈনিক ভাড়া দেওয়া হয়। আমরা যে ঘরখানায় উঠলুম সেটা বেশ সাজানো ছিল। একটা ছোট-গোছের টেবিল-হারমোনিয়াম রয়েছে দেখে বাজাতে গিয়ে দেখলুম, তার হাপরে বিরাট ছিদ্র—একটু পিঁ-পিঁ ক'রে সুর বেরোয় বটে, কিন্তু হাপরের সেই ছেঁদা দিয়ে 'বাব্বা' 'বাব্বা' শব্দ বেরুতে লাগল তার দশগুণ জোরে। হোটেলের একটি ছোকরা দালাল আমাদের স্টেশন থেকে নিয়ে এসেছিল, কিছুক্ষণ

পরে আসল মালিক এলেন আলাপ করবার জন্যে। আমরা বাঙালী জেনে ভারি খুশি হয়ে বললেন, এখানে আরও একজন বাঙালী আছেন—তিনি আমার বন্ধু। ভদ্রলোক রোজই সকালে আমার এখানে আসেন।

উপেনদা বললে, কাল যখন তিনি আসবেন তখন আমাদের ডেকে দেবেন, আমরাও তাঁর সঙ্গে আলাপ করব।

হোটেলওয়ালা বললে, নিশ্চয় ডাকব।

সে রাত্রে হোটেলেরই চাকরকে দিয়ে খাবার আনানো হ'ল—অতি জঘন্য খাদ্য। কি আর করা যাবে! তাই খেয়ে তখনকার মত শুয়ে পড়া গেল।

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠতে দেরি হয়ে গিয়েছিল। চা পানের ব্যবস্থা করা হচ্ছে, এমন সময় হোটেলের একটি ছোকরা চাকর এসে বললে, শেঠ ডাকছে।

আমি যাচ্ছি।—ব'লে সুকান্ত সেই ছেলেটির সঙ্গে বেরিয়ে গেল। মিনিট কয়েক পরেই দেখি, সুকান্ত একজনকে জড়িয়ে ধ'রে আমাদের ঘরের দিকে আসছে। লোকটি আমাদের চেয়ে বোধ হয় তিন-চার বছরের বড় অর্থাৎ কুড়ি-একুশের বেশি বয়স হবে না। তার মাথায় একটা ছোট পাগড়ির মত বাঁধা, বাঙালীর মত কোঁচা ঝুলছে। তাকে ঘরের মধ্যে এনে সুকান্ত বললে, আমার চেনা লোক।

পরিচয় হ'ল। সুকান্তদের দেশেই তাদের বাড়ি। নাম নিশিকান্ত গুহ। কথায় বার্তায়, চাল ও চলনে খুবই খলিফা ব'লে মনে হতে লাগল। আমাদের দেখাবার ও শোনাবার জন্যে নানারকম চটকদার কথাবার্তা বলতে লাগল। একবার হারমোনিয়ামে ব'সে সেই ছেঁদা হাপর ঠেলেই গান শুরু ক'রে দিলে—দিদি লাল পাখিটি আমায় ধ'রে দে না লো। ওরই মধ্যে কথায় বার্তায় বের হয়ে গেল, মস্ত জমিদার-ঘরের ছেলে সে। বাপ খুড়ো মামা পিসে মেসো কেউ জজ কেউ বা ম্যাজিস্টর। বাংলা দেশের প্রায় সব বড়লোকদেরই সঙ্গে তাদের সম্পর্ক আছে—নিদেন চেনাশোনা তো আছেই।

সত্যিই, তার হালচাল দেখে মনের মধ্যে একটা ছাপ পড়ল। নিশিকান্ত

বললে, বছরখানেক আগে প্রায় হাজার টাকা নিয়ে সে বাড়ি থেকে চম্পট দিয়েছিল, তারপর অনেক ঘাটের জল খেয়ে শেষকালে এই সুরাটে এসে আড্ডা গেড়েছে এবং এইখানেই সে ব্যবসা করবে। কিসের ব্যবসা করবে এই নিয়ে বাড়ির সঙ্গে লেখালেখি চলেছে—মস্ত ফলাও ব্যবসা, সব এক রকম ঠিকঠাকও হয়ে গিয়েছে।

নিশিকান্ত বলতে লাগল, তোমরা এসেছ ভালই হয়েছে—আমরা এতগুলো বাঙালী ছেলে একসঙ্গে জুটলে কি না করতে পারি! আমি যে ব্যবসা করব তাতে অনেক বিশ্বাসী লোকের দরকার, ভগবান তোমাদের জুটিয়ে দিয়েছেন।

ইতিমধ্যে হোটেলওয়ালা এসে জানালে কাল রাত্রে তোমাদের নাম-ঠিকানার জন্যে পুলিসের লোক এসেছিল, কিন্তু অনেক রাত্রি হয়ে যাওয়ায় তোমাদের আর খবর দিই নি। নিশিকান্ত তাকে বললে যে, আমি বাড়ি যাবার মুখে পুলিস-আপিসে গিয়ে এদের কথা ব'লে যাব।

দেখলুম, নিশিকান্ত কাজ চালানো গোছের গুজরাটী ভাষা আয়ত্ত ক'রে ফেলেছে। সে বললে, এখানে আর হোটেলওয়ালাকে পয়সা দিয়ে কি হবে, চল আমার ওখানে। আমার যা ঘর তাতে আরও পাঁচ-সাত জন লোক ধরতে পারে।

তখুনি হোটেলওয়ালাকে তার পাওনা-গণ্ডা চুকিয়ে দিয়ে আমাদের পোঁটলা নিয়ে নিশিকান্তের সঙ্গে বেরিয়ে পড়া গেল। পথে পুলিসের ফাঁড়িতে ঢুকে সে বললে, এরা আমার লোক, এখন এখানেই থাকবে।

নিশিকান্তকে দেখে পুলিসের লোক আমাদের নাম ধাম পর্যন্ত জানতে চাইলে না।

নিশিকান্তের ডেরায় পৌছনো গেল। দিল্লী-দরজার কাছেই এক মাঠকোঠার দোতলায় বড় একখানা ঘর। সিঁড়ি দিয়ে উঠে এই ঘরখানা ছাড়া সেদিকে আর অন্য ঘর নেই। ঘরের মধ্যে আসবাব জিনিসপত্র কিছু নেই বললেই হয়। দড়িতে একখানা ধুতি ঝুলছে, একখানা বড় চেটাই-গোছের জিনিস মাটির

মেঝেতে পাতা, তার ওপরে এখানে ওখানে অগোছালভাবে কয়েকটা জিনিস প'ড়ে আছে। এক কোণে একটা ঝাঁটার মতন জিনিস প'ড়ে আছে বটে; কিন্তু ঘরের অবস্থা দেখে মনে হয় না যে কোনও জন্মে ঝাড়ু লাগানো হয়। ঘরের মধ্যিখানে একটা ছাই-ভর্তি উনুন, তার চার পাশে ভাত ছড়ানো। ঘরের অবস্থা দেখলেই বুঝতে পারা যায়, যে সেখানে থাকে সে অত্যন্ত অপরিষ্কার ও অগোছাল লোক।

একটু ব'সেই আমরা ঝাঁটা নিয়ে মেঝে সাফ ক'রে কাপড়চোপড় ও অন্যান্য জিনিসগুলিকে গুছিয়ে ঘরখানিকে তকতকে ঝকঝকে ক'রে ফেললুম। ঘরেই কাঠকয়লা ছিল, তাই দিয়ে উনুন ধরিয়ে খিচুড়ি চাপিয়ে দেওয়া হ'ল। নিশিকান্তের ঘরেই চাল ডাল পেঁয়াজ ছিল—বাজার থেকে কিছু মসলার গুঁড়ো ও ঘি আনানো হ'ল।

খিচুড়ি খেয়ে দুপুরবেলা পরামর্শ-সভা বসল। নিশিকান্ত বললে, সে সাবান তৈরি করতে জানে। ঘরের কোণ থেকে একটা ঝুড়ি টেনে এনে সে কতকগুলো সাবান দেখিয়ে বললে যে, সেগুলো সে নিজে তৈরি করেছে। দেখলাম, তার মধ্যে দু-তিন রকমের গায়ে মাখবার ও দু-তিন রকমের কাপড় কাচবার সাবান রয়েছে।

নিশিকান্ত বলতে লাগল যে, এখানকার জনকয়েক মহাজন তার পেছনে লেগেছে; কিন্তু সে বাড়ির টাকার জন্যে অপেক্ষা করছে। কারণ মহাজনের হাতে পড়লে ক্রমে তার হাতে কারবার চ'লে যাবার সম্ভাবনা আছে। সে ভরসা করছে, বাড়ি থেকে শীগগিরই কিছু অর্থ এসে পড়বে।

জনার্দন বললে, আমি চেষ্টা করলে বাড়ি থেকে কিছু টাকা যোগাড় করতে পারি। আমি ও সুকান্ত বললুম, আমরা গায়ে খাটব, টাকা-কড়ি কিছু দিতে পারব না। উপেনদা বললে, আমার কাছে ভাই মাত্র একশোটি টাকা আছে।

নিশিকান্ত খুবই উৎসাহিত হয়ে উঠে বললে, আমরা পাঁচজনে আছি, এই পাঁচজনের লোকবল কিছু কম নয়। আপাতত শতখানেক টাকার সাবান তৈরি

ক'রে বিক্রি তো করি, তারপরে কিছু এসে গেলে আবার ভিয়েন চড়ানো যাবে।

মনে পড়ে, উৎসাহের চোটে সেদিন সে কোথা থেকে নোনা ইলিশের ডিম কিনে নিয়ে এল। তিলের তেল দিয়ে ভাজা সেই মাছের ডিম দিয়ে খিচুড়ি খেতে যা লাগল তা আর কি বলব!

চার-পাঁচদিন এমনিভাবে কেটে গেল, কিন্তু নিশিকান্ত সাবান তৈরির কিছুই করে না। বরঞ্চ দেখতে লাগলুম, আমার ও সুকান্তর প্রতি তার ব্যবহারের পরিবর্তন হচ্ছে। ক্রমে তারা তিনজন যেন আলাদা হয়ে পড়তে লাগল।

বিকেলবেলা তারা তিনজনে কোথায় বেরিয়ে যায়—আমি ও সুকান্ত সঙ্গে যেতে চাইলেই বলে, কাজের জায়গায় অত ভিড় করবার দরকার নেই। আমরা দুজনে শহরের অন্যান্য রাস্তায় ঘুরে বেড়াই।

কয়েকদিন বাদে নিশিকান্ত হঠাৎ স্পষ্টই ব'লেই দিলে, এক জায়গায় সকলে ব'সে গুঁতোগুঁতি করলে কারুরই কিছু হবে না, তোমরা অন্যত্র চেষ্টা কর।

সেই অপরিচিত জায়গায় অকস্মাৎ এই রকম বিপদে প'ড়ে সুকান্ত অত্যন্ত ভগ্নহৃদয় হয়ে পড়ল। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি—নিশিকান্তর এই ব্যবহার আমাকে খুব কাবু করতে পারে নি। উপেনদার সঙ্গে আমাদের নতুন আলাপ। তাকে আমরা একরকম পথে কুড়িয়ে পেয়েছিলুম বললেই হয়। অতি দুর্দিনে সে আমাদের সাহায্যও করেছিল এবং ভবিষ্যতের অনেক ভরসাও দিয়েছিল। আজ যদি সে আমাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তাকে কিছু বলবার নেই। নিশিকান্তর সঙ্গেও তাই। কিন্তু জনার্দন!—যার সঙ্গে একসঙ্গে বাড়ি ছেড়ে বেরুলুম, এত দুঃখ কষ্ট একসঙ্গে সহ্য করলুম, সে আজ আমাদের ছেড়ে ওদের দলে গিয়ে মিশল কি ক'রে! এই চিন্তাটাই আমার মনের মধ্যে অত্যন্ত পীড়া দিতে লাগল যে, মানুষ কেমন ক'রে এত সহজে বিচ্ছিন্ন হতে পারে!

আমাদের বিভিন্ন অস্তিত্ব বন্ধুত্বের আশ্রয়ে অবিচ্ছেদ্য হয়ে উঠেছিল। এই ব্যবহার আমাদের সেই যুক্ত-অস্তিত্বের শিকড়ে টান দিলে, মূলোৎপাটনের সেই

বেদনাই আমাকে পীড়া দিতে লাগল। বন্ধু ব'লে যাকে টেনেছিলুম, আজ সুবিধাবাদী ব'লে তাকে ছেড়ে দিতে কষ্ট হচ্ছিল।

জনার্দনের সঙ্গে খোলাখুলি একটা কথাবার্তাও কইতে পারছিলুম না। তাকে উপেনদা ও নিশিকান্ত দিনরাত এমনভাবে আগলে থাকতে লাগল যে, তাকে নিরিবিলি একটু পাওয়া পর্যন্ত অসম্ভব হয়ে উঠল। আমরা বুঝতে পারলুম যে, জনার্দনের বাড়ি থেকে টাকা পাবার আশায় নিশিকান্ত তাকে এত খোশামোদ করছে। আমাদের সঙ্গে পরামর্শ করবার সুযোগ হ'লে পাছে আমরা তাকে বিগড়ে দিই—এই ভয়ে তারা তাকে এমন ক'রে আগলে রাখছে। যাই হোক, তাদের স্বার্থের জন্যে তারা হয়তো এমন করেছিল। কিন্তু জনার্দনের নিজেরও তো একটা মতামত আছে! সে কি ব'লে ওদের দলে গিয়ে ভিড়ল! এই অভিমানটাও সেদিন আমার লেগেছিল বড় ক'রে। কারণ, বিপদের মধ্যে বাস ক'রে আমার মনের মধ্যে একটা সংস্কার হয়ে গিয়েছিল যে, বিপদ একদিন নিশ্চয়ই কেটে যাবে, নয়তো অভ্যেস হয়ে যাবে।

সেইজন্যে জনার্দন নিশিকান্তর সঙ্গে যোগ দেওয়ায় যে বিপদের সম্ভাবনা আসন্ন হয়ে উঠেছে সে ভাবনা তেমন কাতর আমাকে করতে পারে নি, যতখানি করেছিল সুকান্তকে।

এই রকম চলেছে, সেই সময় একদিন বিকেলবেলা উপেনদা, নিশিকান্ত ও জনার্দন কোথায় বেরিয়েছে—আমরাও দুজনে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছি, এমন সময় সুকান্ত বললে, কদিন উপরি-উপরি দু বেলা আধসেদ্ধ খিচুড়ি খেয়ে আমার ভয়ানক আমাশা হয়েছে, ঘুরতে পারছি না—চল্, বাড়ি ফিরে চল্।

ঘরে ফিরে এসে দেখি, ওরা তিনজনেই ফিরেছে। আমরা যেতেই নিশিকান্ত বললে, এই যে, আড্ডা দিয়ে ফেরা হ'ল! লজ্জা করে না এমন ভাবে ব'সে ব'সে খেতে?

সুকান্ত তো কথা না ব'লে শুয়ে পড়ল। আমি বললুম, কি করব বল, কাজকর্ম যতদিন না জোটে—

নিশিকান্ত বললে, কাজকর্ম জোটাবার কি চেষ্টা হচ্ছে শুনি? এখানে তোমাদের কিছু হবে না। আগেই বলেছি, সবাই মিলে এক জায়গায় মাথা ঠোকাঠুকি ক'রে মরলে কিছুই হবে না। আমরা এখানে রইলুম। তোমরা দুজনে অন্য কোন শহরে চ'লে যাও—দেখ, সেখানে কিছু করতে পার কি না!

জিজ্ঞাসা করলুম, কোন্ শহরে যাব?

—এখান থেকে কিছু দূরে নোভাগারি অর্থাৎ নয়া সরাই ব'লে একটা শহর আছে—সেখানে চ'লে যাও। চেষ্টা-চরিত্র ক'রে দেখ। একজনের জুটে গেলে আর একজনেরও জুটতে দেরি হবে না।

নিশিকান্তর কাছে টাইম-টেব্‌ল্ ছিল। সে তাই দেখে তখুনি ব'লে দিলে, ভোর পাঁচটায় একটা গাড়ি আছে, চ'লে যাও—ঘণ্টা দুইয়ের মধ্যেই সেখানে পৌঁছে যাবে।

বললুম, আচ্ছা, তাই যাব।

আমাদের সঙ্গে কথা ব'লে নিশিকান্তরা আবার বেরিয়ে গেল। ওরা বাইরে যাবার পর সুকান্তর অসুখ বাড়তে লাগল। সন্ধ্যের মধ্যেই বোধ হয় আট-দশবার তাকে উঠতে হ'ল। পেটের যন্ত্রণায় সে একেবারে ছটফট করতে আরম্ভ ক'রে দিলে। ঘরে রাঁধবার জন্যে যে তিলের তেল ছিল, তাই একটু নিয়ে জল দিয়ে তার পেটে কিছুক্ষণ মালিশ করতে করতে সে নিঃঝুম হয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ পরে আমিও তার পাশে শুয়ে পড়লুম। শুয়ে শুয়ে কেবলই মনে পড়তে লাগল, সেই ঝড়ের রাতের কথা—যেদিন জনার্দন বিচ্ছুর দংশনে কাতর হয়ে চীৎকার করছিল আর একান্ত অসহায়ের মতন আমরা দুজনে তার শিয়রে ব'সে তাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করছিলুম। ভাবতে ভাবতে আবার নিরাশার অন্ধকারে আশার জ্যোতি ঝিলিক দিতে লাগল। মনে হতে লাগল, সেদিনও যখন কেটেছে, এদিনও তখন কেটে যাবে।

সন্ধ্যা উত্তরে রাত্রি অনেকখানি গড়িয়ে গেল, তখনও নিশিকান্তরা ফিরল না। তার ঘরে ছোট্ট একটা ঘড়ি ছিল সেটাতে দেখলুম, নটা বাজে। দরজা

বন্ধ ক'রে শুয়ে পড়ব কি না ভাবছি, এমন সময় কাঠের সিঁড়িতে খট খট শব্দ শুনে মনে হ'ল তারা আসছে। আর বাক্যব্যয় না ক'রে শুয়ে পড়া গেল। ওরা ঘরের মধ্যে ঢুকে জামা খুলে বসল। নিশ্চয় বাইরে কোন জায়গা থেকে খেয়ে এসেছিল, কারণ রান্নাবান্নার কোনও আয়োজন করলে না বা আমি জেগে আছি দেখেও একবার জিজ্ঞাসা করলে না, খাওয়া হয়েছে কি না!

রাত্রি প্রায় এগারোটার সময় ওরা আলো নিবিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়ল। চারটের সময় উঠতে হবে ব'লে ঘড়িটা কাছেই রেখে দিলুম। সমস্ত রাত্রি এক রকম জেগেই কাটল। চারটের সময় উঠে মুখ-টুখ ধুয়ে সুকান্তকে নিয়ে বেরিয়ে পড়া গেল।

বিদায়ের সময় উপেনদা একটা টাকা দিয়ে বললেন, টাকাটা রাখ হে, সময়ে অসময়ে দরকার হতে পারে।

ভাবলুম, টাকাটা নেব না। কিন্তু Discretion is the best part of valour—মনে ক'রে টাকাটা নেওয়াই গেল।

স্টেশনে যখন গাড়ি থামল, তখন বেলা প্রায় আটটা। ছোট পরিষ্কার স্টেশনটি—লোকজন নেই বললেই হয়। আমাদের সঙ্গেও কেউ নামল না। সুরাট থেকে আনা সাতেক ভাড়া—দুজনের চোদ্দ আনার টিকিট কেনা হয়েছিল, আর মাত্র দু আনা ট্যাঁকে আছে। এই সম্বল ক'রে নোভাসারিতে পদার্পণ করলুম ভাগ্য অন্বেষণ করতে।

স্টেশন থেকে বেরিয়েই একটা সরু পথ চ'লে গিয়েছে শহরের দিকে। আশ্চর্য নির্জন শহর, পথে লোকজন গাড়ি-ঘোড়া কিছুই নেই। মনে হতে লাগল, গল্পের দৈত্যের সেই ঘুম-পাড়ানো শহরে ঢুকে পড়লুম নাকি! রাস্তার দু পাশে ছোট ছোট সুন্দর বাড়ি—ইংলণ্ডের গ্রামের যে সব ছবি দেখতে পাওয়া যায় অনেকটা সেই রকম।

আমরা ঠিক করেছিলুম, বাড়ি বাড়ি ঢুকে কাজের চেষ্টা করব—দেখি কি হয়! সুকান্তকে বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে আমি বাড়ির মধ্যে ঢুকতে লাগলুম।

কিন্তু কোথায় সেই দুর্লভ চাকরি! কোন বাড়িতে ঢোকামাত্র দূর-দূর ক'রে তাড়িয়ে দিতে লাগল। কোথাও বা দুঃখের কাহিনী শুনে বললে, এখানে কিছু হবে না। নোভাসারি জায়গাটা দেখলুম পার্শীপ্রধান জায়গা। পার্শীদের বাড়িতে ঢুকলে তো দেখ্-তাড়া করতে লাগল। বেলা বারোটা নাগাদ প্রায় পঞ্চাশখানা বাড়িতে চেষ্টা ক'রে নিরাশ হয়ে আবার স্টেশনের দিকে ফেরা গেল।

শহরের কোথাও ব'সে একটু বিশ্রাম করবার মতন জায়গা নেই। কলকাতার বাড়ির মতন সেখানে কোনও বাড়িতে একটু রক নেই যে, একটু বসব। এদিকে সুকান্তও অসুস্থ হয়ে পড়তে লাগল। ওরই মধ্যে ঝোপে-ঝাড়ে সে কাজ সারতে লাগল। রাস্তায় লোকজন কম ব'লে সেদিকে একটু সুবিধাই ছিল। ঘুরতে ঘুরতে আমরা স্টেশনের কাছেই একটা ঘাসওয়ালা জমিতে ব'সে পড়লুম।

কাল রাত্রি থেকে আহার নেই, তার ওপর এতখানি ঘোরা হয়েছে—শরীর যেন ভেঙে পড়তে লাগল। সুকান্ত তো ব'সেই শুয়ে পড়েছিল, আমিও খানিকক্ষণ ব'সে ব'সে গা এলিয়ে দিলুম।

বেলা প্রায় আড়াইটে-তিনটের সময় ঘুম ভাঙল। অবসাদে শরীর অত্যন্ত ভারী ব'লে বোধ হতে লাগল। দেখলুম, সুকান্ত আমার আগেই উঠে বসেছে। আমিও উঠে বসলুম। খিদেয় পেটের মধ্যে পাক দিচ্ছিল। বলাবলি করতে লাগলুম, আজ আর নারায়ণ অন্ন জোটাবেন না। যাক, যা হয় ভালর জন্যেই হয়—হয়তো আমাশার ওপর খেয়ে তোর অসুখ আরও বেড়ে যেত।

এই রকম আলোচনা করছি ও মাঝে মাঝে বলছি—নারায়ণ, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। বলতে বলতে নারায়ণ এসে একেবারে সামনে দাঁড়িয়ে ভক্তকে অভিবাদন করলেন—নমস্কার!

পাঠক! চমকিত হবেন না। মানুষের রূপ ধ'রে বুভুক্ষু ভক্তের সামনে এমন ভাবে এর আগে নারায়ণ অনেকবার এসে দাঁড়িয়েছেন—পরমান্ন ব'য়ে এনেছেন গোপবালকের বেশে, দধিভাণ্ডকে অফুরন্ত করেছেন অপমানিতের অপ্রয়োজন করতে, আর শরণাগতের মহিমা প্রচার করেছেন এক কুচি শাকান্ন

দিয়ে সহস্র উগ্রচণ্ড ব্রহ্মর্ষির অগ্নিতোদর পরিপূরণে। তুঁহু জগতারণ জগতে কহায়সি—ত্রাণকর্তার জগতে বুভুক্ষু যখন আছে তখন আসতেই হবে তাঁকে তার কাছে।

—নমস্কার! কে বাবা তুমি?

মুখ তুলে দেখলুম, একটি লোক, রোগা লম্বা একহারা চেহারা, মাথায় গোল টুপি, বয়স ত্রিশের মধ্যেই হবে—সস্মিত মুখে আমাদের দিকে চেয়ে আছে। আমরা প্রতিনমস্কার করতেই সে রাস্তা ছেড়ে একেবারে আমাদের কাছে এসে ব'সে হিন্দী ভাষায় বললে, আপনাদের বাড়ি বোধ হয় কলকাতায়?

বললুম, ঠিক অনুমান করেছেন।

লোকটি বললে, আমি কলকাতায় থাকি কিনা, বাঙালী দেখলে চিনতে পারি।

—কি উপলক্ষ্যে কলকাতায় থাকা হয়?

—সেখানে আমার এক আত্মীয়ের ব্যবসা আছে, সেখানে চাকরি করি।

জিজ্ঞাসা করলুম, এইখানে দেশ বুঝি?

—হ্যাঁ, দু বছর পরে কিছুদিনের জন্যে দেশে এসেছি, আবার শীগগিরই চ'লে যেতে হবে। একটু চুপ ক'রে থেকে লোকটি আবার বললে, এখানে আমার বাপ-মা আছেন তাই আসতে হয়, নইলে কলকাতাই আমার ভাল লাগে। আসলে সেইটেই আমার দেশ, এইখানে আমি বেড়াতে এসেছি।—এই ব'লে নিজের রসিকতায় লোকটি হো-হো ক'রে হেসে উঠল।—কিন্তু আপনারা এখানে কি করতে এসেছেন?

—চাকরি খুঁজতে।

—কলকাতা ছেড়ে এসে এখানে চাকরি! এখানে কি কোনও ব্যবসা আছে যে, চাকরি পাবেন?

বললুম, আমরা লোকের বাড়ির চাকরের কাজ পেলেও করতে পারি। গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য চুরি ডাকাতি ছাড়া আর সব কাজই আমরা করতে রাজী আছি।

—তা কিছু কাজের সন্ধান মিলেছে কি ?

—না, অনেক বাড়ি তো ঘুরলুম, কেউ রাখতে রাজী হয় না।

আমাদের কথা শুনে লোকটির মুখ চিন্তায় গম্ভীর হয়ে উঠল। ভাবলুম, একটা চাকরি-বাকরির আশা বোধ হয় পাব তার কাছ থেকে। কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে থেকে সে বললে, চলুন, ওই দোকানে ব'সে চা খেতে খেতে আপনাদের সঙ্গে গল্প করা যাবে।

জানি না, রাধার কানে শ্যামনাম কি মধুবর্ষণ করেছিল, কিন্তু সেদিন চায়ের নামে আমার কর্ণকুহরে যে অমৃতবর্ষণ হয়েছিল, সে কথা স্মৃতিপথে উদিত হ'লে আজও রোমাঞ্চিত হয়ে উঠি।

রাস্তার ওপারেই একটা ছোট্ট চায়ের দোকান ছিল, তিনজনে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হওয়া গেল। দোকানে তখন খদ্দেরপাতি কিছুই ছিল না। সামান্য দোকান, একটা লম্বা টেবিলের দু পাশে দুখানা অত্যন্ত সরু বেঞ্চি পাতা। আমরা বসতেই সঙ্গের লোকটি দোকানদারকে বললে, তিন কাপ গরম চা দাও তো। ব'লেই বললে, আচ্ছা দাঁড়াও, কিছু খাবার-দাবার আছে ?

—খাবার ? নিশ্চয়ই। আমার কাছে ভাল খাবার আছে।

বোম্বাই অঞ্চলে ব্যাসন দিয়ে ভাজা বেগুনি-ফুলুরি খাবারের খুব প্রচলন আছে। সম্ভব অসম্ভব যত রকমের পাতা ফুল তরকারি আছে তাই কুটে ব্যাসন লেপটে ভেজে দোকানীরা বিক্রি করে। ওখানকার লোকেরা সকালে বিকালে রাশি রাশি সেই সব পত্র-পুষ্প ইত্যাদি ভর্জিত দ্রব্য ভক্ষণ ক'রে থাকে। আমি সে সব ভাজাভুজি ইতিপূর্বে খেয়ে দেখেছি, কিন্তু চিনেবাদাম বা সমজাতীয় অন্য তেলে ভাজা সেই সুখাদ্য আমার মোটেই ভাল লাগে নি। আমি জোর ক'রে বলতে পারি যে, আমাদের এখানকার সরষের তেলে ভাজা বেগুনি-ফুলুরি তার চেয়ে খেতে ঢের ভাল।

দোকানদারকে খাবার আছে কি না জিজ্ঞাসা করায় সে একটা বড় থালার দিকে চেয়ে বললে, ওই যে রয়েছে। কত চাই ?

থালার দিকে চেয়ে দেখলুম। সকালবেলাকার ভাজা সেই রাবিশ কতক-গুলো থালার এক কোণে প'ড়ে রয়েছে। সেগুলোর চেহারা দেখলেই মনে হয়, খদ্দেরে নেহাত নেয় নি ব'লেই প'ড়ে রয়েছে। সকালবেলা থেকে তার ওপরে পরতে পরতে ধুলো প'ড়ে সে দ্রব্যগুলি তখন একেবারে অখাদ্যে পরিণত হয়েছে। যে আমাদের দোকানে নিয়ে এসেছিল, সে ওই খাবারের দিকে চেয়ে শিউরে উঠে দোকানদারকে বললে, আরে, বাবুরা কলকাতার লোক, ওঁরা কি ওই খাবার খেতে পারবেন! তারপর আমাদের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলে, কি বলেন, দেবে ওই ভাজি?

আমাদের অবস্থা তখন শোচনীয়। খিদের চোটে হাত-পা কাঁপতে আরম্ভ করেছে। সেই ভাজাভুজির থালার প্রতি একবার দৃষ্টিপাত ক'রে অত্যন্ত অবহেলাভরে বলা গেল, দাও, বিদেশে নিয়মো নাস্তি।

দোকানদার তাড়াতাড়ি একটা পিরিচ ধুয়ে নিয়ে থালা থেকে সেই মাল তেলসমেত সাপটে তুলে নিয়ে পিরিচে সাজিয়ে আমাদের সামনে রাখলে।

আমরা টপ টপ ক'রে সেই ভাজি গোটা কয়েক মুখে দিয়ে তাকে বললুম, আপনি খান।

লোকটি বললে, না না, আমি খেয়ে এসেছি, আপনারা খান।

একটু পরেই আমাদের লোকটি দোকানদারকে জিজ্ঞাসা করলে, কিছু মিষ্টি-টিষ্টি নেই?

দোকানদার ঘাড় নেড়ে বললে, খুব ভাল মিষ্টি আছে, দেব?

—কি মিষ্টি আছে?

দোকানদার আমাদের মাথার ওপরের দিকে হাত দেখিয়ে বললে, ওই যে।

মাথার ওপর চেয়ে দেখি, একটা প্রকাণ্ড গোল তিলে-খাজার মধ্যিখানে ছেঁদা ক'রে সেটাকে টাঙিয়ে রাখা হয়েছে। তার ওপরে মৌমাছি, বোলতা, নীল কালো বেগুনী ইত্যাদি নানা রঙের মাছি ব'সে আছে, দু-চারটে মশাও দেখলুম উড়ছে সেটাকে ঘিরে।

আমাদের কর্নওয়ালিস স্ট্রীটে মুড়ি, মুড়কি, চিঁড়ে, বেগুনি-ফুলুরির মেলা দোকান ছিল। এই সব দোকানের অধিকাংশেরই মালিক ছিল উড়িষ্যাদেশ-বাসী। উড়ের দোকান বললেই এই সব দোকান বোঝাত। এদের জ্বালাতন করা আমাদের ছেলেবেলায় খেলা ছিল। এই সব দোকানে ওই রকম গোল তিলে-খাজা ঝুলতে দেখেছি বটে, কিন্তু ওই খাদ্যটির প্রতি কখনও কোনও আকর্ষণ বোধ করি নি এবং আস্বাদনও কখনও করি নি। আমাদের নারায়ণ জিজ্ঞাসা করলে, খাবে ওই জিনিস ?

বললুম, মন্দ কি ?

দোকানদার তখন অগ্রসর হয়ে সেই তিলে-খাজার প্রায় অর্ধেকটা ভেঙে আমাদের দিলে। ফলে রাজ্যের মাছি-মৌমাছি-বোলতা প্রথমটা গোঁ-গোঁ ক'রে আপত্তি জানিয়ে শেষকালে আমাদের তাড়া করলে। তাড়াতাড়ি সেখান থেকে উঠে বাইরে পালিয়ে এলুম।

দোকানদার বলতে লাগল, ওরা কিছু বলবে না, কিছু বলবে না, সব পোষা—

যা হোক, সেগুলোকে তাড়িয়ে দেবার পর আমরা আবার খাবারের সামনে গিয়ে বসলুম। কিন্তু সেই তিলে-খাজা বহু দিন ধ'রে মশা-মাছির তিল তিল পীড়নে এমন নেতিয়ে পড়েছিল যে, মুখের মধ্যে গিয়ে তারা দাঁতে লেপটে যেতে লাগল। তার ওপরে দীর্ঘকালব্যাপী শোষণের ফলে বস্তুটি একেবারেই মাধুর্যহীন হয়ে পড়েছিল। কিন্তু পাকস্থলীর প্রচণ্ড তাগাদায় আহার্যের ভালমন্দের দিকে মনোযোগ দেবার অবস্থা আমাদের ছিল না। কোন রকমে পাকলে পাকলে সেই তিলে-খাজা ও তেলে-ভাজা উদরস্থ ক'রে তার ওপরে কাপ দুই ক'রে চা চাপিয়ে আমরা দোকান থেকে বেরিয়ে আবার সেই জায়গায় এসে বসলুম।

আমাদের প্রাণদাতা অত্যন্ত সমীহ ক'রে বলতে লাগল, আপনারা কলকাতার লোক, এই খাবার আপনাদের পক্ষে অযোগ্য। কিন্তু কি উপায়! এইখানে এর চেয়ে ভাল খাবার আর পাওয়া যায় না।

আমরা বললুম, এই খাবারটুকু আমাদের পেটে আজ না গেলে কি যে হ'ত

বলতে পারি না। যতদিন প্রাণধারণ করব ততদিন আপনার কথা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করব।

ভদ্রলোকের নাম ও ঠিকানা চেয়ে নিলুম। কলকাতায় পর্তুগীজ চার্চ লেনে বাড়ি। পরে কলকাতায় এসে দু-তিনবার তার খোঁজ করেছি, দেখা পাই নি। কিন্তু সে কথা যাক।

ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলে, এখন আপনারা কি করবেন? এখানে আপনাদের চাকরি-বাকরির কিছু সুবিধে হবে ব'লে তো মনে হয় না। কারণ এটা অত্যন্ত ছোট জায়গা, তার ওপর আপনাদের এখানে কেউ চেনে না, কোন জামিনও যোগাড় করতে পারবেন না।

আমরা বললুম, কাজ আমাদের যোগাড় করতেই হবে, নইলে অনাহারে মরতে হবে।

লোকটি বললে, তবে আপনারা বোম্বাই চ'লে যান। বোম্বাই বড় শহর, সেখানে কোন রকম কাজ যদি না পাওয়া যায় তবে মুটেগিরি ক'রেও ভরণপোষণ চালানো যেতে পারে।

কথাটা আমাদের মনে লাগল। কিন্তু বোম্বাই যেতে হ'লে অন্তত দু-চার দিনের খরচও সঙ্গে থাকা চাই। কিন্তু আমাদের পকেটে যে কিছুই নেই! লোকটি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আমাদের সঙ্গে আলাপ ক'রে খাইয়ে এক রকম প্রাণ বাঁচিয়েছে—মনে হ'ল, গোটা দুই টাকা তার কাছে চাইলে পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু বলি বলি ক'রেও তার কাছে মুখ ফুটে চাইতে পারলুম না। ওদিকে রোদ প'ড়ে আসতে আরম্ভ করলে। সম্মুখে রাত্রি—কোথাও আশ্রয় পাব কি না তা জানা নেই।

লোকটি বললে, এবার আমি আসি ভাই। চার মাইল দূরে গ্রামে আমার বাড়ি, এই চার মাইল পদব্রজে যেতে হবে। তারপরে হাসতে হাসতে বললে, কলকাতা হ'লে তো ট্রামেই চ'লে যাওয়া যেত। তারপর একটা বিড়ি ধরিয়ে বললে, তারপরে—

আমরা বললুম, আপনার কথামত আমরা বোম্বাই শহরেই চ'লে যাব। কিন্তু যাবার আগে এখানে আরও দিন দুয়েক দেখব।

সেই ভাল কথা।—ব'লে লোকটি উঠল। সঙ্গে সঙ্গে আমরাও উঠলুম। বললুম, চলুন, আপনাকে কিছুদূর অবধি এগিয়ে দিয়ে আসি।

কয়েক পা অগ্রসর হয়ে ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলে, রাত্রে কোথায় থাকবেন? এটা আবার গাইকোয়াড়ী জায়গা, নতুন লোক দেখলে পুলিসে হাঙ্গামা করে। ধ'রে নিয়ে থানায় আটক ক'রে রেখে দেয়।

গাইকোয়াড়ী জায়গার কিছু পরিচয় পেয়েছিলুম বরোদায় নেমে। সে কথা মনে হওয়ায় ভয় পেয়ে গেলুম। বললুম, তাই তো, কোথায় থাকব তা হ'লে?

লোকটি সামনেই একখানা বড় বাড়ি দেখিয়ে দিয়ে বললে, এই বাড়িটা হচ্ছে ধর্মশালা। রাত্রে এইখানেই থেকে যান। এত বড় বাড়ি, এর এক কোণে প'ড়ে থাকলে কেউ জানতেও পারবে না।

এইখানেই—আচ্ছা সাহেবজী—ব'লে সে বিদায় নিলে। আমরা রাস্তায় দাঁড়িয়ে রইলুম, লোকটি হনহন ক'রে এগিয়ে যেতে লাগল। ক্রমে তার মূর্তি পথের বাঁকে মিলিয়ে গেল। সে অদৃশ্য হওয়ার পর আমরা পথের ধারে এক জায়গায় গিয়ে বসলুম। যতক্ষণ সে ছিল, ততক্ষণ কথায় বার্তায় নিজেদের অবস্থার কথা এক রকম ভুলেই ছিলুম। কোথা থেকে এসে কে সে অজানা অচেনা আমাদের সংশয়াকুল হৃদয়-সমুদ্রে একটু আশার তরঙ্গ তুলে দিয়ে চ'লে গেল! সে চ'লে যেতে মনটা বড় খারাপ হয়ে পড়তে লাগল। অজানা দেশ, সামনেই রাত্রি—মনে হতে লাগল, এতক্ষণে জনার্দনেরা সুরাটের রাস্তায় নিশ্চিন্ত মনে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে। আর কিছু না থাকলেও অন্তত রাত্রের আশ্রয়টুকু তাদের আছে। নিরাশায় বুকের মধ্যে কেমন করতে লাগল। আমরা অনেকক্ষণ সেই নির্জন রাস্তায় এক রকম নর্দমার ধারে চুপ ক'রে ব'সে রইলুম—আমাদের চারিদিকে ক্রমে অন্ধকার ঘনিয়ে উঠতে লাগল।

হঠাৎ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ ক'রে সুকান্ত ব'লে উঠল, দেখ্, এই যে লোকটা হঠাৎ কোথা থেকে এসে আমাদের খাইয়ে গেল, এ কে বুঝতে পেরেছিস কি ?

বললুম, না, কে এ ?

—লোকটি হচ্ছে ঈশ্বরপ্রেরিত। এদেরই বলে দেবদূত। মানুষের রূপ ধ'রে এসে আমাদের প্রাণে বাঁচিয়ে দিয়ে চ'লে গেল। এ রকম হয়—এদের কথা 'অলৌকিক রহস্য' ব'লে একটা মাসিকপত্রে আমি পড়েছি। কিছুক্ষণ ব'সে থেকে সুকান্ত বললে, রাত্রে যে ধর্মশালায় থাকব—তা একটা আলো চাই তো। চল্, বাজার থেকে মোমবাতি কিনে আনিগে।

সেখান থেকে উঠে বাজারে চললুম। সেদিন সকাল থেকে শরীরটা আমার ভাল লাগছিল না। দুপুরবেলাটায় একটু জ্বরও এসেছিল। বাজারের দিকে যেতে যেতে বুঝতে পারলুম, বেশ জ্বর এসেছে। শরীরের গ্লানি ও ক্লান্তিতে পথ চলা দুষ্কর হতে লাগল। তার ওপরে বিকেলে ওই সব যাচ্ছেতাই খাবার খেয়ে আরও খারাপ লাগতে লাগল। বাজারে পৌঁছে সারা বাজার ঘুরে কোথাও মোমবাতি পেলুম না। আমার যতদূর মনে হয়, দোকানদারদের বোঝাতেই পারলুম না, আমাদের কি দ্রব্য চাই! মোমবাতি তো কিনতে পারলুম না, এক পয়সার বিড়ি ও আধ পয়সার একটা দেশলাই কিনে স্টেশন অর্থাৎ ধর্মশালার দিকে চললুম। পথ এক রকম অন্ধকার বললেই হয়, যেটুকু আলো আছে তাতে বড় শহরে পথ-দেখায় অভ্যস্ত এই চোখে অন্ধকারই ঠেকতে লাগল।

শরীরও এত খারাপ বোধ হতে লাগল যে, এক রকম সুকান্তর ওপর ভর দিয়েই চলতে লাগলুম। পেটের মধ্যে থেকে থেকে একটা বেদনার সঙ্গে সঙ্গে গা-বমি-বমি করতে লাগল। শেষকালে পথের ধারে ব'সে বমি করবার চেষ্টা করতে লাগলুম। কিন্তু বমি কি হয়! অনেক চেষ্টা ক'রে এক চামচটাক জল ভেতর থেকে উঠে এল। জোর ক'রে বমি করবার চেষ্টা করায় পেটের যন্ত্রণা অসম্ভব রকম বেড়ে গেল। একটুখানি বিশ্রাম ক'রে নিয়ে আবার চলব ভেবে সেইখানেই ব'সে পড়লুম। সুকান্ত আমার

পাশে ব'সে বিড়ি টানতে টানতে লেকচার দিয়ে যেতে লাগল। সে বললে, তোর নিশ্চয় আমাশা হয়েছে। আমারও আমাশা হবার আগে ওই রকম পেটের ব্যথা শুরু হয়েছিল। কিন্তু বলতে নেই—ওই সব অখাদ্য খেয়ে একদম ভাল হয়ে গিয়েছে। কাল ও আজ সারাদিন ধ'রে পেটে যা কিছু ময়লা ছিল সব সাফ হয়ে গেছে। বিষস্য বিষম্ ঔষধম্—ইত্যাদি, ইত্যাদি—

সে নানা ভাবে নানা ভঙ্গীতে আমাকে উৎসাহ দিতে লাগল, ও-সব কিছু নয়। এক্ষুনি ভাল হয়ে যাবে।

এইভাবে সেখানে কিছুক্ষণ ব'সে থাকবার পর গুটিগুটি ধর্মশালার দিকে অগ্রসর হলুম। যখন বাড়িটার কাছে গিয়ে পৌছলুম, তখন চারিদিক বেশ অন্ধকার হয়ে গেছে। বাড়িটার ভেতরে ঢুকে মনে হ'ল যেন হানাবাড়ি। চতুর্দিকে কেউ কোথাও নেই, অন্ধকার ঘুটঘুট করছে। প্রকাণ্ড বাড়ি—দরজা-জানলা সব খোলা হাঁ-হাঁ করছে। অন্ধকারে দেশলাই জেলে হাতড়াতে হাতড়াতে আমরা সিঁড়ি খুঁজে বার করলুম। দোতলায় উঠে লম্বা টানা বারান্দা। বারান্দার দু দিকে বড় বড় ঘর, ঠিক স্কুলবাড়ির মতন। স্টেশনের কাছে ব'লে সেখানকার একটু আলো ছটকে এসে বাড়িটার কোন কোন জায়গায় পড়েছে। অন্ধকার ও দূরাগত সেই স্বল্প আলোকে জায়গাটা যেন আরও ভয়াবহ হয়ে উঠেছে।

বাড়িটায় যে কতদিন লোক ঢোকে নি, তা বলা যায় না। এমন বেপোট জায়গায় ধর্মশালা করারও মানে বুঝতে পারা গেল না। কোথাকার কোন্ শেঠ যাত্রীদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে তৈরি ক'রে দিয়েছেন—কথায় বলে, পয়সা থাকলে ভূতের বাপেরও শ্রাদ্ধ হয়—এই প্রকাণ্ড ধর্মশালা তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

একটুখানি ঘোরাঘুরির পর একটা ঘোর অন্ধকার ঘরে ঢুকে আমরা তো আশ্রয় নিলুম। ব'সেই বুঝতে পারলুম, সেখানে প্রায় আধ ইঞ্চিটাক ধুলোর আস্তরণ পাতা রয়েছে। এখন আর সে সব বিচার করবার অবসর নেই। সুতরাং সেই ধুলোর ওপরেই গড়িয়ে পড়া গেল।

পেটের মধ্যে তখন সেই সাংঘাতিক খাদ্যগুলি ও পাকস্থলী—এই দুই পক্ষে ভীষণ ঝগড়া শুরু হয়েছে। কে এসেছ, চোপ্ রাও—ড্যাম্ রাস্কেল—কোঁওও—পোঁওও—চোঁওও—ইত্যাদি তো অনেকক্ষণ থেকেই চলেছিল, এবার দু পক্ষে যুদ্ধ শুরু হ'ল। পটকা, হাউই, বোমা, ছুঁচোবাজি ছাড়তে লাগল উভয় পক্ষেই। প্রাণ যায় যায়! তার ওপরে এতক্ষণ পেটে যে একটু কুন্‌কুনে ব্যথা চলেছিল সেটা বাড়তে লাগল সাংঘাতিকভাবে। ক্রমে সেটা পেট জুড়ে বুকের দিকে উঠতে লাগল। শেষে নিশ্বাস নিতে পারি না এমন অবস্থা।

যন্ত্রণায় আমি ঘরময় গড়াতে আরম্ভ ক'রে দিলুম। একবার সুকান্তকে ডেকে বললুম, সুকান্ত ভাই, আমার বোধ হয় শেষ হয়ে এসেছে। আমি ম'রে গেলে তুই বাড়ি ফিরে যাস।

সুকান্ত জিজ্ঞাসা করলে, তোর কি রকম হচ্ছে?

বললুম, পেটের যন্ত্রণায় নিশ্বাস নিতে পারছি না, দম বন্ধ হয়ে আসছে, এই দেখ্, হাত ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।

সুকান্ত আমার একটা হাত নিয়ে দু হাত দিয়ে ঘ'ষে ঘ'ষে গরম করতে করতে বললে, তোর খুব সম্ভব শুকো কলেরা হয়েছে। কিচ্ছু ভয় নেই, কিচ্ছু ভয় নেই, ভগবানের নাম কর্।—এই অবধি ব'লেই সে উঠে এক রকম দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, আমি সেই ধূলিশয্যায় প'ড়ে রইলুম।

অন্ধকার ঘর, জনমানবশূন্য বাড়ি, চীৎকার করবার শক্তি পর্যন্ত নেই, অব্যক্ত যন্ত্রণা—মনে হচ্ছে, এখুনি মৃত্যু হবে। কিন্তু তার মধ্যেও একলা ভয় করতে লাগল—মৃত্যুভয় নয়, ভূতের ভয়। ভাবছি, ম'রে যাব দেখে সুকান্ত বোধ হয় পালাল। আবার মনে হ'ল, এ সময়ে কি কেউ ফেলে পালাতে পারে? তবে সে কোথায় গেল? পেটের ব্যথা অসহ্য হয়ে উঠতে লাগল। শেষকালে অজ্ঞান হয়ে গেলুম।

আমার মনে হয়, খুব অল্প সময়ই সংজ্ঞাহীন ছিলুম। জ্ঞান ফিরে আসার

একটু পরে দেখলুম, সুকান্ত ছুটে ঘরের মধ্যে এসে একবার আমার মাথার কাছে এসে বসল। একবার যেন আমার মাথায় হাত দিলে। তারপর চাপা কণ্ঠে একবার কেঁদে উঠে বললে, ওঃ, বাবা গো, আর পারি না।

একটুক্ষণ পরে আবার সে ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আমার মনে হ'ল, হয়তো সুকান্ত আমার এই যন্ত্রণা দেখতে পারছে না তাই চোখের আড়ালে স'রে গেল। হয়তো বা সে কোন ডাক্তারের সন্ধানে এমন ভাবে ছুটোছুটি করছে। ওদিকে পেটের যন্ত্রণা এমন হ'ল যে, সে সময় একমাত্র সেই চিন্তা ছাড়া অন্য চিন্তা অসম্ভব হয়ে উঠল। মাঝে মাঝে হাতে-পায়ে খাল ধরুতে আরম্ভ করলে। আমি প্রায় সংজ্ঞাহীনের মত প'ড়ে প'ড়ে মৃত্যুর অপেক্ষা করতে লাগলুম। এর মধ্যে স্পষ্ট বুঝতে পারলুম, সুকান্ত একবার ঘরের মধ্যে এল, আমার কাছেই এসে বসল, কিছুক্ষণ পরে আবার যেন ছুটে বেরিয়ে গেল।

এই রকম কিছুক্ষণ চলতে চলতে হয়তো যন্ত্রণাটা একটু কম পড়ায় একবার তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলুম; এমন সময় স্বপ্নে যেন মনে হ'ল, কে আমায় কাতর কণ্ঠে ডাকছে। যেন অনেক দূর থেকে কোন দুস্থ লোক কাতরে আমার নাম ধ'রে ডাকছে—স্থবির, ও স্থবির!

চট্ ক'রে ঘুমের সেই আচ্ছন্ন ভাবটা কেটে গিয়ে দেখি, সুকান্ত আমায় ডাকছে। জিজ্ঞাসা করলুম, কি বলছ?

সে ফিসফিস ক'রে বলতে লাগল, দুপুরবেলা যে লোকটা এসেছিল না—

—কোন্ লোকটা?

—ওই যে, আমাদের খাবার খাইয়ে গেল—

বললুম, হ্যাঁ, কি হয়েছে?

—বলছি, সেই লোকটা দেবদূত নয়, ও লোকটা হ'ল আসলে যমদূত। আমাদের দুজনকেই খাবার খাইয়ে মেরে দিয়ে চ'লে গেল।

জিজ্ঞাসা করলুম, কেন, তোমার কি হয়েছে?

সুকান্ত বললে, সেই থেকে পেটে অসহ্য যন্ত্রণা আর মিনিটে মিনিটে পেট

নামাচ্ছে।—বলতে বলতে সুকান্ত "ওরে বাবা, ওরে বাবা" ব'লে চেঁচাতে চেঁচাতে আবার ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল।

আমার পেটের ব্যথা তখন অনেক ক'মে গিয়েছিল। মনে হতে লাগল, জ্বরও যেন ক'মে গিয়েছে। খানিক বাদে সুকান্ত ফিরে আসতে তাকে বললুম, একটু সহ্য ক'রে থাক্, পেটের ব্যথা ক'মে যাবে। আমার পেটের ব্যথা যেন অনেক ক'মে গিয়েছে।

কিন্তু সুকান্তর অসুখ ক্রমে বাড়তে লাগল। ক্রমে তার এমন অবস্থা হ'ল যে, সেই ঘরেতেই কাজ সারতে লাগল। সুকান্ত বলতে লাগল, তার পেটের অসুখ তো প্রায় সেরে গিয়েছিল, সেই লোকটাই কোথা থেকে এসে কি সব খাইয়ে দিয়ে তার এই হাল ক'রে দিয়ে চ'লে গেল।

কিছুক্ষণ এই রকম দাপাদাপি ক'রে সুকান্ত যেন এলিয়ে পড়ল। শেষকালে সে আমার পাশে এসে গা ঢেলে দিলে। দু-একবার ডাক দিয়ে দেখলুম, সে ম'রে গেল কি না! সুকান্ত বললে, বড্ড ঘুম পেয়েছে।

দুজনে পাশাপাশি শুয়ে আছি। সুকান্তর লাফালাফি দাপাদাপিতে আমার ঘুম ছুটে গিয়েছে। পেটের যন্ত্রণাটাও যেন ক্রমে মন্দীভূত হয়ে আসতে লাগল। মাঝে মাঝে হাত বাড়িয়ে সুকান্তকে ছুঁয়ে দেখি, তার শরীর ঠাণ্ডা হয়ে গেছে কি না! বাড়ির মধ্যে খুট-খাট দুম-দাম অনেকরকম সন্দেহজনক শব্দ হয় আর ভয়ে শিউরে উঠি। একবার মনে হয়, সুকান্ত যদি ম'রে গিয়ে থাকে, তবে কি হবে? মনে হতেই তাকে ধাক্কা দিয়ে দিয়ে তখুনি জাগাই। সে একবার অতি ক্ষীণ একটু শব্দ ক'রে আবার পাশ ফিরে শোয়। এমনি করতে করতে আমিও আবার ঘুমিয়ে পড়লুম।

কতক্ষণ শুয়ে ছিলুম জানি না, একবার একটা বিকট চীৎকার শুনে ঘুমটা ভেঙে গেল। মনে হ'ল, একটা লোক সেই বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে গলা ছেড়ে চীৎকার ক'রে কি বলছে। লোকটা মারাঠী ভাষায় বললেও ভাবে বুঝতে

পারলুম যে সে বলছে—ধর্মশালায় যদি কেউ থাক তা হ'লে নেমে এস। সুকান্তকে ধাক্কা দিতে গিয়ে দেখলুম, সেও জেগে গেছে।

লোকটা খানিকক্ষণ সেই রকম ষাঁড়ের মতন বিকট চীৎকার ক'রে চুপ করলে। আমি সুকান্তকে বললুম, কিছু দরকার নেই ওর কথায় জবাব দেবার। চুপ ক'রে প'ড়ে থাকা যাক। সে যে পুলিসের লোক তা তার হাঁক-ডাকেই বোঝা গিয়েছিল। আমরা ঠিক করলুম, তার যদি প্রয়োজন থাকে তো সে এখানে আসুক, আমরা যাব না।

অনেকক্ষণ আর কোন সাড়াশব্দ না পেয়ে আমরা নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমের সাধনায় মন দিলুম। কিন্তু নিশ্চিন্ত হবার উপায় কি! একটু পরেই আবার সেই রকম হাঁক-ডাক শুনতে পাওয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে সিঁড়ি দিয়ে খুব ভারী পদক্ষেপে লোহা-বাঁধানো জুতো প'রে কে যেন ওপরে উঠে আসতে লাগল। আমি সুকান্তকে বললুম, মট্‌কা মেরে প'ড়ে থাকা যাক, হাজার চেঁচামেচি করলেও ওঠা নয়।

লোকটা সেই রকম হৈ-হৈ করতে করতে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠল। তারপর এ-ঘর ও-ঘর করতে করতে আমাদের ঘরে এসে সেই রকম চীৎকার ক'রে তার বৃষচক্ষু লণ্ঠন দিয়ে চারিদিকে কি খুঁজতে আরম্ভ করলে। আমরা প'ড়ে প'ড়ে দেখতে লাগলুম। চক্রাকার এক টুকরো আলো এ-কোণ ও-কোণ এদিক সেদিক ঘুরে ঘুরে শেষকালে আমাদের ওপরে এসে স্থির হ'ল।

আমাদের দেখে লোকটা আরও ভীষণ চীৎকার ক'রে সেইখানে দাঁড়িয়েই কি সব বলতে লাগল; কিন্তু আমরা কোন সাড়া না দিয়ে তখনও মটকা মেরে প'ড়ে রইলুম। তখন লোকটা ঘরের মধ্যে ঢুকে প্রায় আমাদের কাছে এসে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কি সব বলতে লাগল। সুকান্ত আর চুপ ক'রে থাকতে না পেরে উঠে প'ড়ে বললে, কেয়া হায়?

লোকটা একটু ভড়কে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, তুম্ কাঁহাকা আদমী হায়?

সুকান্ত বললে, আমরা কলকাতার লোক।

—কিন্তু এখানে বাইরের কোন লোক আসবার হুকুম নেই।

সুকান্ত আবার বললে, আমরা বাইরের লোক নই, আমরা এই ভারতবর্ষেরই লোক।

লোকটা বোধ হয় বুঝতে পারল যে, এদের সঙ্গে তর্ক ক'রে কিছু হবে না, তখন সে অন্য উপায় অবলম্বন করলে। সে বললে, তোমাদের থানায় যেতে হবে।

সুকান্ত বললে, বেশ, যাওয়া যাবে। কাল সকালে যাব থানায়।

—এখুনি যেতে হবে।

—এখুনি যেতে পারব না।

—কেন পারবে না?

—আমার এই বন্ধুর জ্বর হয়েছে, এ এখন উঠতে পারবে না।

জ্বর হয়েছে শুনে লোকটা টপ ক'রে তিন-চার পা পেছনে স'রে গিয়ে বললে, জ্বর হয়েছে! কখন থেকে জ্বর হয়েছে?

—আজ সকাল থেকে জ্বর হয়েছে?

পুলিস-কনস্টেবল আরও কয়েক পা পেছনে ছটকে গিয়ে চেঁচাতে লাগল, আরে, ওর তো নির্ঘাত পেলেগ হয়েছে, এবার এদিকে খুব পেলেগ হচ্ছে, ও মরলে পরে মুর্দা ফেলবে কে? ও তো কালই মরবে।

সুকান্ত বললে, সে মরলে দেখা যাবে।

লোকটা বললে, তা হ'লে তুমি একাই থানায় চল। সেখানে গিয়ে ওর যা ব্যবস্থা হয় করা যাবে।

সুকান্ত বললে, ওকে ছেড়ে আমি এই রাতে কোথাও যাব না। কাল সকালে যা হয় তখন দেখা যাবে।

সুকান্তর সঙ্গে লোকটা চেঁচামেচি করতে লাগল। আমি প'ড়ে প'ড়ে ভাবতে লাগলুম, প্লেগ হয়েছে কি রে বাবা! কালই মরতে হবে!

ওদিকে লোকটা সুকান্তকে মারতে উদ্যত হয়েছে দেখে আমি টপ ক'রে উঠে ব'সেই জিজ্ঞাসা করলুম, কি হয়েছে? তুমি অত চেঁচাচ্ছ কেন?

মুমূর্ষু প্লেগ-রুগীকে ওই রকম ঝাঁকি মেরে উঠতে দেখে লোকটা স্পর্শের ভয়ে একেবারে ঘরের বাইরে গিয়ে সেই বৃষচক্ষু লণ্ঠনটা আমার মুখের ওপর ধরলে। আমি আবার জিজ্ঞাসা করলুম, কি চাই তোমার? রাত-দুপুরে এসে কেন হাঙ্গামা লাগিয়েছ?

সে বললে, তোমাদের থানায় যেতে হবে।

এবারের ভাষা এবং ভঙ্গী অনেক নরম। জিজ্ঞাসা করলুম, কেন থানায় যেতে হবে? আমরা কি চোর, না, ডাকাত?

লোকটা খুবই নরম হয়ে বললে, না না, তা নয়, থানার অফিসার তোমাদের ডাকছেন।

চল্ সুকান্ত।—ব'লে তার হাত ধ'রে টেনে তুলে সেই লোকটাকে বললুম, চল, তোমার থানায় যাই।

লোকটার সঙ্গে সেই রাত্রে ধর্মশালা ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লুম। স্টেশন-সংলগ্ন জায়গা ব'লে সেখানটা বেশ আলো। স্টেশনের পাশেই রেল-পুলিশের থানা। লোকটা আমাদের সেই থানার মধ্যে নিয়ে গেল।

সেখানে একটা ঘরের মধ্যে খুব উজ্জ্বল আলো জ্বলছিল। এখানে ওখানে দু-তিন জন লোক চেয়ারে ব'সে কাজ করছে দেখলুম। পুলিস-কন্স্টেব্ল এদেরই মধ্যে একজন মুরুব্বি-গোছের লোকের কাছে আমাদের নিয়ে গিয়ে অনেকক্ষণ ধ'রে "ইক্ড়ে-তিক্ড়ে" ক'রে কি সব বললে। তার বলা শেষ হয়ে গেলে কর্মচারীটি আমাদের ইংরেজীতে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের বাড়ি কোথায়?

বললুম, আমাদের বাড়ি কলকাতায়।

—এখানে কি সিধে কলকাতা থেকে আসছেন?

—না, আমরা সুরাট থেকে আসছি।

লোকটির কথাবার্তা বেশ নম্র এবং ভদ্র—ঠিক পুলিসজনোচিত নয়। একটু পরে জিজ্ঞাসা করলেন, সুরাটে আপনারা কি করেন, জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?

বললুম, সুরাটে আমরা কিছুই করি না, সেখানে আমাদের বন্ধু আছেন—তিনি ব্যবসা করেন, আমরা সেখানে এসেছি কর্মের সন্ধানে।

—কি কর্ম?

—কোন চাকরি-বাকরি।

—তবে নোভাসারিতে এসেছেন কেন?

—ওই একই উদ্দেশ্যে।

এবার লোকটি বললেন, আপনারা বসুন।

আমরা বসতেই ভদ্রলোক বললেন, দেখুন, এই জায়গাটি হচ্ছে গাইকোয়াড়ের রাজত্ব। এখানে বাইরের লোক এলে তার ওপর নজর রাখা হয়। আমি আপনাদের ভালর জন্যেই বলছি—আপনারা এখান থেকে এখুনি চ'লে যান, নচেৎ নানারকম ফ্যাসাদে পড়বেন। আপনারা ছেলেমানুষ এবং এখানে কেউ চেনে না। হয়তো এমন বিপদে পড়বেন যে, ফাটক পর্যন্ত হয়ে যেতে পারে। তা ছাড়া কিছুদিন থেকে এখানে খুব প্লেগ হচ্ছে, সেদিক দিয়েও বিশেষ ভয় আছে।

লোকটির কথা আমাদের যুক্তিযুক্ত মনে হ'ল। কিন্তু আমরা যাব কোথায় আর কি ক'রেই বা যাব?—এই সব চিন্তা করছি, এমন সময় ভদ্রলোক বললেন, কি ঠিক করলেন?

বললুম, দেখুন, আপনার উপদেশ খুবই সমীচীন ব'লে মনে হচ্ছে। কিন্তু আমাদের কাছে তো কিছুই নেই—রেল-ভাড়া দেব এমন পয়সাও আমাদের কাছে নেই।

ভদ্রলোক বললেন, কিছুই নেই?

—আনা দুই আছে।

তিনি সেই দু আনা আমাদের কাছ থেকে চেয়ে নিলেন। সেখান থেকে সুরাটের ভাড়া বোধ হয় তখন জনপ্রতি সাত আনা ছিল। বাকি পয়সা

থানার ক্যাশ থেকে বার ক'রে থানার একজন লোককে দিয়ে বললেন, সুরাটের দুখানা টিকিট কেটে এদের চড়িয়ে দিয়ে এস।

আমাদের .দিকে তাকিয়ে বললেন, কিছু মনে করবেন না। এতে আপনাদের ও আমাদের দু পক্ষেরই ভাল হবে। দুটো ক'মিনিটে একটা গাড়ি আছে। এতেই আপনারা ফিরে যান।

লোকটির সঙ্গে আমরা স্টেশনে ফিরে এলুম। একটু পরেই একখানা সুরাটযাত্রী গাড়ি এল। তারই তৃতীয় শ্রেণীর একখানা কামরায় আমাদের তুলে দিয়ে, গাড়ি যখন বেশ চলতে আরম্ভ করেছে সেই সময় সঙ্গের লোকটি টিকিট দুখানা আমাদের হাতে দিয়ে দিলে।

আমরা এতই অবাঞ্ছিত যে, পুলিস গাঁটের পয়সা খরচ ক'রে সেখান থেকে ভাগিয়ে দিলে! নলরাজার হাত থেকে পোড়া শোলমাছ পালিয়ে গিয়েছিল। নলের নাক কাটতে গিয়ে কলি পোড়া-শোলেরও প্রাণ ফিরিয়ে দিয়েছিল। শোলের ভাগ্যে কলির কোপ পড়েছিল নলের ওপর। পুরাণের কাহিনীর মধ্যে নলের কাহিনীটি একটি আশ্চর্য কাহিনী। কিন্তু আমাদের কাহিনীটি ছিল অত্যাশ্চর্য কাহিনী। পুলিস যে কেন গাঁটের পয়সা খরচ ক'রে আমাদের নোভাসারি থেকে সরিয়ে দিলে, নিজের নাক বাঁচাবার জন্যে, না, পরের নাক কাটবার জন্যে—সে ইতিবৃত্ত আজও অপরিজ্ঞাত হয়ে আছে।

এর সঙ্গে আর একদিনের কথা মনে পড়ছে। তখন আমি বোম্বাই শহরে বাস করি। এই নোভাসারির একটি বিশিষ্ট পার্শী পরিবারের দ্বারা নিমন্ত্রিত হয়ে সবান্ধবে ও সপরিবারে একবার সেই গাইকোয়াড়ী রাজ্যে গিয়েছিলুম। ভদ্রলোক সেখানে পুলিস-বিভাগে বড় চাকরি করতেন। সেখানে কয়েকদিনের খাতির-যত্নে আদরে-আপ্যায়নে একেবারে অভিভূত হয়ে পড়েছিলুম। একদিন রাত্রে ডিনারের পর আমরা পুরুষ ক'জন টেবিলে ব'সে খুব গল্প ওড়াচ্ছি, মেয়েরা আমাদের টেবিলের একটু দূরে ব'সে গল্প-গাছা করছিলেন। কি জানি, কার একটা গল্প শুনে পুরুষদের মহলে খুব একটা হাসির হর্‌রা উঠতেই বাড়ির গিন্নী

যিনি তিনি তাঁদের দল থেকে উঠে এসে আমাদের বললেন, দেখ, তোমাদের এখানে খুব হাসি উড়ছে দেখে আমাদেরও এখানে এসে বসতে ইচ্ছে করছে।

আমরা বললুম, তা দয়া ক'রে এখানে এসে বসুন না।

গিন্নী বললেন, বসতে পারি যদি একটা প্রতিজ্ঞা করেন তা হ'লে।

—কি প্রতিজ্ঞা ?

—আমাদের দলে ছোট ছোট কুমারী মেয়েরাও রয়েছে। আপনারা যদি প্রতিজ্ঞা করেন যে, কোন অসভ্য গল্প করবেন না তা হ'লে সকলে বসতে পারি।

মেয়েরা এসে বসবার পর একজন প্রস্তাব করলেন, আচ্ছা, এখানে উপস্থিত প্রত্যেকের জীবনের কোন একটা অদ্ভুত ঘটনার বর্ণনা কর। মেয়েরা ইচ্ছা করলে বলতেও পারে, কিন্তু পুরুষদের প্রত্যেককেই বলতে হবে।

প্রথমেই আমার পালা পড়ল। আমি তো ইনিয়ে-বিনিয়ে অনেকক্ষণ ধ'রে আমাদের নোভাসারির এই অভিজ্ঞতাটির বর্ণনা করলুম। আমার কাহিনী শুনে পুরুষেরা কোন মন্তব্য না ক'রে তাঁদের খালি পাত্র পূর্ণ করার দিকে মন দিলেন। মেয়েদের মন বোধ হয় আমার দুঃখে একটু ভিজেছিল। আমার পাশেই বাড়ির বড় মেয়ে দ্বাবিংশবর্ষীয়া সুন্দরী নাজু ব'সে ছিল। সে বললে, আপনি কাজের জন্যে এত বাড়ি ঘুরলেন, কিন্তু আমাদের বাড়িতে যদি আসতেন তো নিশ্চয় সাহায্য পেতেন।

বললুম, আসবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু আসি নি এই জন্যে যে, কন্যে, তখনও তুমি জন্মাও নি।

হালকা হাসির ফুৎকারে ব্যথার বাষ্প উড়ে গেল।

এখন যা বলছিলুম। সুরাটে এসে যখন পৌঁছলুম, তখনও প্রায় দু ঘণ্টা রাত্রি আছে। পুলিসের সঙ্গে বকাবকি করার ফলে আমার জ্বর ও পেটের ব্যথা সেরে গিয়েছিল। সুকান্তরও পেট নামানো বন্ধ। স্টেশনের কাছেই দিল্লী-দরওয়াজা। গুটিগুটি গিয়ে আবার নিশিকান্তের দরজায় ধাক্কা দেওয়া গেল। কোন কিছু না ক'রে ফিরে আসায় তারা বিরক্তই হ'ল।

নিশিকান্ত তার স্বভাবসিদ্ধ কাটা-কাটা বুলি ছাড়তে লাগল। কিন্তু তখন আর সে সব কথায় কান না দিয়ে শুয়ে পড়া গেল। পরের দিন অনেক বেলাতেই ঘুম ভাঙল।

উঠে দেখি, ওরা কেউ ঘরে নেই। অনেক বেলায় নিশিকান্তরা এসে রান্না-বান্না ক'রে নিজেরা খেলে ও আমাদেরও খেতে দিলে। নোভাসারিতে কাল সারাদিন কি করেছি ও কেমন ক'রে পুলিসের অত্যাচারে চলে আসতে হয়েছে, সে কথা সব খুলে তাদের বললুম।

নিশিকান্ত বললে, এখানকার সবচেয়ে বড় ইঞ্জিনিয়ার যে, সে বাঙালী। রোজ সকালে সে অমুক জায়গায় কাজ দেখতে আসে। তোমরা কাল সকালে গিয়ে তাকে ধর—একটা চাকরি-বাকরির জন্যে। সেখানে কোন সাহায্য যদি না পাও তো ওই কাছেই ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের বাড়ি। সোজা চ'লে যাবে তাঁর কাছে। তিনি কোন না কোন উপায় ক'রে দেবেনই।

ওখানকার ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব অতিশয় দয়ালু ব'লে আমরাও শুনেছিলুম। কাল সকালে ইঞ্জিনিয়ার কিংবা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে যাওয়া যাবে স্থির ক'রে তখনকার মতন তো শুয়ে পড়া গেল। আমাদের সঙ্গে নিশিকান্ত, উপেনদা, জনার্দনও শুয়ে পড়ল। তারপর বিকেল হতে না হতে তারা জনার্দনকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। এতক্ষণের মধ্যে এক মুহূর্তের জন্যও জনার্দনকে আমরা একলা পেলুম না। স্নান করতে যাবার সময়ও নিশিকান্ত তাকে নিয়ে গেল।

আমরা দুজনে পরামর্শ ক'রে স্থির করেছিলুম যে, এখানে যদি কিছু না হয়, তা হ'লে বোম্বাই চ'লে যাব। জনার্দন যদি আমাদের সঙ্গে যায় তো ভালই, নচেৎ গোটা কয়েক টাকা তাকে দিয়ে নিশিকান্ত কিংবা উপেনদার কাছ থেকে চেয়ে নেব। কিন্তু এতক্ষণের মধ্যে তার সঙ্গে নিরিবিলি একটা কথা কইবারও অবকাশ পেলুম না।

অনেক রাত্রে নিশিকান্তরা ফিরে এসে শুয়ে পড়ল। তারা নিশ্চয় বাইরে

আহারাদি সেরে এসেছিল, কারণ রান্না-বান্না কিছু করলে না এবং আমরা খেয়েছি কি না তাও জিজ্ঞাসা করলে না।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে মুখ ধুয়ে আমরা যাত্রা করলুম সেই বাঙালী ইঞ্জিনিয়ারের উদ্দেশে। লোককে জিজ্ঞাসা করতে করতে অনেক দূরে সেই একেবারে প্রায় শহরের প্রান্তে এক জায়গায় গিয়ে উপস্থিত হলুম। দেখলুম, রাস্তার ধারেই কতকগুলো বাড়ি তৈরি হচ্ছে। তারই এক প্রান্তে আমাদের এই ইঞ্জিনিয়ার সাহেব দাঁড়িয়ে কয়েকজনের সঙ্গে কথাবার্তা বলছেন।

রাস্তায় আরও কয়েকজন লোক দাঁড়িয়ে ছিল। তাদের জিজ্ঞাসা ক'রে জানতে পারলুম যে, ইনিই সেই ইঞ্জিনিয়ার যাঁর উদ্দেশে আমরা এসেছি। ভদ্রলোক তখন অন্য লোকের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে ব্যস্ত তাই আমরা দূরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলুম, আশা—একটু ফাঁক পেলেই গিয়ে উপস্থিত হব। কিন্তু তাঁর কাজ আর শেষ হয় না—এক দলের সঙ্গে কথাবার্তা শেষ হ'ল তো আর এক দল এসে গেল।

এই রকম চলেছে, এমন সময় আমাদের ওপর তাঁর দৃষ্টি পড়ল। দেখলুম, অন্য লোকের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে বলতে ঘন ঘন তিনি আমাদের দিকে তাকাচ্ছেন। শেষকালে এক দলের সঙ্গে কথা বলা বন্ধ ক'রে এগিয়ে এসে আমাদের তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কে হে তোমরা, বাঙালী নাকি?

বললুম, আজ্ঞে হ্যাঁ, আমরা বাঙালী।

ইঞ্জিনিয়ার সাহেব চীৎকার ক'রে উঠলেন—পরে দেখেছি যে ওই রকম চীৎকার ক'রে কথা বলাই তাঁর অভ্যাস—বাড়ি কোথায়? কলকাতায় নিশ্চয়।

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—তোমরা সব এই রকম বাড়ি থেকে পালিয়েছ আর সেখানে হৈ-হৈ খুনোখুনি চলেছে, তার কিছু খবর রাখ?

কিছু কিছু ক'রে যে না রাখতুম তা নয়। তবে এ ক্ষেত্রে চেপে যাওয়াই সমীচীন বোধ ক'রে তূষ্ণীম্ভাবই অবলম্বন করা গেল।

ইঞ্জিনিয়ার সাহেব আবার হাঁক ছাড়লেন, দেখে শুনে তো মনে হচ্ছে ভালঘরের ছেলে, কিন্তু এমন দুর্মতি কেন হ'ল ? একটু চুপ ক'রে থেকে আবার বললেন, তার পর ? এখানে কি চাই ? এখানে এসেছ কি করতে ?

বললুম, বাইরে বেরিয়েছিলুম কাজকর্ম করব ব'লে। আমেদাবাদে কাপড়ের কলে কাজ শেখবার উদ্দেশ্য ছিল ; কিন্তু তারা নিলে না। আপনার কাছে এসেছি যদি একটা কাজকর্ম দেন—কুলিগিরিও করতে আমরা রাজী আছি। একটা কাজকর্ম পেলে তবে প্রাণরক্ষা হয়। বিদেশে বড় কষ্টে পড়েছি—আপনি বাঙালী, তাই আপনার কাছে এসেছি।

আমাদের কাতর প্রার্থনায় ভদ্রলোকের মন গলল না। এক মুহূর্ত চিন্তা না ক'রে তিনি ব'লে দিলেন, এখানে কিছু হবে না। আমি কিছু করতে পারব না।

বাস্, হয়ে গেল। ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের চীৎকার শুনে তাঁর যত কর্মচারী সেখানে ছিল, সব এসে সেখানে দাঁড়িয়ে গেল। রাহী লোকও কেউ কেউ দাঁড়াল। তিনি আরও কিছু উপদেশ দিয়ে আবার স্বস্থানে ফিরে গেলেন। আমরাও আস্তে আস্তে স'রে পড়লুম।

কিছুদূর গিয়ে সুকান্ত বললে, চল্, এখান থেকেই স্টেশনে গিয়ে বোম্বাইযাত্রী ট্রেন ধরা যাক। বোম্বাইয়ের কেরামতিটা দেখে ওইখানেই শেষকালে সমুদ্রে ঝাঁপ দেওয়া যাবে।

সুকান্তকে বললুম, আরও একটা জায়গা এখনও দেখতে বাকি আছে। ওই সামনেই ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের বাড়ি দেখা যাচ্ছে। চল্, একবার ওখানকার কৃত্যটা শেষ ক'রে আসি। পেছুটান রেখে যাওয়াটা কিছু নয়।

সামনেই ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের পাথরের বাড়িটা দেখা যাচ্ছিল, প্রকাণ্ড গেট দুটো খোলা—যেন উচ্চহাস্যে আমাদের ব্যঙ্গ করছে। তবুও আমরা যুগলে অগ্রসর হলুম। গেটের কাছে গিয়ে দেখা গেল, দরোয়ান ইত্যাদি কিছুই নেই।

আমরা ভেতরে ঢুকে গেলুম। খাঁ-খাঁ করছে গোটা বাড়িটা—কেউ কোথাও নেই। কি ক'রে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের দেখা পাওয়া যাবে তাই ভাবছি

ও একটু একটু ক'রে সেই প্রাসাদের গভীরে প্রবেশ করছি, এমন সময় দীর্ঘ সোপানশ্রেণী চোখে পড়ায় আস্তে আস্তে সেদিকে অগ্রসর হতে লাগলুম। তখনও লোকজন চোখে পড়ল না।

সিঁড়ি দিয়ে কয়েক ধাপ উঠেই দেখলুম যে, সিঁড়িটা গিয়ে পৌঁছেছে একেবারে বড় একটা সাজানো ড্রয়িং-রুমের মধ্যে। আমরা রাস্তার ভিখিরী—একেবারে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের ড্রয়িং-রুমে গিয়ে পৌঁছুব, সাহায্যের বদলে জেল হয়ে যেতে পারে ভেবে সেইখানেই দাঁড়ানো গেল। কিন্তু ভেবে দেখলুম, জেল যদি হয় তা হ'লেও তো কিছুকালের জন্যে নিশ্চিন্ত—কুছ পরোয়া নেই মন! উঠে পড়।

গুটিগুটি সিঁড়ি ভেঙে একেবারে গিয়ে উঠলুম সেই ড্রয়িং-রুমে।

ঘরের মধ্যে—সিঁড়ি দিয়ে উঠেই বললে হয়—একজন লম্বা একটা ঈজি-চেয়ারে শুয়ে কি পড়ছিলেন। আমরা উঠে ঘরের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াবার পর বেশ কয়েক সেকেণ্ড পরে মুখ থেকে বইখানা সরিয়ে কিছুমাত্র আশ্চর্য না হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কি চাই?

কি বলব ইতস্তত করছি—ইতিমধ্যে তিনি চেয়ার থেকে পিঠ তুলে পা দুটো নামিয়ে সোজা হয়ে বসলেন। যতদূর মনে হচ্ছে, ভদ্রলোকের বয়স তখন চল্লিশ পার হয়ে গিয়েছে, তাঁর মাথার চুল কম হ'লেও লম্বা, কেশবিরল লম্বা দাড়ি, রোগা লম্বা একহারা চেহারা, একটা ঢোলা পাজামা ও বাংলা পাঞ্জাবির মত ঢোলা-হাতা একটা জামা—পাজামা ও জামা দুটোই আধময়লা। বুঝতে পারলুম, ইনিই ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব।

বললুম, মশাই, আমরা বাঙালী। দেশ থেকে বেরিয়েছিলুম নিজেদের পায়ে নিজেরা দাঁড়াব ব'লে; কিন্তু কিছু না করতে পেরে অত্যন্ত দুর্দশাগ্রস্ত হয়েছি। ইচ্ছে ছিল, আমেদাবাদে কাপড়ের কলে কাজ শিখব, কিন্তু সেখানে ঢুকতে পারলুম না। আশা আছে, বোম্বাই শহরে যদি যেতে পারি হয়তো

সেখানকার মিলে ঢুকতে পারব। কিন্তু আমাদের কাছে একটি পয়সাও নেই—আপনার কাছে এসেছি যদি কিছু সাহায্য পাই।

আমাদের কথা শেষ হওয়া মাত্র ভদ্রলোক তড়াক ক'রে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। আমরা ভাবতে লাগলুম, কি রকম হ'ল? এখান থেকে এখন বোধ হয় স'রে পড়াই উচিত।

এই রকম ভাবছি, বোধ হয় মিনিট পাঁচেক গেছে, এমন সময় তিনি কর্‌করে দুখানা দশ টাকার নোট নিয়ে এসে একখানা আমাকে ও একখানা সুকান্তকে দিয়ে বললেন, যাও, বম্বে যাও। সেখানে গিয়ে কি করতে পারলে তা যদি আমাকে জানাও তো খুশি হব।

কি ব্যাপার! আমাদের সব হিসাব ধুয়ে মুছে দিয়ে এ কি ঘটল! উদ্‌গত অশ্রুতে কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এল—কৃতজ্ঞতা ভাষায় আর প্রকাশ করতে পারলুম না। ভদ্রলোক আবার বললেন, মনে হচ্ছে তোমরা অত্যন্ত ক্লান্ত, আমার এখানে খেতে যদি তোমাদের আপত্তি না থাকে তো খেয়ে গেলে আমি খুশি হব।

বললুম, খেতে আমাদের কোন আপত্তি নেই।

ভদ্রলোক আবার লম্বা লম্বা পা ফেলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। এবার প্রায় দশ মিনিট বাদে ফিরে এলেন, তাঁর পেছনে একটি লোক—তার দু হাতে দুখানা থালা। লোকটা থালা দুটো নিয়ে এসে একটা টেবিলের ওপর রাখলে। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব আমাদের বললেন, যাও, ওখানে ব'সে খাও।

আমরা গিয়ে ব'সে পড়লুম। থালার ওপরে দুখানা ক'রে ঘি-মাখানো ছোট ছোট হাতে-গড়া রুটি আর থালার কোণে একটু তরকারি। আমেদাবাদ ত্যাগ ক'রে অনেক দিন সুখাদ্য খাই নি। আমরা তো মিনিট খানেকের মধ্যেই দুখানা ক'রে রুটি চট্‌ ক'রে মেরে দিলুম। একটু বাদেই লোকটা আবার চারখানা রুটি এনে দিলে। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব আমাদের সামনেই ব'সে ছিলেন—তিনি নিজেই উঠে গিয়ে কোথা থেকে দুটো কাচের গেলাস ও এক জগ জল নিয়ে এসে আমাদের দুজনের সামনে দুটো গেলাস রেখে তাতে জল ভ'রে দিলেন।

ইতিমধ্যে তাঁর লোক এসে খানকয়েক ক'রে রুটি দিয়ে গেল। আমাদের পাতের তরকারি ফুরিয়ে যাওয়ায় আমরা শুধু রুটি খেতে আরম্ভ করেছি দেখে তিনি টেবিলের ওপর থেকে একটা জ্যামের টিন নিয়ে ছুরি দিয়ে আমাদের দুজনের পাতেই রাশীকৃত ক'রে জ্যাম ঢেলে দিলেন।

খাওয়া শেষ হয়ে যাবার পর সেই লোকটা এসে আমাদের নিয়ে গিয়ে হাতে জল ঢেলে দিলে। হাত-মুখ ধুয়ে এসে দেখি, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব সেই ঈজি-চেয়ারে শুয়ে আবার পাঠে মন দিয়েছেন। কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই তিনি মুখ থেকে বইখানা সরিয়ে হাস্যমুখে বললেন, এবার তোমরা যাবে ?

যাবার আগে কৃতজ্ঞতা জানাবার ভণিতা করব, এমন সময় সিঁড়িতে ধপ্‌ধপ্‌ ক'রে আমাদের সেই পূর্ব-বর্ণিত ইঞ্জিনিয়ারের আবির্ভাব হ'ল। আমাদের দেখে ভদ্রলোক সেইখান থেকে একরকম ছুটে বাকি সিঁড়িগুলো পেরিয়ে এসে চীৎকার ক'রে বলতে আরম্ভ ক'রে দিলেন, এই যুবকেরা বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছে। কলকাতায় এদের বাড়ি। আমার কাছে প্রতিদিন সেখান থেকে সংবাদপত্র আসে। এরা পালাবার পর সেখানে হৈ-হৈ ব্যাপার চলেছে, এমন কি খুন-খারাপি পর্যন্ত বাদ যায় নি—আর এখানে এরা দিব্যি মজাসে আছে।

ইঞ্জিনিয়ার সাহেব কিঞ্চিৎ স্থূলকায় ছিলেন। একসঙ্গে এতগুলো কথা ব'লে হাঁপাতে লাগলেন। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব অত্যন্ত ধীরভাবে তাঁর কথার জবাবে বললেন, কিন্তু সেখানকার হাঙ্গামার জন্যে এদের কি ভাবে দায়ী করতে পারেন ? একটু চুপ ক'রে থেকে তিনি আবার বললেন, এরা নিজের পায়ে দাঁড়াবে ব'লে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছে।

ইঞ্জিনিয়ার সাহেব দমবার পাত্র নন। তিনি আবার সেই রকম চীৎকার ক'রে বললেন, তা ব'লে বাপ-মাকে কাঁদিয়ে বাড়ি থেকে লম্বা দেবে ? জানেন, এরা সব ভাল ঘরের ছেলে ?

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বললেন, সেই জন্যেই তো এদের সাহায্য করা উচিত।

এরা বোম্বাই গিয়ে সেখানকার কাপড়ের কলে কাজ শিখতে চায়। পরে ওদের দেশে যখন কাপড়ের কল হবে, তখন সেখানে যোগ দিতে পারবে।

—শোনেন কেন ওদের কথা! এই সব ছেলে মন দিয়ে কাজ শিখবে?

—আহা, ও-বেচারীদের একটা সুযোগ দেবার আগেই ও-কথা বলছেন কেন? আপনার কোনও কাপড়ের কলের মালিকের সঙ্গে পরিচয় আছে?

—আমার তিন-চারটে কাপড়ের কলের ডিরেক্টারদের সঙ্গে বিশেষ পরিচয় আছে, কিন্তু তাদের না লিখলে তো কিছু বলতে পারছি না।

—তা হ'লে আপনি তাদের লিখুন।

—তাতে তো কয়েক দিন সময় যাবে। আপনি কি ওদের কিছু টাকাকড়ি দিয়েছেন নাকি?

—হ্যাঁ, দিয়েছি।

—কই, টাকা আমাকে দাও।—ব'লে তিনি আমাদের দিকে তাকালেন।

আমরা নোট দুখানা তাঁর হাতে দিয়ে দিলুম। তিনি ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের হাতে টাকাগুলো ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, এখন ওদের হাতে টাকা দিয়ে কোনও লাভ নেই। আমি তাদের চিঠি লিখে আগে সব ঠিক করি। তারপর তিনি আমাদের দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায় থাক তোমরা?

ইতিপূর্বে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে বলেছিলুম, আমাদের থাকবার কোন আশ্রয় নেই, পথে পথে ঘুরে বেড়াই। আমাদের হয়ে তিনিই আগে জবাব দিয়ে দিলেন, ওদের থাকবার কোন আশ্রয় নেই। এই ক'দিনের জন্যে আমাদেরই ব্যবস্থা করতে হবে।

ইঞ্জিনিয়ার সাহেব ফাঁপরে প'ড়ে গেলেন। একটু ভেবে আমাদের বললেন, আচ্ছা, দেখি, কি করতে পারি! আপনারা বসুন।

আমরা যেখানে ব'সে খেয়েছিলুম, সেই চেয়ারে গিয়ে বসলুম। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব ঈজি-চেয়ার থেকে উঠে একটা লেখার টেবিলের সামনে গিয়ে ব'সে

কাকে চিঠি লিখলেন। তারপরে একজন চাকর ডেকে তাকে কি সব ব'লে চিঠিখানা দিয়ে আবার ঈজি-চেয়ারে গিয়ে বসলেন।

আমরা এদিকে ব'সে রইলুম, ওদিকে ইঞ্জিনিয়ার সাহেব সশব্দে আলাপচারী করতে লাগলেন। চা এল, তিনি চা খেলেন। আমরা ব'সে আছি তো ব'সেই আছি। আবার ভাগ্য কোথায় নিয়ে যায় তাই ভাবছি। নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছি যে, কোন কলে ঢুকতে পারি তো ভালই হয়। আমাদের দিন চলবার জন্যে নিশ্চয়ই তারা একটা মাসোহারা দেবে।

ঘরের মধ্যে একটা বড় ঘড়ি প্রতি আধ ঘণ্টায় একবার ক'রে চমকে দিয়ে যাচ্ছে। আমাদের কোন তাড়া নেই; দু দিন এক রকম অনাহারে থেকে আজ পেটে যা পুরেছি তাতে অন্তত দু দিনও চলবে—এই রকম সব চিন্তা মনের মধ্যে লাফালাফি করছে, এমন সময় ঘরের মধ্যে আনন্দের তুফান তুলে একটি ভদ্রলোক ঢুকলেন।

যিনি ঢুকলেন, রোগা লম্বা তাঁর চেহারা, পেণ্টুলান ও গলাবন্ধ কোট পরা। রঙ একেবারে ইউরোপীয়দের মত বললেই হয়, মাথায় গোল টুপি, কপালে চন্দনের সঙ্গে কালো মতন কি একটা মিলিয়ে তারই ফোঁটা কাটা। তাঁকে দেখলে সেদিকে থেকে চোখ ফেরানো যায় না, মনে হয় যেন খানিকটা জ্যোতি কোথা থেকে ঠিকরে এল। সিঁড়ি দিয়ে উঠেই তিনি হো-হো ক'রে হেসে উঠলেন। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব উঠে তাঁকে ঈজি-চেয়ারে বসতে অনুরোধ করলেন। তিনি কিছুতেই এমন বেয়াদবি করবেন না, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবও ছাড়বেন না। শেষকালে ইঞ্জিনিয়ার সাহেব উঠে এক দিক থেকে একটা চেয়ার তুলে নিয়ে গেলেন। আবার একটা হাসাহাসি পড়ল।

যা হোক, সকলে উপবেশন করার পর তাঁরা কথাবার্তা শুরু করলেন। কথাবার্তার মধ্যে মধ্যে এই নবাগত ভদ্রলোকটি এক-একবার ফিরে ফিরে আমাদের দিকে তাকাতে লাগলেন, কখনও হাস্যমুখে, কখনও গম্ভীর হয়ে। বেশ বুঝতে পারলুম, আমাদেরই কথা হচ্ছে। কথাবার্তার মধ্যেও মাঝে

মাঝে উচ্চহাস্য হতে লাগল। এই রকম কথাবার্তা ও হাসাহাসি হতে হতে তাঁরা তিনজনেই হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠলেন। এই সময় ইঞ্জিনিয়ার সাহেব আমাদের ডাক দিলেন, ওহে ছোকরারা, এদিকে এস।

আমরা তটস্থ হয়ে উঠে সেখানে যেতেই তিনি সেই রকম চীৎকার ক'রে বলতে লাগলেন, তোমরা এখন আমাদের এই পণ্ডিতজীর বাড়িতে গিয়ে থাক। ও-দিকে মিলের মালিকদের চিঠি লেখা হচ্ছে, সেখান থেকে খবর এলেই তোমাদের পাঠিয়ে দেওয়া যাবে। দেখো, যেন পণ্ডিতজীকে জ্বালিয়ে আর বাঙালীর বদনাম ক'রো না, যা সব গুণধর ছেলে—তোমাদের দ্বারা সব সম্ভব।

আমরা পণ্ডিতজীকে ঘাড় নীচু ক'রে নমস্কার করতেই তিনি সস্মিতমুখে আমার পিঠে হাত দিয়ে ইংরিজীতে বললেন, চল।

আমরা অগ্রসর হতেই ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব এগিয়ে এসে বললেন, আমি আশা করি, পণ্ডিতজীর পরিবারের মধ্যে তোমাদের কোন কষ্ট হবে না। তোমরা ভবিষ্যতে উন্নতি করলে আমি খুশিই হব, আমার কথা ভুলো না যেন।

আবার তাঁদের মধ্যে একটা হাসাহাসি প'ড়ে গেল। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব আরও বললেন, যতদিন এখানে আছ মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে দেখা করতে পার। বিকেলবেলা আমার কাজ থাকে না—

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু পণ্ডিতজী আমার একটা বাহু আকর্ষণ ক'রে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে বললেন, আচ্ছা, আমরা তা হ'লে এখন যাই। আমাকে আবার একবার আপিসে যেতে হবে। আপনি ডাক দেওয়ায় কিছু কাজ ফেলেই আসতে হয়েছে।

এই অবধি ব'লেই আবার সেই রকম হো-হো ক'রে হেসে আমাকে একরকম টানতে টানতে হুড়-দাড় ক'রে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলেন। আসবার সময় ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে একটা কৃতজ্ঞতা জানানো তো দূরের কথা, বিদায় নেবারও অবসর পেলুম না। গেটের সামনেই ঘোড়ার গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল। পণ্ডিতজী বললেন, উঠে পড়—চটপট।

আমরা যতটা চটপট সম্ভব গাড়িতে উঠে বসলুম। আমরা ওঠবার পর পণ্ডিতজী গাড়িতে উঠলেন। উঠেই আদেশ দিলেন, চল দফ্‌তর।

গাড়ি ছুটল। গাড়িতে উঠেই এক মিনিটের মধ্যেই পণ্ডিতজীর মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। এই লোকই যে এক মুহূর্ত আগেই প্রতি কথায় উচ্চ হাস্যে চারিদিক প্রতিধ্বনিত করছিলেন, তা এখন তাঁকে দেখলে বোঝাই যায় না।

আমি ঠিক তাঁর সামনেই ব'সে ছিলুম। টকটকে গৌরবর্ণ তাঁর মুখমণ্ডল থেকে লাল আভা ফুটে বেরুচ্ছে। চোখের দৃষ্টি যেন ইহলোক ছাড়িয়ে কোন সুদূরে প্রসারিত। কি যেন এক বেদনায় ক্লিষ্ট-মধুর সেই মূর্তি আমার কাছে অপূর্ব ব'লে মনে হতে লাগল। যে আনন্দময় মূর্তি ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের ওখানে দেখেছিলুম, তার ওপরে বিষাদের ছায়া এসে পড়ায় যেন আরও সুন্দর হয়ে উঠল সে মূর্তি—আমি হাঁ ক'রে পণ্ডিতজীর মুখের দিকে চেয়ে রইলুম। অনেক রাস্তা ঘুরে ঘুরে অনেকক্ষণ পরে গাড়ি এসে আপিসের কাছে দাঁড়াতেই পণ্ডিতজী টপ ক'রে নেমে গেলেন।

কিন্তু পণ্ডিতজীর কথা এখন থাক্, আগে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কথা শেষ করি।

আমরা সুরাটে পৌঁছবার দু-চার দিন পরেই সেই দেশের একজন লোকের মুখে শুনেছিলুম যে, সেখানকার বর্তমান ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব অত্যন্ত ভাল লোক। ক্রমেই এর ওর তার কাছ থেকে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব সম্বন্ধে নানান কিম্বদন্তী শুনতে লাগলুম। শুনলুম যে, সকালবেলা তিনি পকেটে পয়সা ভর্তি ক'রে নিয়ে অনেক দূরে দূরে দরিদ্র পল্লীগুলির মধ্যে বেড়াতে চ'লে যান। সেখানে গিয়ে বাড়ি বাড়ি ঘুরে লোকের দুঃখ মোচন করবার চেষ্টা করেন—পকেটের সমস্ত টাকা-পয়সা দরিদ্রের মধ্যে ব্যয় ক'রে চ'লে আসেন। দাতার ধর্ম হচ্ছে—কেউ এসে সাহায্য চাইলে তাকে নিরাশ না করা। কিন্তু ইনি চাইবারও অবকাশ দিতেন না—তেড়ে গিয়ে দুঃখ ও দারিদ্র্যকে আক্রমণ করতেন। এই রকম করাতে মাস শেষ হবার অনেক আগেই তাঁর মাইনের

টাকা ফুরিয়ে যেত এবং অনেক সময়েই নিজের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্যে অন্যের কাছে কর্জ পর্যন্ত করতে হ'ত। অনেক সময় অনেক দুস্থ লোক তাঁর কাছে গেলে উপকৃত হবে জেনেও দয়া ক'রে সেখানে যেত না। তাঁর এই স্বভাবের কথা সেখানে সকলেই জানত ব'লে সেখানকার উচ্চপদস্থ কর্মচারী ও তাঁর বন্ধুরা সর্বদাই কড়া নজর রাখতেন, যেন কেউ তাঁদের আগোচরে তাঁর কাছে পৌঁছে ভাঁওতা লাগিয়ে কিছু মেরে নিয়ে না যায়। আমরা পরে শুনেছিলুম যে, সেই বাঙালী ইঞ্জিনিয়ারের কাছ থেকে হতাশ হয়ে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের বাড়িতে ঢুকেছি, এই সংবাদ পেয়েই ইঞ্জিনিয়ার সাহেব ছুটতে ছুটতে এসেছিলেন—আমাদের কবল থেকে তাঁকে রক্ষা করবার জন্যে।

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের নাম ছিল মিস্টার গয়ারাম। তাঁর লম্বা চুল-দাড়ি দেখে প্রথম দর্শনেই তাঁকে শিখসম্প্রদায়ের লোক ব'লে মনে হয়েছিল; কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, শিখের নাম গয়ারাম হওয়া সম্ভব নয়। আমার বিশ্বাস, তিনি বিশেষ কোন ধর্মসম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন না। সংসারে সবচেয়ে বড় ধর্ম হচ্ছে মনুষ্যত্ব—তিনি সেই মনুষ্যত্বে বিশ্বাস করতেন।

জীবনযাত্রার প্রাক্কালে আমরা যে মহাপুরুষের দর্শনলাভ করেছিলুম, আজ জীবন-সন্ধ্যায় বিশেষ ক'রে তাঁকে স্মরণ ক'রে বলি—হে মহাত্মন্! আজ হতে প্রায় অর্ধ শতাব্দী পূর্বে যে দুটি দীন ও তুচ্ছ বাঙালী-বালক কম্পিত হৃদয়ে সাহায্যের জন্যে আপনার দ্বারে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল, দুঃখে সুখে তাদের দিন কেটে গিয়েছে। তাদের মধ্যে একজন মধ্যপথেই বিদায় নিয়েছে, আর একজন পথের শেষে এসে অতিক্রান্ত অতীতের দিকে চেয়ে আপনাকে স্মরণ করছে। সেদিন তাদের জীবনে নেমেছিল ঘোর অন্ধকার, আশ্রয়দাতা হয়েছিল বিমুখ, বন্ধুরা নির্দয়ভাবে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল—সমস্ত সংসার বিকটমূর্তি ধ'রে তাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল। হঠাৎ পৃথিবীর সেই বীভৎস মরুদাহে জীবন-লতা যখন শুষ্কপ্রায়, তখন দুর্দিনের সেই দারুণ দিনে আপনাকে অবলম্বন ক'রে ঈশ্বরের যে করুণাধারা তাদের ওপর বর্ষিত হয়েছিল, সে কথা তারা কোনদিন

ভোলে নি। তাদের চিত্তাকাশে সে স্মৃতি চিরদিন ধ্রুবতারার মতই জলজল করেছে। যতবার তা স্মরণ করেছি, ততবার কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধায় নত হয়েছি। আজ বিদায়বেলায় বিশেষ ক'রে তাঁকে প্রণাম জানাচ্ছি।

পণ্ডিতজী নেমে যেতেই কোচোয়ান গাড়ি ঘুরিয়ে একটা গাছের ছায়ায় নিয়ে গিয়ে ঘোড়া খুলে দিলে। আমরা ব'সে আছি তো আছিই—আপিসে কত রকম লোক যাতায়াত করছে দেখছি। একবার দেখলুম, আমাদের সেই বাঙালী ইঞ্জিনিয়ার মশাই পাশ দিয়ে গাড়ি ক'রে চ'লে গেলেন। ব'সে ব'সে ঢুলুনি এসে গেল। তখন দিনে ঘুম এমন সাধা ছিল না, তবুও দুজনে এক ঘুম দিয়ে উঠলুম। কিন্তু তখনও দেখি, কোচোয়ান গাড়ির ছাতে নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছে আর ঘোড়া দুটো নিশ্চিন্ত মনে ঘাস চিবুচ্ছে, ঘুমের ঝোঁকে দুপুরটাও যেন অনেকখানি গড়িয়ে গেছে।

আরও কিছুক্ষণ এমনি নিশ্চিন্তভাবেই কেটে গেল। খানিকটা সময় পরে সহিস গাড়িতে ঘোড়া জুতলে ও যেখানে পণ্ডিতজীকে নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল তারই কাছাকাছি গাড়িখানা আবার এনে রাখলে। তখনও আমরা ব'সে আছি তো ব'সেই আছি। আরও কিছুক্ষণ বাদে পণ্ডিতজী হন্তদন্ত হয়ে এসে গাড়িতে চড়লেন। গাড়িতে উঠেই তিনি সেই আগের মতন হাসতে হাসতে বললেন, তোমাদের অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখে কষ্ট দিলুম। তোমাদের পাঠিয়ে দিতে পারতুম, কিন্তু আগে যে পাঠিয়ে দিই নি তার কারণ বাড়িতে তোমাদের তো কেউ চেনে না। এ অবস্থায় সেখানে গিয়ে অসুবিধা হ'ত। খুব কষ্ট হয় নি তো?

বললুম, না, কষ্ট কিসের! দিব্যি গাড়িতে ব'সে নানা রকমের লোক দেখতে দেখতে সময়টা কেটে গেল।

যা হোক, গাড়ি অনেক রাস্তা ঘুরে ঘুরে একটা বাড়ির দরজায় এসে দাঁড়াল। নদীর খুব কাছেই বাড়িটা। অনেকখানি জমির মধ্যে বাগান, তার চারপাশ

পাথরের দেয়াল দিয়ে ঘেরা, সেই জমির মধ্যে একটা কোণে বাড়ি—অনেকটা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের বাড়ির মতনই দেখতে।

পণ্ডিতজীর সঙ্গে আমরা দরজার কাছে আসতেই দেখলুম, একটি বারো-তেরো বছরের প্রিয়দর্শন ছেলে সেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ছেলেটির চুল-ছাঁটাই, পোশাক ও হালচাল দেখলেই মনে হয় যেন ফিরিঙ্গীর ছেলে। পণ্ডিতজীকে দেখেই সে ছুটে এসে তাঁর হাত ধরলে, তারপর আমাদের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলে, এরা কারা বাবা?

পণ্ডিতজী হাসতে হাসতে ছেলেকে নিয়ে বাড়ির ভেতরে ঢুকলেন। আমরাও তাঁর পিছু পিছু চললুম।

বাড়ির মধ্যে ঢুকে মনে হ'ল, বেশ বড় বাড়ি—প্রায় ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের মতন বললেই হয়। ওপরে উঠেই একটা বড় হল। সেখানকার আসবাবপত্র সব ইংরেজী কায়দায় সাজানো। শুধু ঘরের মাঝখানে ছাতের সিলিং থেকে একটা কাঠের দোলনা ঝুলছে। সে রকম দোলনা গুজরাটী ও মারাঠীদের বাড়িতেই শুধু দেখতে পাওয়া যায়। আমরা গোয়ালিয়রে অনেক বড়লোকের বাড়িতেও এই রকম দোলনার নানারকম সংস্করণ দেখেছিলুম। কিন্তু এত সুন্দর ও এত কারুকার্যমণ্ডিত দোলনা সেখানেও দেখি নি। এই রকম একটা কাঠের দোলনা একবার জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে রবীন্দ্রনাথের ঘরে দেখেছিলুম। শুনেছিলুম, কে যেন সেটা তাঁকে উপহার দিয়েছে।

যাই হোক, আমাদের সেখানে বসতে ব'লে পণ্ডিতজী ছেলের হাত ধ'রে আর এক দিকে চ'লে গেলেন।

আমরা ড্রয়িং-রুমে ব'সে রইলুম। দেশী ও বিলেতী দুই কায়দা মিলিয়ে ড্রয়িং-রুম সাজানো। দেওয়ালে অনেক ছবি টাঙানো রয়েছে, তার মধ্যে বিলিতী ছবিই বেশি—দু-চারখানা রবি বর্মার ছবিও আছে। এ ছাড়া অনেকগুলি বড় বড় ব্রোমাইড ফোটোও দেখলুম। এই ছবিগুলি সবই ইয়োরোপীয় নরনারীর। আশ্চর্যের বিষয়, এর মধ্যে একখানিও দেশী লোকের

ছবি নেই। আমরা দেওয়ালের কাছে গিয়ে ছবিগুলি দেখছি—এমন সময় পণ্ডিতজী ছেলের হাত ধ'রে একেবারে ভোল ফিরিয়ে এসে উপস্থিত হলেন। খালি গায়ে একখানা রেশমের চাদর জড়ানো, পরনে একখানা ঘরে-কাচা ধুতি, খালি পা। আমাদের কাছে ডেকে নিয়ে সস্নেহে বললেন, তোমাদের সঙ্গে ভাল ক'রে আলাপ করা হয় নি—সে জন্যে আশা করি কিছু মনে করবে না। এতক্ষণে আমার অবসর হ'ল। আমাকে সেই সকাল ন'টার সময় বেরুতে হয় আর বেলা দুটোর আগে আপিসের কাজ শেষ করতে পারি না। এই সময়টা এমন ব্যস্ত থাকতে হয় যে, পাশে কি হচ্ছে দেখবার সময় পাই না। এর মধ্যে আবার মাঝে মাঝে মফস্বলে যেতে হয় তদারকের কাজে। কিন্তু যাক সে সব কথা—

ব'লেই একটু থেমে আবার শুরু করলেন, তোমার নাম কি ?

নাম বললুম।

তারপরে সুকান্তকে বললেন, তোমার নাম ?

সুকান্ত নাম বললে।

পণ্ডিতজী বললেন, আমার নাম অম্বাপ্রসাদ পণ্ডিত। তারপরে, তোমাদের বাড়িতে কে আছেন ?

বললুম, বাড়িতে সবাই আছেন, কিন্তু আমরা চাই নিজের পায়ে দাঁড়াতে, বাড়ির কারুর সাহায্য ব্যতিরেকে।

পণ্ডিতজী সেই রকম ঘর-ফাটানো উচ্চহাস্যে ঘর ফাটিয়ে চারিদিক কাঁপিয়ে তুলে বললেন, বেশ বেশ—ভারি খুশি হলুম তোমাদের সঙ্কল্প শুনে। এই তো চাই। আচ্ছা, আর কোন প্রশ্ন ক'রে তোমাদের বিব্রত করতে চাই না। এখন আমার ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে তোমাদের আলাপ করিয়ে দিচ্ছি। এই আমার ছেলে, এর নাম শঙ্করপ্রসাদ পণ্ডিত। এরা পাহাড়ে থাকে ও সেখানকার ইংরেজদের ইস্কুলে পড়ে। এখানে ভাল ইস্কুল নেই, তাই সেখানে দিতে হয়েছে। আসছে বছরে এরা ভাই বোন দুজনেই ইংলণ্ডে যাবে পড়তে। সেখানকার ইস্কুলের সঙ্গে চিঠিপত্র চলছে, আমি গিয়ে ওদের ভর্তি ক'রে দিয়ে আসব।

এই অবধি ব'লে তিনি ছেলেকে জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায়, তোমার বোন কোথায় ?

ছেলে তার মাতৃভাষায় কি বললে, বুঝতে পারলুম না। পণ্ডিতজী ডাকতে লাগলেন, দেবী—দেবী—

কিছুক্ষণ ডাকাডাকি করবার পর নিঃশব্দে দরজার কাছে একটি মেয়ে এসে দাঁড়াল। আমার চোখ দুটো এতক্ষণ তৃষ্ণাতুর পাখির মতন কোন কিশোরীর আগমন-প্রতীক্ষায় পথ চেয়ে ছিল, হঠাৎ সেই পথে যে এসে দাঁড়াল, প্রথম দৃষ্টিতে তাকে মনে হ'ল অপূর্ব সুন্দরী—এ দৃশ্য আগে কখনও চোখে পড়ে নি। একবার মনে হ'ল, দেওয়ালে টাঙানো রবি বর্মার কোন ছবি প্রাণ পেয়ে বুঝি চোখের সামনে এসে দাঁড়াল।

দীর্ঘাঙ্গী কিশোরী, ভারতীয় নারীর পক্ষে অসামান্যা গৌরী। ভারতীয়ের পক্ষে ঈষৎ লালবর্ণ, সুবিন্যস্ত ঘন কেশ ঘাড় অবধি ঝুলে রয়েছে। সে অপূর্ব লাবণ্যমণ্ডিত তনুলতা দেখলে মুনিজনেরও চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। কিশোরী হ'লে কি হবে, তার দেহসৌন্দর্য দেখে অকালেই যৌবন এসে তাকে আক্রমণ করেছে। কালোর ওপরে নানা রঙের রেশমের সুতোর কাজ করা একটি মারাঠি জামা তার গায়ে, আর পরনে একখানা লাল শাড়ি মারাঠী ধরনে অর্থাৎ কাছাকোঁচা দিয়ে পরা। আমি কলকাতা, বেনারস, গোয়ালিয়র ও অন্যান্য অনেক জায়গায় ইতিপূর্বে কাছাকোঁচা লাগানো মেয়ে দেখেছি। সত্যি বলতে কি, এই রকম ক'রে শাড়ি পরা আমার চোখে অত্যন্ত অভদ্র ও অসুন্দর মনে হয়েছে। একটি মারাত্মক প্যাঁচ মেরে বিধাতা আমার সে ভুল ভেঙে দিলেন। শাড়ি যেমন ক'রেই পরা হোক না কেন, ভদ্র অভদ্র সুন্দর অসুন্দর সবই নির্ভর করে কে পরেছে তার ওপরে। যাই হোক, দিব্যাঙ্গনা তো এসে দাঁড়ালেন এই পাপচক্ষুর সম্মুখে, কিন্তু তার সমস্ত শরীরেই যেন উড়ি-উড়ি ভাব। হাতে একটা পেন্সিল ছিল সেটা একবার গালে ঠেকিয়েই মারাঠী ভাষায় জিজ্ঞাসা করলে, বাবা, আমায় ডাকছ ?

আমরা যে এই নতুন লোক দুটি বাবার পাশেই ব'সে রয়েছি, সে দিকে দৃষ্টিমাত্র না দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে শঙ্করকে কি একটা প্রশ্ন করলে। আমি তো আগে থাকতেই অর্থাৎ দৃষ্টিপথে দেবী উদয় হবার আগেই সে দিকে তাকিয়ে ছিলুম—হঠাৎ আমার দিকে চেয়ে বোধ হয় ওই রকম অসভ্যের মতন তাকিয়ে আছি দেখে তিরস্কারস্বরূপ চোখে একটা ভ্রূকুটি হেনে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে আবার জিজ্ঞাসা করলে, বাবা, ডাকছ কেন, বল ?

পণ্ডিতজী হাস্যমুখে বললেন, হ্যাঁ বাবা, ডাকছিলুম তোমায়। তোমার সেই কলকাতার কথা মনে আছে ? তখন তুমি খুব ছোট, তবুও একেবারে ভুলে যেতে নাও পার কলকাতা শহরের কথা। এদের বাড়ি সেই কলকাতায়। এদের সঙ্গে তোমার ভাব করিয়ে দিই এস। কলকাতায় এখন কত মজার কাণ্ড হচ্ছে—এদের কাছে শোন সেই সব কথা।

দেবী আবার দয়া ক'রে চাইলেন আমাদের ওপর। চোখে আবার সেই ভ্রূকুটি ফুটে উঠল—এই ছোঁড়াগুলোর সঙ্গে ভাব করবার জন্যে আমায় ডাকা ! বাবা যেন কি !

তারপর পরিষ্কার ইংরেজী সুরে ও ভাষায় বাবাকে বললে, বাবা, আমি এখন ভয়ানক ব্যস্ত আছি। একটা শক্ত অঙ্ক কিছুতেই ঠিক হচ্ছে না, সেটাকে ঠিক না ক'রে কোন দিকে মন দিতে পারছি না।

স্খলিত আঁচলখানা দিয়ে কোনরকমে দেহলতাকে জড়িয়ে নেবার চেষ্টা করতে করতে যেমন সহসা দেবীর আগমন হয়েছিল, তেমনি বেগে প্রস্থান হ'ল।

মেয়ে চ'লে যেতেই পণ্ডিতজী আবার সেই রকম হো-হো ক'রে হেসে বললেন, পাগলী ! ওকে প্রথমে দেখলে মনে হয়, বোধ হয় খুবই গর্বিতা, কিন্তু মোটেই তা নয়—দু-এক দিনের মধ্যেই বুঝতে পারবে যে, ও অত্যন্ত সরল, তবে একটু খেয়ালী। দেখ না, এখন অঙ্ক মাথায় ঢুকেছে আর কোন দিকেই মন নেই।

একটু পরেই একজন চাকর এসে জানালে যে, খাবার তৈরি। পণ্ডিতজী

শঙ্করের হাত ধ'রে উঠে বললেন, চল, যাওয়া যাক। দেখ, আমি সকালবেলা বেরুবার সময় ভাল ক'রে খেয়ে যাবার সময় পাই না, সমস্ত দিন বাদে এই একবার খাই—রাত্রে সামান্য একটু খাই—চল, যাওয়া যাক, তোমরাও নিশ্চই ক্ষুধার্ত !

আমি বললুম, আমরা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের ওখানে ভরপেট খেয়েছি, এখন খাবার কোনও স্পৃহা নেই।

পণ্ডিতজী আবার সেই রকম হেসে বললেন, আরে, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের ওখানে খেয়েছ তো কি হয়েছে ? আচ্ছা, চল, না খাও তো অন্তত আমাকে সঙ্গদান করবে।

ড্রয়িং-রুম থেকে উঠে আমরা অপেক্ষাকৃত ছোট একটা ঘরে গিয়ে উপস্থিত হলুম। দেখেই বোঝা যায়, সেটি খাবার-ঘর। বড় একটা খাবার-টেবিল ঘরের মাঝখানে—তার চারিদিকে চেয়ার সাজানো। দু দিকের দুই দেওয়াল ঘেঁষে দুটো বড় বড় সাইডবোর্ড রয়েছে। তার ওপরে কাচের ডিনার-সেট সাজানো রয়েছে। টেবিলের মাঝখানে বড় সুদৃশ্য কাচের ফুলদানিতে নানা রঙের ফুল সাজানো।

পণ্ডিতজী নিজে ব'সে আমাদের বললেন, ব'স।

আমরা বসলুম। শঙ্কর তার বাপের পাশেই একটা চেয়ারে ব'সে কি সব বলতে লাগল। খানসামা এসে আমাদের প্রত্যেকের সামনেই একটা ক'রে কাচের প্লেট রেখে গেল। আমার কিন্তু সেদিকে হুঁশ ছিল না। আমি ভাবছিলুম, মানুষের ভাগ্য কি অদ্ভুত রহস্যে আবৃত! এই আমি কালই নোভাসারির পথে পথে 'ভিক্ষা দাও' ক'রে ঘুরে বেরিয়েছি—একটা লোকেরও দয়া হয় নি, কেউ সহানুভূতির সঙ্গে একবার জিজ্ঞাসাও করে নি—তোমার বাড়ি কোথায়, কি চাই, কেন তোমার এমন অবস্থা! গভীর রাত্রে জ্বরের ঘোরে অজ্ঞানপ্রায় হয়ে সেই অন্ধকারে অজানা দেশে প'ড়ে মরছিলুম,—দুর্ভাগ্যের দূত সেখানে এসেও হানা দিতে ছাড়ে নি। আর আজ ভাগ্যলক্ষ্মী এ কি খেলা শুরু করেছেন !

ঠন্ ক'রে আওয়াজ হতে সম্বিৎ ফিরে পেয়ে চেয়ে দেখি, আমার পাতে মোটা গোল একখানা সম্ভভাজা পরোটা—যাকে কলকাতায় ঢাকাই পরোটা বলে—প'ড়ে লুটোপুটি খাচ্ছে।

পণ্ডিতজীর দিকে চাইতেই তিনি বললেন, খাও, ম্যাজিস্ট্রেটের বাড়িতে খেয়েছ, ও তো অনেকক্ষণ হয়ে গেছে। ছেলেমানুষ তোমরা, ওটুকু খেলে কোন ক্ষতি হবে না।

খেতে খেতে পণ্ডিতজী গল্প করতে লাগলেন। বললেন, আমি জানি তোমরা আমিষ খাও। নিরামিষ খেতে তোমাদের অসুবিধা হচ্ছে তো?

বললুম, এ দেশে নিরামিষ খেয়ে খেয়ে আমাদের অভ্যেস হয়ে গেছে।

পণ্ডিতজী বললেন, আমাদের বাড়িতে মাছ-মাংস হয়।

এই কথা ব'লে তিনি তখুনি খানসামাকে ডেকে বললেন, দেখ, আমাদের এখানে দুজন মেহমান এসেছেন, এঁদের জন্যে মাছ-মাংস করবে। বাংলা দেশের লোক এঁরা।

খানসামা চ'লে যেতেই বললেন, আমি আগে মাছ-মাংস সবই খেতুম। অনেক দিন হ'ল ছেড়ে দিয়েছি। কিন্তু আমার ছেলেমেয়েরা মাছ-মাংস খায়।

বললুম, আমি কিন্তু জানতুম যে মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণেরা মাছ-মাংস খান না।

পণ্ডিতজী টপ ক'রে বললেন, আমরা তো মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ নই। আমাদের দেশ হচ্ছে সেই যোধপুর ও পাঞ্জাবের সীমান্তে। আমাদের কোন পূর্বপুরুষ ইংরেজরা আসবার অনেক আগে সে দেশ কোন কারণে ছেড়ে এখানে এসে বসবাস আরম্ভ করেছিলেন। মূলত আমরা গৌড়-সারস্বত ব্রাহ্মণ। আমাদের আদি বাড়ি হচ্ছে কাশ্মীর দেশে। যাঁরা এ দেশে এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ মহারাষ্ট্রদের ঘরে বিবাহ ক'রে একেবারে এ-দেশীয় ব'নে গিয়েছেন। আমার ঠাকুরদাই তো মহারাষ্ট্রীয় বিবাহ করেছিলেন। তিনি খুব বড় উকিল ছিলেন, দু-তিনবার বিলেতেও গিয়েছিলেন। ইংরেজদের সঙ্গে খুব মেলামেশা করতেন। তিনিই আমাদের পরিবারে মাছ-মাংস খাওয়ার প্রথা চালিয়ে

গিয়েছেন। মহারাষ্ট্রীয়েরা এ বিষয়ে অত্যন্ত গোঁড়া, এ জন্যে আমার ঠাকুরদার সঙ্গে ঠাকুরমার বনিবনাও হ'ত না। আমার বাবাও মাছ-মাংস খাওয়ায় খুবই ওস্তাদ হয়ে উঠেছিলেন এবং মহারাষ্ট্রীয়দের ঘরে বিবাহ করলে পাছে স্বামী-স্ত্রীতে অবনিবনা হয় সেজন্যে ঠাকুরদা মশায় বাবার বিয়ে দিয়েছিলেন পাঞ্জাবী মেয়ের সঙ্গে। আমিও পাঞ্জাবী মেয়ে বিবাহ করেছিলাম। পাঞ্জাবীরা মাছ-মাংস খাওয়া সম্বন্ধে অনেক বেশি উদার।

আমি বললুম, মহারাষ্ট্রীয়েরা যে মাছ-মাংস খায় না সে আমি খুব ভাল ক'রেই জানি এবং এ বিষয়ে আমার খুব তিক্ত অভিজ্ঞতা আছে।

পণ্ডিতজী বললেন, তাই নাকি! কি রকম, কি রকম! শুনি তোমার অভিজ্ঞতা!

ইতিমধ্যে পাতে আরও পরোটা ও দু-তিন রকম নিরামিষ তরকারি এসে পড়ল। কিছু কিছু মিষ্টিও আসতে লাগল। সন্দেশ-রসগোল্লার মত সুখাদ্য না হ'লেও সেদিন তা ভালই লাগতে লাগল। খেতে খেতে আমি আমাদের গোয়ালিয়রে চাকরি করার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে লাগলুম। তারপরে আমাদের মাছ-মাংস খাওয়ার কথা শুনে সে বাড়ির বড় গিন্নী কি রকম 'দূর হ, দূর হ' বলতে বলতে ঝাঁটা বার করেছিল ও তারপরে বিনায়কের মাথায় কি রকম ক'রে হাঁড়িভর্তি গোবরজল ঢেলে দিয়েছিল—এই সব শুনে পণ্ডিতজী তো ঘর ফাটিয়ে টেবিল চাপড়ে হো-হো ক'রে হাসতে আরম্ভ ক'রে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে শঙ্করও হাসতে লাগল।

পণ্ডিতজী সেই রকম হাসতে হাসতে চেঁচাতে লাগলেন, দেবী, দেবী—

কিন্তু দেবীর কোন সাড়া পাওয়া গেল না। পণ্ডিতজী বললেন, আহা, দেবী থাকলে সে তোমার এই কাহিনী খুবই উপভোগ করত।

তারপরে হাসতে হাসতে বললেন, ঠিক বলেছ, ওরা মাছ মাংস সম্বন্ধে এই রকমই বটে।

খাওয়া-দাওয়া শেষ ক'রে টেবিল থেকে ওঠবার আগেই আমরা পণ্ডিতজীর

বাড়ির লোকদের মধ্যে গণ্য হয়ে গেলুম। তিনি বললেন, এ বাড়িকে তোমাদের আপনার বাড়ি ব'লে মনে করবে। আমার এই অসহায় মাতৃহীন ছেলে-মেয়েকে তোমরা নিজেদের ভাই-বোন ব'লে মনে ক'রো।

পণ্ডিতজীর কথা বলবার ধরন শুনে আমাদের চোখে জল এসে গেল। তিনি বললেন, এখন আমি ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম করব। তারপরে সেই সাড়ে সাতটা পর্যন্ত আমি আর কারুর সঙ্গে দেখা করি না—এ সময়টা আমি আমার মালিকের সঙ্গে একত্রে কাটাই। আচ্ছা, আবার সেই সন্ধ্যের পরে দেখা হবে।

এই কথা ব'লে তিনি শঙ্করকে বললেন, এদের বাড়ির সব জায়গা দেখাও।

পণ্ডিতজী নিজের ঘরে চ'লে গেলেন। শঙ্করের সঙ্গে আবার আমরা ড্রয়িং-রুমে ফিরে এলুম। ড্রয়িং-রুমের এক দিকে সুন্দর কারুকার্য করা কাঠের তাকে সব বই সাজানো ছিল—এরই মধ্যে একটা তাক মোটা মোটা অ্যালবামে ভর্তি। শঙ্কর আমাদের জিজ্ঞাসা করলে, ছবি দেখবে?

উত্তরের জন্যে আর অপেক্ষা না ক'রেই সে একটা অ্যালবাম টেনে বার ক'রে বললে, চল, ওখানে বসি।

তিনজনে একটা জায়গায় গিয়ে ব'সে ছবি দেখতে আরম্ভ করা গেল। শঙ্কর একটা পাতা ওলটায় আর এক-একটা ফোটোগ্রাফের বিবরণ দিতে আরম্ভ করে। এক পাতার বিবরণ শেষ হতে না হতে তার সেই অদ্ভুত হিন্দী ভাষার দম ফুরিয়ে এল। মারাঠী ভাষা সে জানে—মা পাঞ্জাবী মেয়ে হ'লেও মারাঠীই ছিল তাদের মাতৃভাষা। মার কাছ থেকে পাঞ্জাবী ভাষা শেখবার আগেই তিনি ইহলোক থেকে বিদায় নিয়েছিলেন। আমরা হিন্দী ভাষা কতকটা বুঝতে পারি ব'লে এতক্ষণ সে হিন্দীতেই কথাবার্তা চালিয়ে যাচ্ছিল; কিন্তু এবার আর না পেরে সে ইংরেজী ভাষায় বলতে আরম্ভ করলে। দেখলুম, সে চমৎকার ইংরেজী বলতে পারে। তখন তার তেরো বছর বয়স। ছ'বছর বয়স থেকে সে মুসৌরিতে ইংরেজদের ইস্কুলে পড়ছে। তার দিদিও একই সঙ্গে ইস্কুলে ভর্তি হয়। সে সময় তার দিদির বয়স দশ বছর ছিল। তারা ইস্কুলে যাবার

বছর দুই আগে তার মা মারা যান—মাকে তাদের একটু একটু মনে আছে। শঙ্কর বললে, আগামী বছর সে জুনিয়ার পরীক্ষা দেবে। তার দিদি জুনিয়ার পাস করেছে, এই বছরই সে সিনিয়ার পরীক্ষা দেবে। ছবি দেখাতে আর দেখতে দেখতে এই সব গল্প হতে লাগল।

এক-একটা পাতা পণ্ডিতজীর ছবিতেই ভর্তি। পণ্ডিতজীর বাবা ছেলেবেলাতেই তাঁকে বিলেতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন লেখাপড়া শেখার জন্যে,—সেই ছেলেবয়সেরও অনেক ছবি অ্যালবামে ছিল। পণ্ডিতজী বিলেতে গিয়েছিলেন ছেলেবয়সে এবং দেশে ফিরেছিলেন ত্রিশ বছর বয়সে। শঙ্কর আরও বললে যে, আগামী বছর তার দিদি সিনিয়ার পরীক্ষায় পাস করলে তার বাবা তাদের দুজনকে বিলেতে নিয়ে গিয়ে ইস্কুল ও কলেজে ভর্তি ক'রে দিয়ে আসবেন।

এমনি ক'রে গল্প ও ছবি দেখায় মশগুল হয়ে কোথা দিয়ে সময় কেটে যাচ্ছে—এমন সময় হেলতে দুলতে লীলায়িত ভঙ্গীতে দেবী ঢুকলেন ঘরের ভিতরে। আমরা যেখানে ব'সে ছিলুম তারই একটু দূরে একটা সোফায় সে অঙ্গ এলিয়ে দিলে। মুখে তার প্রসন্ন হাসি—বোধ হয় যে অঙ্কগুলো নিয়ে এতক্ষণ জানমারি চলছিল সেগুলোকে ঘায়েল করা হয়ে গেছে। দেবী আসতেই আমরা মুখ তুলে সেই আসল ছবির দিকে তাকিয়ে রইলুম। কিন্তু বৃথা—সে আমাদের দিকে একবার ভ্রূক্ষেপও করল না। একবার এক সেকেণ্ডের জন্যে চোখাচোখি হতেই দেবী উঠে গিয়ে দূরের তাক থেকে একটা মোটা বই নিয়ে আবার সেই জায়গায় এসে মাথা নীচু ক'রে বইয়ের পাতা উল্‌টে যেতে লাগল। শঙ্কর আগের অ্যালবামখানা রেখে আবার একটা অ্যালবাম নিয়ে এল। এটাতে তার ঠাকুরমা, তার মা ও তাদের পরিবারের আরও অনেক মহিলার ফোটো ছিল। আমরা ছবি দেখছি ও শঙ্কর বকবক্ ক'রে ব'কে চলেছে, এমন সময় দেবী তার জায়গাতে ব'সেই তাকে যেন কি বললে। শঙ্কর মুখ তুলে দেওয়ালের ঘড়িটা দেখে আমাদের বললে, পাঁচটা বেজে গেছে, তোমরা কি চা খাও?

আমরা চা খাই জেনে সে কি বলতেই দেবী উঠে চ'লে গেল। কিছুক্ষণ পরে একজন চাকর এসে বললে, চা তৈরি—চলুন।

আমরা সেখান থেকে উঠে খাবার ঘরের টেবিলে গিয়ে বসলুম—দেখি, দেবী চা তৈরি করছে। তৈরি হয়ে গেলে একটা বয় মতন চাকর আমাদের সামনে কাপ এনে রাখলে। সঙ্গে সঙ্গে দুটো প্লেটে ক'রে দু রকম বিস্কুট ও দুটো-একটা এসে পড়ল। সবার শেষে একটা চায়ের কাপে চামচ ডুবিয়ে সেটা ঘোরাতে ঘোরাতে দেবী এসে টেবিলের এক দিকে বসল। আমরা যেখানে ব'সে ছিলুম, দেবী তা থেকে বেশ খানিকটা দূরে ব'সে আস্তে আস্তে অন্য দিকে চেয়ে কাপে চুমুক দিতে লাগল। ইত্যবসরে আমরা প্লেট থেকে বিস্কুট তুলে নিয়ে খেলুম। দেবীর সঙ্গে কি ক'রে আলাপ করা যায় ভাবছি—এমন সময় সে শঙ্করকে বললে, শঙ্কর, ওঁদের আর চা চাই কি না জিজ্ঞাসা কর।

আমি বললুম, আমায় দয়া ক'রে আর এক কাপ চা দিন।

দেবী আমাকে কোন কথা না ব'লে বয়টাকে বললে, এক কাপ চা ওঁকে দাও।

বয়টা তখুনি আর এক কাপ চা তৈরি ক'রে এনে আমায় দিলে। ভাবছি, আর কি ব'লে আলাপ জমানো যায়, এমন সময় সুকান্তটা ব'লে উঠল, আমাদেরই খাওয়াচ্ছেন—কই, আপনি তো কিছুই খাচ্ছেন না?

সত্যিই দেবী চা ছাড়া আর কিছুই খেলে না। কিন্তু সে সুকান্তর অমন আপ্যায়ন-ভরা কথার কোনও জবাব না দিয়ে সামান্য একটু মাথা নাড়লে মাত্র।

সুকান্তর অবস্থা দেখে কোন রকমে হাসি সামলে নতুন কাপে চুমুক দিতে লাগলুম। যাই হোক, চায়ের পালা বেশ সমারোহের সঙ্গে শেষ হ'ল। একটুমাত্র দুঃখ রইল যে দেবী এখনও কথা বললে না। চা খাওয়ার পর শঙ্কর ও দেবী কোথায় উধাও হয়ে গেল।

আমরা সেদিন আর না বেরিয়ে বাড়িরই এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াতে লাগলুম। দেখতে দেখতে সন্ধ্যা হয়ে এল। চারিদিকে বাতি জ্বালা হতেই আমরা আবার ড্রয়িং-রুমে ফিরে এসে দেখি যে, সেই ঘরের এক কোণে একটি

টেবিলে ব'সে শঙ্কর পড়াশুনো করছে। তাকে আর বিরক্ত না ক'রে তাক থেকে এক-একটা বই টেনে নিয়ে আমরাও নাড়া-চাড়া করতে আরম্ভ ক'রে দিলুম। বাড়ি একেবারে নিঃশব্দ, গোটা দুই-তিন চাকর দেখেছিলুম, কিন্তু তাদেরও কোন সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না; শুধু ড্রয়িং-রূমের বড় ঘড়িটায় সময়ের পদক্ষেপ শুনতে পাওয়া যাচ্ছে—টক্ টক্ টক্, আর আধ ঘণ্টা অন্তর অন্তর সে ঘোষণা ক'রে চলেছে তার দিন-বিক্রান্তির কথা।

কি একটা ছবি তন্ময় হয়ে দেখছিলুম। এবার মুখ তুলতেই দেখি, দেবদূতের মতন পণ্ডিতজী সস্মিত মুখে আমার দিকে দেখছেন। সেদিন তাঁকে প্রায় সমস্ত দিন ধ'রেই দেখেছি—আগেই বলেছি যে, তাঁর চেহারার মধ্যে এমন একটা বৈশিষ্ট্য ছিল যে দেখলেই মনে হ'ত তিনি সাধারণ শ্রেণীর মানুষ নন। কিন্তু সেই রাত্রে মুখ তুলে হঠাৎ তাঁকে দেখে সত্যি সত্যিই মনে হ'ল—মানুষ এমন সুন্দরও হয়!

তাঁর মুখের ওপর—শুধু মুখের ওপরই নয়, আমি যেন স্পষ্ট দেখতে পেলুম যে, তাঁর মুখমণ্ডলকে ঘিরে অতি ক্ষীণপ্রভ একটি জ্যোতি জ্বলজ্বল করছে। দেখলুম, তিনি একদৃষ্টে আমার মুখের দিকে চেয়ে আছেন। প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয়েছিল বটে, মৃদু হাস্যে মুখখানা ঝলমল করছে; কিন্তু পরক্ষণেই মনে হ'ল, ওটা হাসি নয়—তাঁর মুখের ভাবই ওই রকম।

আমি তাঁকে দেখে দাঁড়িয়ে উঠতেই তিনি আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন, ব'স, ব'স।

তারপর তিনিও আমার পাশে ব'সে জিজ্ঞাসা করলেন, চা-টা খেয়েছ কোন অসুবিধা হয় নি তো?

বললাম, চা খেয়েছি।

পণ্ডিতজী বললেন, দেখ, এই বিকালবেলাটা আমি সংসারের কিছুই দেখতে পারি না। শঙ্কর ও দেবী এলে তারাই এই সময়টা সংসার চালায়। ওরা না থাকলে চাকর-বাকর চালায়। ওদেরও তো যাবার সময় হয়ে এল। তোমাদের

এখানে যে কয়দিন এখন থাকতে হচ্ছে, ততদিন তোমরা নিজেরাই দেখে শুনে চালিয়ে নেবে। তোমাদের আবার বলছি যে, এ পরিবারকে তোমরা নিজের পরিবার ব'লে মনে ক'রো।

একটু পরে কোথা থেকে দেবী এল, সে বোধ হয় অন্য কোন ঘরে পড়াশুনো করছিল। দেবী এসেই জিজ্ঞাসা করলে, বাবা, তোমরা কি এখন খাবে?

পণ্ডিতজী মেয়ের কথা শুনে আমাদের জিজ্ঞাসা করলেন, কি বল, এখন খাবে?

এ কথার উত্তরে কি বলা উচিত তাই ভাবছিলুম, কারণ সারাদিনের খাদ্য তখনও পেটে গজ-গজ করছিল—এমন সময় আমাদের হয়ে পণ্ডিতজীই উত্তর দিয়ে দিলেন, আর একটু পরে হ'লে কি তোমাদের অসুবিধা হবে?

দেবী বললে, বেশ, আর একটু পরেই হবে।

পণ্ডিতজী কলকাতার গল্প করতে লাগলেন। কলকাতায় তিনি জীবনে বার-দুয়েক গিয়েছিলেন। সত্যি কথা বলতে কি, কলকাতার চেয়ে বোম্বাই শহর তাঁর ঢের বেশি ভাল লাগে।

জিজ্ঞাসা করলুম, বোম্বাই শহরে কি আপনার বাড়ি আছে?

পণ্ডিতজী বললেন, বোম্বাই শহরে আমাদের বাড়ি ছিল বলতে পার। আমার ঠাকুরদা ও বাবা সেখানে অনেক সম্পত্তি করেছিলেন। কিন্তু বাবা মারা যাবার পর দেখলুম, চাকরি ও সেই সব সম্পত্তি—দুই রক্ষা করা আমার দ্বারা সম্ভব হয়ে উঠবে না। আমি সে সব সম্পত্তি বিক্রি ক'রে দিয়েছি। তা ছাড়া আমার আর বছর পাঁচেক চাকরি আছে—এর পর আমি বাকি জীবনটা ইউরোপে গিয়ে কাটাব স্থির করেছি। ফ্রান্সে আমার জমি কেনা আছে সমুদ্রের ধারে এক জায়গায়। হয় সেখানে বাড়ি করব, নয় তো ইংলণ্ডের কোনও গ্রামে বাড়ি কিনব। কোথায় থাকব তা অনেকখানি নির্ভর করছে ছেলে-মেয়েদের ওপর। ওদের যে জায়গা ভাল লাগবে সেইখানেই আমাকে থাকতে হবে। আমার ইচ্ছা ফ্রান্সেই থাকি। তবে কিছুই বলা যায় না,

আমাদের ইচ্ছার চেয়ে যে অনেক শক্তিশালী আর একটি ইচ্ছা এই জগতের সব কলকাঠি নাড়াচ্ছেন, তাঁর ইচ্ছাতে সবই ঘুরে যেতে পারে—

কথাটা ব'লেই সেই ঘর-ফাটানো উচ্চ হাসি তুললেন।

আমাদের কথার মধ্যে মধ্যে দেবীও দু-একটা কথা বললে বটে, কিন্তু সে তার বাপকে উদ্দেশ ক'রেই বললে। আমাদের উপস্থিতিকে একেবারে আমলই দিলে না। যাই হোক, একটু পরেই খেতে যাওয়া হ'ল। পণ্ডিতজী রাতে খুব কমই খান—একটি বড় কাচের গেলাসের এক গেলাস দুধ ও একখানা চাপাটি একটু জেলি দিয়ে। দেবী ও শঙ্কর পরোটা খেতে লাগল, কিন্তু আমাদের প্রথমে ভাত দেওয়া হ'ল। পণ্ডিতজী বললেন, আমি জানি তোমরা ভাতের ভক্ত। ও-বেলা তোমাদের নিশ্চয়ই খেতে কষ্ট হয়েছিল।

পণ্ডিতজীকে বললুম, খাবার কষ্ট আমরা এত ভোগ করেছি যে, যেমনই খাবার হোক না কেন, সোনা-হেন মুখ ক'রে খেয়ে নিতে পারি। কাজেই খেতে পেলে আর কোন কষ্ট পাই না—কষ্ট হয় না-খেতে পেলে।

কথাটা পণ্ডিতজী খুবই উপভোগ করলেন। তিনি হো-হো ক'রে হেসে বললেন, তবু আমার এখানে যখন আছ তখন তোমাদের কোনও রকমের অসুবিধা না হয় তা দেখতে হবে বইকি!

পরের দিন সকালবেলা উঠে বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়া গেল। আমাদের হঠাৎ এই ভাগ্য-পরিবর্তনের কথা তাদের না-জানানো পর্যন্ত মনটা খুঁতখুঁত করছিল। গিয়ে দেখলুম, আমাদের জন্যে কোন মাথা-ব্যথাই তাদের নেই। আমরা শীগগিরই বোম্বাই শহরে মিলে কাজ শিখতে যাব শুনে তারা হাঁ-না কিছুই বললে না। শুনলুম, জনার্দন তার বাড়িতে টাকার জন্যে চিঠি লিখেছে। টাকা নিশ্চয়ই আসবে, টাকা এলে তারা খুব ফলাও ক'রে ব্যবসা শুরু করবে। দেখলুম, আমরা তাদের দল থেকে খ'সে পড়ায় তারা বেশ আনন্দেই আছে।

তবুও জনার্দনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা চ'লে এলুম। ফিরে

এসে দেখি, পণ্ডিতজী আপিসে বেরিয়ে গিয়েছেন। শুনলুম, তিনি রাত থাকতে ঘুম থেকে উঠে স্নান ক'রে পূজা-অর্চনা শুরু করেন, শেষ হয় সেই বেলা আটটা আন্দাজ। তার পরে একেবারে আপিসের পোশাক প'রে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে চা-জলখাবার খেয়ে বেরিয়ে যান। দুপুরে বাড়ি ফিরে আহারাদি ক'রে নিজের ঘরে শুতে যান। তার পরে কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে বেলা পাঁচটা নাগাদ আবার পূজোয় বসেন—সাতটা, সাড়ে সাতটার আগে উঠে আসেন না। শুনলুম, পণ্ডিতজী যখন ঘুমোন তখন তাঁর ঘরের বিশেষ কয়েকটি জানলা ও দরজা খোলা থাকে এবং যখন পূজোয় বসেন তখনও বিশেষ ক'রে কয়েকটি দরজা-জানলা খোলা হয় বা বন্ধ হয়। এই দরজা-জানলা খোলা ও বন্ধ দেখে তাঁর ছেলেমেয়েরা ও চাকরবাকর বুঝতে পারে, তিনি কি করছেন! কারণ তিনি যখন পূজোয় বসেন তখন তাঁকে ডাকা বারণ।

পণ্ডিতজী একটা বড় ঘরে থাকতেন। ঘরের মধ্যে খানিকটা জায়গা পূজোয় বসবার জন্য নির্দিষ্ট ছিল। জায়গাটিতে একটি বাঘের ছাল পাতা থাকত। কোনো বিশেষ দেবতার ছবি কিংবা মূর্তি সেখানে দেখি নি। সামনে ও আশেপাশে কয়েকটি পুরুষ ও নারীর ব্রোমাইড ছবি টাঙানো ছিল, সেগুলি অধিকাংশই ইউরোপীয়ানদের, দু-একজন মাত্র ভারতবর্ষীয় লোক ছিলেন। পণ্ডিতজীর কাছেই শুনেছিলুম, তাঁরা সকলেই নাকি খুব উঁচুদরের সাধক—এঁদের মধ্যে কেউ কেউ দেহরক্ষা করেছেন, কেউ বা এখনও বেঁচে আছেন। এঁদের সবার নামও বলেছিলেন, কিন্তু সারা জীবন ধ'রে নিজের নাম মনে রাখতে রাখতে তাঁদের নাম ভুলে গিয়েছি। পণ্ডিতজীর ঘরের সামনেই ঠিক পূবমুখো একটু ছোট-গোছের বারান্দা ছিল। তাঁর ঘরের এক পাশে ছোট একটা ঘরে আমাদের থাকবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল, আর এক পাশে বড় একটা ঘরে শঙ্কর ও দেবী রাত্রে শুত।

একদিন সকালবেলা উঠে অদ্ভুত এক দৃশ্য দেখলুম। আমরা চা-পান করবার জন্যে খাবার-ঘরে যাচ্ছি, এমন সময় বারান্দার দিকে চেয়ে দেখি,

পণ্ডিতজী স্থির হয়ে হাতজোড় ক'রে উদীয়মান সূর্যের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর পরনে একখানা রেশমের হালকা গোলাপী রঙের ধুতি, অঙ্গেও সেই রঙেরই একখানা চাদর পৈতের মতন ক'রে পেঁচানো রয়েছে। রক্তাভ-গৌর তাঁর দেহ, তার ওপরে এসে পড়েছে উদীয়মান সূর্যের অরুণালোক—অরুণ মেঘচ্ছায়া যেন প্রতিবিম্বিত হয়েছে স্বচ্ছ স্রোতে। আমার মনে হতে লাগল যেন পুরাকালের কোন এক বৈদিক উষার বন্দনাসূক্তের একটি ঋ হঠাৎ বিভ্রান্ত হয়ে এসে পড়েছে সুরাটের মত এই আধুনিক শহরে। আমাদের চিত্তলোকে যে অদৈহিক আকৃতি ও অরূপের কান্না কাঁদছে, তারই যেন প্রত্যক্ষ রূপ ওই দীপ্ত ব্রহ্মণ্যশ্রী।

সেই দৃশ্য দেখে আমরা আর নড়তে পারলুম না। কি যেন একটা আকর্ষণী শক্তি আমাদের টেনে সেইখানেই বেঁধে রেখে দিলে। পণ্ডিতজীর হাত দুটি যুক্ত, চোখ দুটি খোলা রয়েছে বটে কিন্তু স্থিরদৃষ্টি নিবদ্ধ রয়েছে সেই প্রদীপ্ত সূর্যের পানে। আমি যদি চিত্রকর হতুম তো চিত্রিত ক'রে রেখে দিতুম সেই রূপ। আগ্রায় সত্যদার কাছে শুনেছিলুম বটে যে, তিনি প্রতিদিন সকালবেলা উঠে সূর্যের দিকে চেয়ে থাকেন। সত্যদার সে কথা শুনে মনে হয়েছিল, কোথাও কিছু নেই, খামকা লোকে সূর্যের দিকে চেয়ে থাকতে যাবে কেন? আজ এই ব্রাহ্মণকে দেখে আমাদের ভুল ভাঙল। পণ্ডিতজীর দিক থেকে চোখ আর ফেরাতে পারি না। যত দেখি তত মুগ্ধ হয়ে চেয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। চোখের পলক নেই, হাত-পা বা দেহের কোনো জায়গা একটু নড়ছে না, নিশ্বাস পড়ছে কি পড়ছে না—তা বোঝার উপায় নেই। ধীর স্থির নিস্পন্দ সেই দেহযষ্টি নিষ্কম্প উজ্জ্বল দীপশিখার মতন।

আমরা প্রায় আধ ঘণ্টা ধ'রে দাঁড়িয়ে সে দৃশ্য দেখে নিঃশব্দে সেখান থেকে স'রে এলুম। পরে শঙ্কর ও দেবীর কাছে শুনেছিলুম, তিনি প্রতিদিন প্রায় দু ঘণ্টা ওই রকম সূর্যের দিকে চেয়ে থেকে জপ করেন।

পণ্ডিতজীর বাড়িতে আমাদের দিনগুলি সুখেই কাটতে লাগল। শান্তির

অভাবও সেখানে ছিল না, তবে আমাদের অনির্দিষ্ট ভবিষ্যতের চিন্তা মধ্যে মধ্যে মনকে নাড়া দিত। আমাদের সম্বন্ধে ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের কাছে কোনো চিঠি এল কি-না সে কথা মাঝে মাঝে পণ্ডিতজীকে জিজ্ঞাসা করতুম। কিন্তু তার উত্তরে তিনি তাঁর স্বভাব-সুলভ উচ্চহাসি হেসে বলতেন, ভাবনা কি! চিঠি এলে ইঞ্জিনিয়ার সাহেব নিজেই আমাকে বলবেন—আমাকে আর জিজ্ঞাসা করতে হবে না।

তার পরেই তিনি একটু থেমে আবার বলতেন, এখানে তোমাদের কোনো অসুবিধা হচ্ছে না তো? তোমাদের জামা কাপড় জুতো আছে তো?

অদ্ভুত মানুষ ছিলেন এই পণ্ডিতজী। গৃহস্থের মধ্যেও এমন লোক থাকতে পারে তা এর আগে আমার ধারণা ছিল না। সেখানে থাকতে থাকতে কিছু তাঁর মুখে, কিছু তাঁর ছেলে-মেয়ের কাছে তাঁর পুণ্য জীবনকথা শুনেছিলুম। জীবনও তাঁর ছিল অদ্ভুত।

অনেক দিন আগে পণ্ডিতজীর পূর্বপুরুষের কোন লোক তীর্থ করতে এসে এই দেশেই থেকে গিয়েছিলেন। তাঁরা ছিলেন গৌড়-সারস্বত ব্রাহ্মণ। তখন মারাঠারা সবেমাত্র একটু একটু ক'রে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। গৌড়-সারস্বত ব্রাহ্মণেরা তখন ভারতবর্ষময় নিজেদের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার জন্যে প্রসিদ্ধ ছিলেন। আমাদের পণ্ডিতজীর পূর্বপুরুষ মারাঠাদের রাজসরকারে সামান্য কাজে ঢুকে বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার বলে অসামান্য হয়ে উঠেছিলেন। ক্রমে তাঁদের বংশ বৃদ্ধি পেতে লাগল। কেউ কেউ আর্যাবর্তে এসে নিজের জাতে বিবাহ করতেন, কেউ বা মহারাষ্ট্রীয়দের ঘরে বিবাহ করতেন। কারুর বা একাধিক স্ত্রী থাকত—তাঁদের মধ্যে কেউ বা গৌড়-সারস্বত ব্রাহ্মণের মেয়ে, কেউ বা মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণের মেয়ে। এমনও হয়েছে যে, কেউ বা সুন্দরী মেয়ে, কিন্তু ব্রাহ্মণের মেয়ে নয়। এমনি ক'রে চলেছিল। ইংরেজরা এ দেশ অধিকার করার পর এদেরই এক পরিবার ইংরেজী লেখাপড়ার দিকে ঝুঁকে পড়ল। এই পরিবারের বংশধর হচ্ছেন আমাদের পণ্ডিতজী। তাঁর পিতা ইংরেজ সরকারে

কাজ করতেন এবং কিছু পয়সাকড়িও তিনি ক'রে গিয়েছিলেন। পণ্ডিতজী ইংলণ্ড থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পাস ক'রে ফ্রান্সে চাকরি গ্রহণ করেন। ফ্রান্সে চাকরির সময়ে তিনি সেখানকার একদল স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্কে এসেছিলেন—যাঁরা গোপনে ভারতীয় যোগসাধনা অভ্যাস করতেন। ফরাসী দেশে ব'সে বিদেশীদের সঙ্গে মিলে যখন তিনি যোগসাধনায় মগ্ন, ঠিক সেই সময় দেশ থেকে খবর গেল যে, তাঁর বৃদ্ধ পিতা-মাতা অত্যন্ত অসুস্থ এবং অবিলম্বে এখানে না এলে তাঁদে সঙ্গে বোধ হয় আর দেখা হবে না। যোগ করলেও পিতা-মাতার প্রতি মমত্ব ও সাংসারিক কর্তব্যবোধ তাঁর একেবারে রহিত হয়ে যায় নি—তাই পত্রপাঠমাত্র তিনি বৃদ্ধ পিতা-মাতার কাছে ফিরে এলেন।

পণ্ডিতজী স্থির করেছিলেন, পিতামাতার মৃত্যুর পর তিনি আবার ফ্রান্সে ফিরে যাবেন এবং সেখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস করবেন, কিন্তু প্রজাপতির ব্যবস্থা ছিল অন্য রকম। তিনি যে জাহাজে ক'রে ভারতবর্ষে ফিরছিলেন, সেই জাহাজেই একটি পাঞ্জাবী ভদ্রলোক তাঁর একমাত্র রূপসী দুহিতাকে নিয়ে ইউরোপ সফর ক'রে দেশে ফিরছিলেন। ফলে উভয়ের সাক্ষাৎ, আলাপ-পরিচয়, প্রেম এবং ভারতবর্ষে পৌছতে না পৌছতেই বিবাহ। পণ্ডিতজীর বাবা মা ইউরোপের গ্রাস থেকে ছেলে ফিরে চেয়েছিলেন, কিন্তু পেয়ে গেলেন একেবারে ছেলে বউ। পুত্রবধূ অন্য জাতের হওয়ায় মন খুঁতখুঁত প্রকাশ করবার আগেই তাঁরা ইহলোক থেকে বিদায় নিলেন। পিতা-মাতার মৃত্যুর পর জায়গা-জমি বেচে দিয়ে তিনি আবার ইউরোপ যাত্রা করবার ব্যবস্থা করেছিলেন, কিন্তু স্ত্রী বাধা দেওয়ায় এখানেই তাঁকে চাকরি নিয়ে ব'সে যেতে হ'ল। স্ত্রীর ইচ্ছানুসারে পণ্ডিতজী ঠিক করেছিলেন ভারতবর্ষেই শেষ জীবন যাপন করবেন; কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই দুটি সন্তান রেখে স্ত্রী মারা যেতে তিনি আবার প্ল্যান বদলে ফেললেন। এবারে তিনি ঠিক করলেন, চাকরি শেষ হয়ে গেলে ছেলে ও মেয়েকে নিয়ে ফ্রান্সে ফিরে যাবেন এবং শেষ জীবনটা সেখানেই বসবাস করবেন।

প্রায় প্রতিদিনই সন্ধ্যার কিছু পরে তাঁর পূজা প্রার্থনা ইত্যাদি সেরে তিনি তাঁর ছেলে মেয়ে ও আমাদের নিয়ে গল্প করতে বসতেন। রাত্রে খাওয়ার পরেও প্রায় দেড় ঘণ্টা কি দু ঘণ্টা ধ'রে আমাদের সেই আসর চলতে থাকত।

পণ্ডিতজী অনেক বিভূতির অধিকারী হয়েছিলেন। তিনি একটু চেষ্টা করলেই লোকের মনের কথা জানতে পারতেন। হাত কিংবা কোষ্ঠী না দেখে চোখ বুজে মানুষের ভূত-ভবিষ্যৎ প্রায় নির্ভুল ব'লে দিতে পারতেন। আমার ভবিষ্যতে কি হবে সে কথা যতবার জিজ্ঞাসা করেছি, তিনি হেসে পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়েছেন। সুকান্তও অনেকবার তার নিজের ভবিষ্যতের কথা জানতে

চেয়েছিল, কিন্তু তিনি সেই রকম মধুর হাসি হেসে তার পিঠে হাত বুলিয়ে দিতেন।

একদিন পণ্ডিতজী আমাদের একটা অদ্ভুত কাণ্ড দেখিয়েছিলেন। সেদিন সন্ধ্যার অনেক আগেই তাঁর পূজা শেষ হয়ে যাওয়ায় আমাদের নিয়ে বাগানের দিকের একটা বারান্দায় ব'সে গল্প করছিলেন। ভারতবর্ষে কিছুদিন পূর্বেও অর্থাৎ দু-তিন শো বছর আগে পর্যন্ত কত বড় বড় সব যোগী ছিলেন—তারই কথা হচ্ছিল। তাঁদের সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক কাহিনীর কথা বলতে বলতে তিনি বললেন, মানুষ জানে না যে প্রকৃতিকে সম্পূর্ণরূপে জয় করবার শক্তি মানুষের মধ্যেই লুকিয়ে আছে। সাধনা দ্বারা সেই শক্তির বিকাশ হয়। মানুষ শূন্যের মধ্যে দিয়ে উড়ে চ'লে যেতে পারে, অতি অল্প সময়ের মধ্যেই এক দেশ থেকে অন্য দেশে চ'লে যাওয়া তার পক্ষে কিছুই নয়। জঙ্গলের মধ্যে হিংস্র প্রাণীদের বশ করা তো তার পক্ষে কিছুই নয়। পণ্ডিতজী বলতেন, আমার বিশ্বাস—মানুষ একদিন সর্বশক্তিমান হবে।

সুকান্ত ফট ক'রে জিজ্ঞাসা ক'রে ফেললে—আচ্ছা পণ্ডিতজী, আপনি যে এতদিন ধ'রে সাধনা করেছেন—আপনি কোন বিভূতি পান নি? হিংস্র জানোয়ার বশ করতে পারেন?

পণ্ডিতজী তাঁর স্বভাবসুলভ হো-হো ক'রে হেসে বললেন, আমি? না না। আমার কোন শক্তি নেই। আমি তো সামান্য একজন সাধক মাত্র, আমার এখনও ঢের দেরি—এ জন্মে বিশেষ কিছু হবে ব'লে তো মনে হয় না।

একটুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে পণ্ডিতজী বললেন, আচ্ছা, তুমি যখন বললে তখন একটু পরীক্ষা ক'রে দেখা যাক, কি বল?

দেবী ও শঙ্কর দুজনেই ব'লে উঠল, হাঁ হাঁ, বাবুজী—দেখাও দেখাও।

পণ্ডিতজী বললেন, আচ্ছা, তবে স্থির হয়ে ব'স।

পণ্ডিতজী স্থির হয়ে ব'সে চোখ বুজে ডান হাতের অঙ্গুষ্ঠ দিয়ে ডান চোখ, মধ্যমা আর অনামিকা দিয়ে বাঁ চোখ আর তর্জনী দিয়ে দুই ভ্রূর মাঝখানটা

টিপে কিছুক্ষণ মাথা নীচু ক'রে রইলেন। মুখ তুলতেই দেখলুম, তাঁর চোখ দুটি লাল আর অস্বাভাবিক রকমের উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। এদিক ওদিক চেয়ে আমাদের বললেন, ওই যে দূরে দুটো পায়রা দেখছ, ওদের প্রতি লক্ষ্য রাখ।

দেখা গেল, দূরে কোন এক পুরাতন প্রাসাদ না কি—চারদিকে খুব উঁচু পাথরের প্রাচীর—তারই ওপরে দুটো বুনো পায়রা খেলা করছে। একটা চুপ ক'রে ব'সে আছে, আর একটা তাকে ঘিরে নেচে বেড়াচ্ছে। হঠাৎ পায়রা দুটোই চঞ্চল হয়ে উঠল অর্থাৎ মনে হ'ল কে যেন তাদের এই খেলায় বাধা দিলে। যে পায়রাটা পায়ে পায়ে তালে তালে ঘুরছিল, সে থেমে গিয়ে চঞ্চল হয়ে এদিক ওদিক তাকাতে লাগল। যেটা পা মুড়ে ব'সে ছিল, সে তার ডানা ঝেড়ে উঠে পড়ল। তারপরে দুটোই উড়ে পণ্ডিতজীর বাড়ির হদ্দোর মধ্যেই একটা বড় গাছের ডালে এসে বসল। একটু এদিক ওদিক ক'রে একটা পায়রা আমরা যে ছাতে বসেছিলুম সেই ছাতের পাঁচিলের ওপর এসে বসল। পণ্ডিতজীকে দেখলুম—সেই থেকে স্থির ও সতেজ দৃষ্টিতে পায়রাটার দিকে চেয়ে রয়েছেন। কয়েক সেকেণ্ড পরেই পায়রাটা ছাতের পাঁচিল থেকে নেমে গুড়গুড় ক'রে হেঁটে একেবারে পণ্ডিতজীর হাতের কাছে এসে উপস্থিত হ'ল। পণ্ডিতজী সেটাকে তুলে কিছুক্ষণ আদর ক'রে নামিয়ে রাখলেন। দু-এক সেকেণ্ড পরে—শিশু যেমন হঠাৎ বিপদ সম্বন্ধে চেতনা লাভ ক'রে বিপদের কারণের কাছ থেকে দূরে পালিয়ে যায়, তেমনি কথা না বললেও পায়রাটা যেন—ওরে রে! ভাব দেখিয়ে পোঁ-পোঁ ক'রে উড়ে একেবারে আমাদের দৃষ্টির বাইরে চ'লে গেল।

তার উড়ে যাওয়ার ভঙ্গি দেখে আমরা সবাই হেসে উঠলুম।

আগেই বলেছি—আমরা যাওয়ার পর থেকে পণ্ডিতজীর ছেলে শঙ্কর দু-এক দিনের মধ্যেই আমাদের সঙ্গে অবাধে মেলামেশা করতে শুরু করেছিল। পণ্ডিতজীর মেয়ে দেবী কিন্তু প্রথম থেকেই নিজেকে বেশ দূরে রেখেছিল। ক্রমে দূরত্বের মাত্রা ক'মে গেলেও নিজের চারদিকে সে একটা কঠিন আবরণ টেনে

রেখেছিল—তা সে সুন্দরী মেয়ে ব'লেই হোক, বড়লোকের মেয়ে ব'লেই হোক কিংবা বিলিতী ইস্কুলে পড়া বিদ্যার গর্বেই হোক।

আমরা ছিলুম তাদের বাড়ির আশ্রিত ব্যক্তি। কাজেই সেখানে থাকতে খেতে পেয়েই সন্তুষ্ট ছিলুম, পণ্ডিতজী ও তাঁর ছেলে-মেয়েদের সদয় ব্যবহারে ছিলুম কৃতজ্ঞ—এর চেয়ে বেশি কিছু আমাদের কাম্যও ছিল না। দেবীকে তার বাবা ও ছোট ভাই শঙ্কর খাতির ক'রে দেবীজী ব'লে ডাকত। আমরা তাকে বহেনজী ব'লে ডাকতে আরম্ভ ক'রে দিলুম।

শঙ্কর একদিন বললে, কেন, তোমরাও দেবীজী ব'লে ডাক না?

দেবী তাতে আপত্তি ক'রে বললে, না না, বহেনজী ব'লেই ডেকো—বেশ লাগে আমার।

দেবী আমাদের সঙ্গে পারতপক্ষে কথাবার্তাই বলত না। তবে খাবার-টেবিলে সে আমাদের মায়ের মতন তদারক করত—শর্মা ভাই, তোমাকে আর একখানা রুটি দিক, খাও। কান্ত্ ভাই, তুমি কিছু খাচ্ছ না, ইত্যাদি। কিন্তু সে ওই পর্যন্ত। খাবার-টেবিল ছাড়লেই সে একেবারে অন্য লোক হয়ে পড়ত।

কিন্তু দেবীর এই গাম্ভীর্য ও আলাদা-আলাদা ভাব বেশি দিন চলল না। একদিনের একটা সামান্য কারণে আমার সঙ্গে তার এমন ভাব হয়ে গেল যে মুখের কথা তো দূরের কথা—সে আমাকে তার মনের কথা পর্যন্ত বলতে আরম্ভ ক'রে দিলে।

আগেই বলেছি যে, বিকেলবেলাটা পণ্ডিতজীর বাড়ি অত্যন্ত নির্জন হয়ে পড়ত। পণ্ডিতজী থাকতেন তাঁর ঘরে, সে সময় তিনি পূজা-অর্চনা করতেন, ভূমিকম্প হ'লেও বেরুতেন না। সারা দুপুর পড়াশুনো ক'রে শঙ্কর ও দেবী তখন চ'লে যেত নীচের বাগানে। চাকরেরা যে যার প'ড়ে ঘুম লাগাত। সেই নিস্তব্ধ বাড়ি হয়ে পড়ত অধিকতর নিস্তব্ধ।

বাগানের এক কোণে কতকগুলো খোলার ঘর ছিল। এই সব ঘরের মধ্যে অনেক জিনিসপত্র থাকত। এরই মধ্যে একখানা বড় ঘরের একটা দিক খালি

ছল। এই খালি জায়গাটাতে দেবী ও শঙ্কর ঠাকুর-ঘর করেছিল। রোজ বিকেলবেলায় তারা ভাই-বোনে এখানে পূজো করতে ঢুকত। একদিন শঙ্কর আমাকে নিয়ে গেল তাদের পূজোর ঘর দেখাতে। ঘরের মধ্যে ছেঁড়া বস্তার তুলো, পাট, কাঠের কুচি, ঘরময় নোংরা—তারই একটা কোণে দিব্যি পরিষ্কার জায়গায় তারা পূজোর দুটো বেদী তৈরি করেছে দেখলুম। দুটো পাথরের নুড়ি দিয়ে দুজনের শিব হয়েছে। দিব্যি টাটকা লতা-পাতা দিয়ে শিবের বেদী সাজানো হয়েছে। তার মধ্যে আবার ছোট ছোট দুটি প্রদীপ জ্বালানো হয়েছে। জায়গাটি সত্যি আমার বড় ভাল লাগল। ফিরিঙ্গী ইস্কুলে প'ড়ে ফিরিঙ্গীভাবে চালিত ও শিক্ষিত হয়েও যে তারা শিবপূজো করছে—দেখে খুশি হয়ে আরও ডাল-লতা-পাতা এনে আরও ভাল ক'রে তাদের বেদী সাজিয়ে দিলুম।

ঠাকুর-ঘরের প্রশংসা করায় ও আমার শিবভক্তি দেখে দেবী আমার প্রতি খুব প্রসন্ন হয়ে দু-একটা ক'রে কথা বলতে লাগল। আমার একটা শিবস্তোত্র মুখস্থ ছিল, আমি দেবীর শিবের সামনে ব'সে হাত জোড় ক'রে চোখ বুজে দিব্যি সুর ক'রে স্তোত্র আওড়াতে শুরু ক'রে দিলুম। স্তোত্রটা শেষ হতে না হতে দেবী একেবারে উছলে পড়ল, এ যে স্যান্স্‌ক্রিট—না শর্মা ভাই, এ নিশ্চয়ই স্যান্স্‌ক্রিট! কি আশ্চর্য! শর্মা ভাই, তুমি স্যান্স্‌ক্রিট জান?

দেবী একেবারে আমার পাশে ব'সে একরকম গলা জড়িয়ে ধ'রে বললে, শর্মা ভাই, এই মন্ত্রটা আমায় শিখিয়ে দেবে?

—নিশ্চয় দেব।

দেবী বলতে লাগল, ওঃ, হাউ ওয়াণ্ডারফুল—তুমি স্যান্স্‌ক্রিট জান!

ইংরেজী, ভাঙা-হিন্দী ও মারাঠী এই ত্রিবেণীধারায় প্রশংসা বর্ষিত হ'তে লাগল আমার ওপর। দেবী বলতে লাগল, আচ্ছা, আর একটু স্যান্স্‌ক্রিট বল তো!

—শুনবে?—

বিদ্বত্বং চ নৃপত্বং চ নৈব তুল্যং কদাচন।
স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান্ সর্বত্র পূজ্যতে।

—আরও?

—আচ্ছা।—

উৎসবে ব্যসনে চৈব দুর্ভিক্ষে রাষ্ট্রবিপ্লবে।
রাজদ্বারে শ্মশানে চ যস্তিষ্ঠতি স বান্ধবঃ॥

—ওঃ, হাউ ওয়াণ্ডারফুল! আমি ফাদারকে ব'লে তোমায় টিচার রাখব। শর্মা ভাই, আমাকে স্যান্‌স্‌ক্রিট শেখাবে?

—এতে আর কি হয়েছে, তোমায় দু দিনেই শিখিয়ে দেব।

দেবী বললে, আমার ইস্কুল খুলতে এখনও মাস দেড়েক দেরি আছে—এর মধ্যে শিখে নিতে পারব না?

—খুব, খুব। অন্তত আমি যতটুকু জানি ততটুকু শেখাতে ওর চেয়ে বেশিদিন লাগবে না। তাতে তুমি কথাবার্তা চালিয়ে নিতে পারবে।

দেবী বললে, ফাদারকে বলব, এজন্যে তোমায় মাইনে দিতে হবে।

পণ্ডিতজী বেশ ভাল সংস্কৃত জানতেন। আমার জ্ঞানের মাত্রা জানতে পারলে একটা হাস্যকর পরিস্থিতির উদ্ভব হবে বুঝতে পেরে দেবীকে বুঝিয়ে বললুম, বহেনজী, ফাদারকে জানিয়ে আর কাজ নেই। তুমি আমার বহেন হও, তোমায় শিখিয়ে টাকা নিলে আমার পাপ হবে। তোমার কোন ভাবনা নেই, আমি তোমাকে ঠিক শিখিয়ে দেব।

সেদিন থেকে দেবী আমার অনুগত বন্ধুতে পরিণত হ'ল। আমি তাকে সুর ক'রে মোহ-মুদ্গর আবৃত্তি করতে শেখাতে লাগলুম। মোহ-মুদ্গরের মধ্যে কি আছে জানি না। শ্লোকগুলো মুখস্থ হবার পর তার শিবভক্তি যেন বেড়ে গেল। এতদিন সে বিকেলে পূজো করত, এখন থেকে দু বেলায় পূজোর ঘরে যেতে আরম্ভ ক'রে দিলে।

সুরাটের আর একটা স্মৃতি আমার মনের মধ্যে বিশেষ ক'রে উজ্জ্বল হয়ে আছে, সে স্মৃতি কোন লোকের কথা নয়—একটি জায়গার কথা।

বিকেলবেলা জলখাবারের পর দেবী ও শঙ্কর নীচে নেমে যেত বাগানে—তাদের ঠাকুর-ঘরে। ঠাকুর-ঘর ঝাঁট দিয়ে বাসি ফুল-পাতা ফেলে দিয়ে তারা সত্য হোক—মিথ্যা হোক—গভীর ভক্তির সঙ্গে পূজো করত। পূজো শেষ হতে প্রায় সন্ধ্যে হয়ে যেত। এই সময়টা আমি আর সুকান্ত বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়তুম ঘুরে বেড়াবার জন্যে।

দু-একদিন জনার্দনের ওখানেও গিয়েছিলুম, কিন্তু বুঝতে পারলুম আমরা গেলেই তারা বিব্রত হয়ে পড়ে। মনে করে, এই বুঝি এরা আবার ফিরে এল! শেষকালে আমরা এদিক ওদিক ঘুরে বেড়িয়ে সময়টা কাটিয়ে দিতে লাগলুম।

একদিন এই ভাবে নদীর ধারে বেড়াতে বেড়াতে শহর থেকে একটু দূরে একটা জায়গায় এসে পৌঁছনো গেল। সেখানে নদী থেকে খাঁড়ির মত একটা চওড়া জলধারা জমির মধ্যে এসে প্রবেশ করেছে—নদীর প্রধান প্রবাহ থেকে প্রায় দু শো গজ পর্যন্ত ভেতর দিকে। জায়গাটা দেখেই আমার মনে হ'ল, এ যেন চেনা জায়গা। কোথায় দেখেছি, কবে দেখেছি ইত্যাদি নিয়ে মনের মধ্যে কিছুক্ষণ আন্দোলন চালিয়েও কিছুই মনে ক'রে উঠতে পারলুম না। অথচ সুরাটে আমি এর আগে কখনও আসি নি ও এবার এসেও এখানে কখনও আসি নি।

যাই হোক, জায়গাটা এত নির্জন ও এত আকর্ষণীয় যে, সেখানটা ছেড়ে নড়তে ইচ্ছে হ'ল না। আমি জলের প্রায় কাছাকাছি গিয়ে ব'সে পড়লুম। সঙ্গে সুকান্তও ছিল, সেও কোন কথা না ব'লে একটু দূরে জলের ধারে গিয়ে বসল। সেখানে বসতে না বসতে কিছুক্ষণের মধ্যেই মনের মধ্যে একটা অননুভূত শান্তি এসে জমা হতে লাগল। মনে হতে লাগল যেন মনের মধ্যে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টিধারার মত শান্তিবারি বর্ষিত হচ্ছে। সেই অনাস্বাদিত-

পূর্ব অনুভূতির বর্ণনা আমি কোন্ ভাষায় প্রকাশ করব! গৃহ, পরিবার, পরিবেশ, অবস্থা—সবই ভুলে গেলুম। মনে হতে লাগল, সবই সুন্দর—মনোরম—মধুময়।

জলের প্রায় কিনারায় ব'সে ছিলুম। জায়গাটা এত নিরালা যে কিনারায় এসে যে জলের ঢেউ মধ্যে মধ্যে ছলাৎ ছলাৎ ক'রে লাগছিল, আমি যেন তার মধ্যেও অস্পষ্ট বাণীর আকুল আকৃতি শুনতে লাগলুম। ছল-ছল কল-কল শব্দ তুলে নদী-মাতা আমায় যেন সম্ভাষণ করতে আরম্ভ ক'রে দিলে।

মনে হতে লাগল, হয়তো কোনো পূর্বজন্মে বালক আমি এই জলের ধারে খেলা করতুম। বহু জন্মজন্মান্তর বাদে সেই পরিচিত বালকটিকে দেখতে পেয়ে নদী-মাতা যেন আকুল ভাষায় আমায় স্নেহের সম্ভাষণ জানাচ্ছে। বাল্যকাল থেকেই আমি একটু কল্পনাবিলাসী—এখানে ব'সে ব'সে আমার কল্পনার উৎস যেন খুলে গেল।

দেখলুম, দূরে এক জোড়া লম্বা ঠ্যাঙওয়ালা সারস পাখি আস্তে আস্তে চ'লে ফিরে বেড়াচ্ছে, ভারি ভাল লাগতে লাগল তাদের চলন-ফেরন। কিছুক্ষণ পরেই মাথার ওপর দিয়ে এক ঝাঁক বলাকা গোল হয়ে উড়ে চ'লে গেল—তারপরে আর এক ঝাঁক,—আর এক ঝাঁক। হাওয়ার বিপরীত দিকে চলল তারা, অথচ কি দ্রুত ও কি নিশ্চিত তাদের গতি! তাদের পক্ষ-তাড়নায় যে শব্দ উত্থিত হ'ল তাতে সেই নির্জনতাকে যেন আরও গম্ভীর ক'রে তুলল। ক্রমে আমার চারদিক ঘিরে অন্ধকার নেমে আসতে লাগল। সেই স্বচ্ছ অন্ধকারে দেখলুম, দূরে একটি মেয়ে দুটি কলসী নিয়ে এসে নদীর ধারে দাঁড়াল। তারপরে কলসী ধুয়ে একে একে দু কলসী জল তুলে নিয়ে নদীর ধারে রাখলে। তারপর একটার ওপর আর একটা কলসী মাথায় তুলে নিয়ে চ'লে গেল অন্ধকারের গভীরে, যেন কালো বর্ণের পটে তুলি দিয়ে তার চেহারাখানা মুছে দেওয়া হ'ল। সন্ধ্যা হয়ে যাবার অনেক পরে আমরা সে জায়গাটা ছেড়ে উঠে পড়লুম।

কিছুদূর নীরবে পথ চলার পর সুকান্ত বললে, জায়গাটা এত ভাল লাগছিল যে উঠতে ইচ্ছে করছিল না।

যাই হোক, পরের দিন বিকেল হতে না হতে সেই জায়গাটা আবার আমাদের আকর্ষণ করতে লাগল। চা-খাবার একটু পরেই আমরা ছুটলুম সেই নদীর ধারে। সেখানে গিয়ে আগের দিন আমি ও সুকান্ত—যে যেখানে বসেছিলুম, সেখানে গিয়ে ব'সে পড়লুম। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সেদিনও বসতে না বসতে মনের মধ্যে সেই শান্তির অবতরণ বুঝতে পারলুম। বরঞ্চ কালকের চেয়ে আজকের অবতরণ যেন আরও গভীর, পরিবেশ যেন মধুরতর হয়ে উঠল।

নদীর ধারে সেই বক চরছে। লম্বা-ঠ্যাঙওয়ালা সারস পাখি দুটো সেই রকম সন্তর্পণে পা ফেলে ফেলে চলা-ফেরা করছে। নির্দিষ্ট সময়ে মাথার ওপর দিয়ে সেই বকের পাঁতি শন্-শন্ করতে করতে উড়ে গেল—এক সার—দু সার—তিন সার। অন্ধকারে আপনাকে লুকিয়ে একটি মেয়ে এল নদীর ধারে—বোধ হয় কাল যাকে দেখেছিলুম সে-ই হবে।

এমনি ক'রে প্রতিদিন বৈকালে নদী আমাদের আকর্ষণ ক'রে নিয়ে যায় তার তীরে। সকাল থেকে বিকেল অবধি দেবী ও শঙ্করের সঙ্গে কাটে, তারাই আমাদের ভাই-বোন হয়ে উঠেছে। বোম্বাই গিয়ে মিলে কাজ শেখার কথা একরকম ভুলেই গিয়েছি। দিনের বেলা বাড়ির কথা, কাজকর্মের কথা, জীবনে উন্নতি করার কথা কখন-সখন মনে হয় বটে, কিন্তু সে চিন্তার তীব্রতা চ'লে গিয়েছে। তারপর বিকেলবেলা নদীর তীরে গেলে সব চিন্তার ওপরে শান্তির প্রলেপ প'ড়ে যায়, সমস্ত উদ্বেগ চ'লে যায়, মনে হয় এমনি ক'রেই জীবন কেটে যাবে।

ঠিক এই রকম শান্তির অভিজ্ঞতা আমার জীবনে আর একবার হয়েছিল, সে বৃত্তান্তও এই জাতকে লেখা থাকা দরকার। সুরাটের এই সময়ের প্রায় বিশ বৎসর পরে একবার শীতের সময় মাস তিনেক জয়পুর শহরে বাস

করতে হয়েছিল। শহর থেকে অনেক দূরে একটা নির্জন স্থানে ছিল আমার বাড়ি। বাড়ির সামনে-পেছনে আশে-পাশে ইটের তৈরি কোন বাড়ি নেই—দূরে মাঝে মাঝে দু-চারটে খোলার চালের বস্তি, তারপরে আবার সব ফাঁকা। বাড়ির সামনে দিয়ে চওড়া রাস্তা চ'লে গিয়েছে, কোথায় কোন্ দূরের অন্য এক রাজ্যের রাজধানী পর্যন্ত। আমি শীত-কাতুরে লোক, দুপুরবেলা ঘরে থাকতে কষ্ট হ'ত ব'লে রোদে রোদে ঘুরে বেড়াতুম। বাড়ি থেকে বেরিয়ে সেই নির্জন পথ বেয়ে চলতে থাকতুম যতক্ষণ পর্যন্ত না রোদের ঝাঁজ ক'মে যায়। চারিদিক জনশূন্য—নিস্তব্ধ প্রকৃতি। থেকে থেকে পাগলা হাওয়ায় কখন বা খানিকটা ধূলো উড়িয়ে রাস্তা দিয়ে ছুটে চলল, কখনও বা চষা মাঠের মাঝখানে খানিকটা ধূলো লাট্টুর মতন ঘুরতে ঘুরতে ওপরে উঠে ছড়িয়ে পড়ল। কোথাও বা একপাল হরিণ চ'রে বেড়াচ্ছে—কোথাও বা ময়ূর। এরই মাঝে মাঝে কোন ধনী লোকের এক-একটি বাড়ি বা বাগান-বাড়ি আছে, কিন্তু সেও অত্যন্ত নির্জন।

বড় ভাল লাগত আমার এই দুপুরের নিরুদ্দেশ অভিযান।

একদিন দ্বিপ্রহরে এই রকম চলেছি। চলতে চলতে পথশ্রমেই হোক বা অন্য কোনো কারণেই হোক এক জায়গায় দাঁড়িয়ে চারদিক দেখছিলুম—দেখলুম, রাস্তা থেকে একটু দূরে একটা সমাধি রয়েছে। রাজপুতনায় মৃত ব্যক্তির স্মরণে মঠের মত ইট কিংবা পাথরের সমাধি করার রেওয়াজ আছে। এই রকম সব বড় বড় শ্বেতপাথরের সমাধি উদয়পুরেও আছে, কিন্তু উদয়পুরের তুলনায় জয়পুরের সমাধি-মঠগুলি কিছুই নয়। এই সমাধির মধ্যে কোথাও একজোড়া পায়ের চিহ্ন দেখেছি, কোথাও তাও নেই। যাই হোক, যে সমাধিটার কথা বলছি সেটার অবস্থা খারাপ, অযত্নে ছাদ প্রায় ভেঙে পড়েছে। সমাধির চারদিকে অনেকখানি জায়গা ঘিরে এক সময় কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তারের চিহ্নও এখন নেই—মাঝে মাঝে এক-একটা খুঁটি দাঁড়িয়ে রয়েছে মাত্র।

সমাধিটি দেখামাত্রই আমি নিজের মনের মধ্যে অদ্ভুত একটা আকর্ষণ অনুভব করলুম। মনে হতে লাগল, যার স্মৃতিকে স্থায়ী করার জন্য ওই সমাধি তৈরি হয়েছিল সে যেন আজও ওই ভগ্নস্তূপের মধ্যে বন্দী হয়ে আছে, আমি পদার্পণ করলেই ওই ভগ্নমন্দির ধূলিসাৎ হয়ে যাবে, আর যে বন্দী হয়ে আছে সেও মুক্তিলাভ করবে।

আমি ধীরে ধীরে ইট-পাটকেল সামলে সেই সমাধির ওপরে গিয়ে বসতেই কোথা থেকে এক শান্তির নির্ঝর যেন আমার ওপর বর্ষিত হতে লাগল। মনে হ'ল, মধু বাতা ঋতায়তে, মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ—বাতাসে মধু—মধু নদীর জলে। ভূত-ভবিষ্যতের চিন্তা কোথায় মুহূর্তে অন্তর্হিত হয়ে গেল।

প্রায় সন্ধ্যা অবধি সেখানে ব'সে থেকে আমি উঠে এলুম। পরদিন দ্বিপ্রহরে আবার গিয়ে সেখানে বসলুম।

বসার কিছু পরেই আবার সেই শান্তির নির্ঝর ঝরতে লাগল। সেই থেকে আমি প্রায় দু মাস সেখানে ছিলুম এবং কাজকর্ম না থাকলে প্রতিদিনই দুপুরবেলা সেখানে গিয়ে বসতুম। বোধ হয় দু-তিন দিন ছাড়া প্রতিবারেই আমি সেই শান্তি অনুভব করেছি। আমার এই অভিজ্ঞতার কথা সে সময় আমি আমার বন্ধু কবি নরেন্দ্র দেবকে লিখেছিলুম। আমার সেই চিঠির উত্তরে নরেন আমাকে সুন্দর একটি চিঠি লিখেছিল। নরেনের চিঠিখানা এইখানে দিতে পারলে এই জাতক অলঙ্কৃত হ'ত সন্দেহ নেই ; কিন্তু যে লক্ষ্মীছাড়া কোনো সঞ্চয়ই জীবনে করতে পারে নি, চিঠিপত্র জমা করা তার দ্বারা আর কি ক'রে সম্ভব হবে ?

আগেই বলেছি দেবীর সঙ্গে আমার খুব ভাব হয়ে গিয়েছিল। একদিন দুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়ার আগে আমরা গল্প করছি, এমন সময়ে আমাকে ও সুকান্তকে দেবী বললে, ভাইয়া, তোমরা আমাদের বাড়িতেই থাক। তোমাদের দুজনকেই আমার খুব ভাল লাগে। কলকাতা বা বোম্বাই গিয়ে কি আর হবে—বাবাকে বলি, তিনি তোমাদের এখানেই এক-একটা কাজে লাগিয়ে দেবেন।

দেবীকে বললুম, তুমি তো দুদিন বাদেই ইস্কুলে চ'লে যাবে।

সে বললে, তাতে কি হয়েছে! ইস্কুল খুললেই তো আমার পরীক্ষা। পাস যদি করতে পারি তো ইস্কুলে আর পড়ব না। বাড়িতে প'ড়ে বোম্বে ইউনিভার্সিটির পরীক্ষা দেব। তা ছাড়া আমি আর কদিন আছি।

—কদিন আছ মানে!

দেবীর মুখখানা আমার প্রশ্নে মলিন হয়ে গেল। সে বললে, জান ভাই, আমি বেশিদিন বাঁচব না। কুড়ি বছরের বেশি আমার পরমায়ু নেই। এখনি আমার সতের বছর চলছে—আর বড় জোর তিন বছর। বাবা বলেছেন, এর মধ্যে যে কোনো সময়ে ম'রে যেতে পারি।

দেবীর উল্লাসে পরিপূর্ণ, স্বাস্থ্যে নিটোল সেই উজ্জ্বল মুখখানা দেখতে দেখতে মলিন হয়ে গেল। একটু চুপ ক'রে থেকে সে বললে, জান ভাই, বাবা যা বলেন তা কখনও মিথ্যা হয় না!

দেবীর কথাগুলি শুনে বুকের মধ্যে হা-হা ক'রে উঠল। মনে হ'ল, এমন ফুল অকালে শুকিয়ে যাবে! তাই বুঝি নিয়তি তাকে সংহারের দেবতা মহেশ্বরের পায়ের কাছে টেনে নিয়ে গিয়েছে—তাই বুঝি সে শিবপূজার অনুরাগিণী, নিত্য শিবপূজা করে। মনে হতে লাগল, মৃত্যুর কৃষ্ণযবনিকার ওপরে এই যে ফুল ফুটে উঠছে কি এর উদ্দেশ্য? কেন এই অকারণ অবারণ রূপ-সৃষ্টি, যদি অরূপেই তা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়? কেন এই তারুণ্যের উন্মুখ পিপাসা, যদি মৃত্যুর মরুবালুকাই থাকে পথের শেষে? মানুষের মনের কোন্ আর্তবিদ্রোহ সংহারের দেবতাকে নটরাজরূপে কল্পনা করল—কঠিন ধাতবে গেঁথে দিল তার কোমল আশা? এই সব ভাবধারার অতল গহনে ডুবে গেছি, এমন সময় দেবীর কণ্ঠস্বরে আবার চেতনার স্রোতে ভেসে উঠলুম।

দেবী বলতে লাগল, মরতে আমার একটুও ইচ্ছে নেই। বল ভাইয়া, কে মরতে চায়! তবু মনকে আমি শক্ত করবার চেষ্টা করি। বাবা আমাকে মন ঠিক করবার মন্ত্র দিয়েছেন—সব সময় সেই মন্ত্র জপ করি। সত্যি ভাইয়া,

মন্ত্র জপ করতে করতে মরবার ভয় আমার একটুও নেই। কিন্তু তবু—মরতে আমি চাই না, মরবার ইচ্ছেও আমার নেই। হায়! তবু আমায় মরতে হবে।

দেবীর কথা শুনতে শুনতে আমার চোখে জল এসে গেল। ফিরে দেখলুম, সুকান্তের চোখ উপচে জল পড়ছে—শঙ্কর-ভাই নিঃশব্দে কাঁদতে লাগল। দেবী তাকে জড়িয়ে ধ'রে আদর করতে শুরু ক'রে দিলে।

এই বেদনার মধ্যে আমাদের বন্ধন দৃঢ়তর হয়ে উঠলেও আমাদের চারদিক ঘিরে মরণের করুণ সুর বাজতে লাগল। সেই দিনই দুপুরে খাবার সময় পণ্ডিতজীকে বললুম, বহেনজী বলছিল যে, কুড়ি বছরের বেশি ওর পরমায়ু নেই, এর মধ্যে যে কোনদিন তার মৃত্যু হতে পারে—এ কি সত্যি কথা!

আমার কথা শুনে পণ্ডিতজী তাঁর স্বভাবসুলভ উচ্চ হাসি হেসে উঠলেন। হাসি থামলে বললেন, দেবী বলছিল নাকি? হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওর আয়ু বড় কম। তা আমি তো ওকে মন্ত্র দিয়েছি—

কথাটা বলতে বলতেই পণ্ডিতজী আবার সেই রকম হেসে খাওয়ার দিকে মন দিলেন।

সত্যি কথা বলতে কি, পণ্ডিতজীকে আমরা এত শ্রদ্ধা করতুম ও এমন ভালবাসতুম যে বলবার নয়। তবুও একমাত্র কন্যাসন্তানের মৃত্যুর কথা এমন অবহেলা ও হাসির সঙ্গে উড়িয়ে দেওয়াটা বড় নিষ্ঠুর ব'লে মনে হতে লাগল।

সন্তানের শুভাশুভ সম্বন্ধে এর চেয়েও বেশি ঔদাসীন্য তাঁর মধ্যে আর একদিন দেখেছিলুম। তখন অবশ্য বুঝতে পারি নি যে, বিশ্বনিয়ন্তার ওপর কতখানি নির্ভরশীল হ'লে এবং কতখানি আত্মসমর্পণ করতে পারলে মানুষ এতটা উদাসীন হতে পারে। সেই কাহিনী বর্ণনা ক'রেই এবারের পর্ব শেষ করি।

একদিন বিকেলে চায়ের পর্ব শেষ হয়ে যাবার পর তখনও কটকটে রোদ্দুর আছে দেখে আমরা না বেরিয়ে ঘণ্টাখানেক গড়িয়ে নিচ্ছি। এমন সময় দেবীর খাস ঝির তীব্র আর্তনাদ শুনে নিজেদের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দেখি যে, সে পণ্ডিতজীর ঘরের দরজার একটু দূরে দাঁড়িয়ে মারাঠী ভাষায় চীৎকার ক'রে

কি সব বলছে। এই স্ত্রীলোকটি ছিল দেবীর খাস ঝি—হিন্দী কথা একেবারেই বুঝতে পারত না বা বলতেও পারত না। দেখলুম যে হাত ছুঁড়ে ছুঁড়ে তারস্বরে চীৎকার ক'রে কি বলছে।

আমরা বেরিয়ে আসতেই সে পণ্ডিতজীর ঘরের ভেজানো দরজার দিকে আঙুল দিয়ে কি দেখাতে লাগল। আমরা তার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না দেখে সে আরও চেঁচিয়ে হাত ছুঁড়ে কি সব বলতে লাগল। কিন্তু আমরা তখনও কিছু বুঝতে পারছি না দেখে সে একরকম ছুটে গিয়ে পণ্ডিতজীর ঘরের ভেজানো দরজাটা দড়াম ক'রে খুলে ফেলেই হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে গেল।

আমরা দেখলুম, পণ্ডিতজী পদ্মাসনে ব'সে আছেন। শরীরটা সোজা, চক্ষু মুদ্রিত—দেখলেই বুঝতে পারা যায় যে তিনি সমাধিস্থ। এদিকে সেই স্ত্রীলোকটি একটু চুপ ক'রে থেকেই আবার চেল্লাতে শুরু করলে। কিন্তু পণ্ডিতজী নির্বিকার, নিস্পন্দ। শেষকালে আমরা তাকে চুপ করতে ব'লে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে তাকে সরিয়ে নিয়ে এলুম। অনেক জেরা করবার পর কোন রকমে বোঝা গেল যে, বাগানের দিকে দেবী ও শঙ্করের কি হয়েছে—এক্ষুনি সেখানে যাওয়া দরকার।

কালবিলম্ব না ক'রে বাগানের দিকে ছুটলুম। পেছনে দেবীর ঝি চেঁচাতে চেঁচাতে আমাদের অনুসরণ করতে লাগল। বাগানে গিয়ে দেখি, সেখানে সাংঘাতিক কাণ্ড শুরু হয়েছে। দেবী ও শঙ্করের ঠাকুর-ঘরে লেগেছে আগুন—আগুন চালা অবধি উঠে গেছে। কুণ্ডলী ক'রে ধোঁয়া উঠছে ওপরে, তার মধ্যে মাঝে মাঝে লাল আগুনের শিখা দেখা যাচ্ছে। ঘরের একটা ছোট্ট জানলা খোলা, তার মধ্যে দিয়ে গল্‌গল্‌ ক'রে ধোঁয়া বেরুচ্ছে, ঘরের চওড়া দরজা দিয়ে ভেতরের খানিকটা দেখা যাচ্ছে, কুণ্ডলীকৃত অগ্নিগর্ভ ধোঁয়া বেরোতে পাক খাচ্ছে—ঘরের মধ্যে দেবী ও শঙ্কর রয়েছে, তাদের কোন সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। একদল চাকর বাইরে দাঁড়িয়ে চেঁচামেচি করছে। ছোঁড়া চাকরটা

বাড়ির মধ্যে থেকে দু হাতে দু বালতি ক'রে জল এনে চালায় ছুঁড়ে দিচ্ছে। প্রতিবার জল আনতে প্রায় পাঁচ মিনিট ক'রে সময় যাচ্ছে।

চাকরদের বললুম, তোমরা দাঁড়িয়ে কি মজা দেখছ! যাও, ভেতরে ঢুকে ওদের বের ক'রে নিয়ে এস।

আমাদের কথায় কেউ সাড়া দিলে না। কয়েক সেকেণ্ড পরে বৃদ্ধ বাবুর্চী বললে, ওর মধ্যে কে যাবে সাহেব, ও নিশ্চিত মৃত্যুর মধ্যে কে যাবে!

আমার মনের মধ্যে তখন আকুলতার ঝড় চলেছে। দেবীর সেই ফুলের মতন মুখখানার ছবি মনের মধ্যে ভেসে উঠতে লাগল। মনে হতে লাগল, জ্ঞান হওয়া থেকে আরম্ভ ক'রে আজ পর্যন্ত আমি তো বিশ্বের নিন্দিত। পিতা-মাতা আমার জন্যে নিশিদিন চিন্তিত, শঙ্কিত ও মর্মাহত—লোকের কাছে তাঁরা মুখ দেখাতে পারেন না। খারাপ ছেলের দৃষ্টান্ত দিতে হ'লে আত্মীয়-স্বজনেরা আমার দিকে আঙুল তুলে দেখায়। আমার সঙ্গে মিশতে দেখলে অভিভাবকেরা তাঁদের ছেলেদের শাসন করেন। আজ ভগবান আমাকে একটা সৎকাজ করবার সুযোগ জুটিয়ে দিয়েছেন। যদি মরি তো সংসারের একটা আবর্জনা স'রে যাবে।

ফিরে সুকান্তকে বললুম, কি রে সুকান্ত, যাবি নাকি! আর না—আর দেরি করলে যাওয়া না-যাওয়া সমান—কি রে সুকান্ত—

সুকান্ত কোনও জবাব দিলে না তবে তার মুখ দেখে মনে হ'ল যে, সে যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত। আর কিছু না ব'লে, আর কিছু না ভেবে সেই ধোঁয়ার কারে ঢুকে পড়া গেল।

ঘরের মধ্যে দৌড়ে ঢুকে খেলুম এক আছাড়। মাটির মেঝে—তার ওপর কয়েক বালতি জল প'ড়ে খুব পেছল হয়েছে। সামলে দাঁড়ালুম বটে, কিন্তু সেই জমাট বাঁধা ধোঁয়া—ধোঁয়ার মধ্যে আগুনের হলকা লুকিয়ে রয়েছে—মাঝে মাঝে ফুঁসিয়ে উঠছে।

নিশ্বাস বন্ধ ক'রে পা ঘেঁষটে ও হাত দিয়ে খুঁজতে লাগলুম শঙ্কর ও

দেবীকে কিন্তু কতক্ষণ নিশ্বাস বন্ধ ক'রে থাকা যায়! নিশ্বাস নিতেই বুকটা যেন জ'লে গেল। বেশ বুঝতে পারলুম বুকের মধ্যে খানিকটা গরম ধোঁয়া ঢুকে পড়ল। দেহের সেই নিদারুণ কষ্টকে চেপে পা ঘষটে চলেছি, পায়ে নরম একটা কি লাগতেই বুঝতে পারলুম দেবী প'ড়ে আছে। চীৎকার ক'রে ডাকলুম, বহেনজী!

কিন্তু খানিকটা আওয়াজ ছাড়া আর কিছুই বেরুল না—বরঞ্চ সঙ্গে সঙ্গে আর এক হলকা ধোঁয়া ঢুকল বুকে। সেই অবস্থায় ব'সে প'ড়ে দেবীকে তোলবার চেষ্টা করলুম, কিন্তু আমার সাধ্য কি সেই লাশ ওঠাই! শেষকালে তার হাত দুটো ধ'রে টানতেই যেন কিসে আটকে গেল। বুঝতে পারলুম, তার চোদ্দ হাত শাড়ির আঁচল কিছুতে আটকে প'ড়ে গিয়ে সে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে। জোর ক'রে টেনে তার দেহটাকে দরজার কাছে নিয়ে এলুম—শাড়ির খানিকটা ছিঁড়ে সেখানে আটকেই রইল। কিন্তু শাড়ি দেখবার তখন আর সময় নেই। আর যেটুকু দম অবশিষ্ট ছিল, তারই জোরে দেবীর দেহখানা হিঁচড়ে কিছুদূর টেনে নিয়ে গিয়ে ঘুরে প'ড়ে গেলুম।

মাটিতে পড়েই বাঁ হাতে একটা চোট লাগায় চেতনটা একবার চন্‌মনিয়ে উঠল—তারই মধ্যে ছায়ার মতন চোখে পড়ল, সুকান্ত শঙ্করের দেহখানা নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে প'ড়ে গেল। বাস্—তার পরে আর কিছু মনে নেই।

জ্ঞান হয়ে দেখলুম, রাত্রি হয়ে গিয়েছে, আমাকে তুলে এনে ঘরের মধ্যে শোয়ানো হয়েছে। ঘরে আলো জ্বলছে। অদূরে আর একজন কে শুয়ে রয়েছে। তার শিয়রে একজন বাঁধা-পাগড়ি-পরা লোক ব'সে রয়েছে, পণ্ডিতজী পাশে দাঁড়িয়ে।

হাতখানা বেদনায় কন্‌কন্ করতে লাগল, বুকের ভেতর একটা জ্বালা। যন্ত্রণায় একটু আওয়াজ মুখ দিয়ে বেরুতেই পণ্ডিতজী এসে আমার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, কেমন আছ?

তারপরে পাগড়ি-বাঁধা লোকটিকে ডেকে বললেন, ডাক্তার, এই দিকে, এই যে চেতনা হয়েছে

ডাক্তার উঠে আমার কাছে আসতেই দেখলুম, অদূরে যে শুয়ে রয়েছে সে সুকান্ত—সুকান্ত তখনও অচৈতন্য।

সেই রাত্রে আমি ও সুকান্ত দুজনেই খুব অসুস্থ হয়ে পড়লুম। বুকে অসহ্য বেদনা, তার ওপর মুহুর্মুহু বমি। বুকে সরষের পটি ও মালিশ চলতে লাগল। দিন তিনেক বাদে তবে পথ্য পেলুম। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে, দেবী ও শঙ্কর পরের দিনই বেশ সুস্থ হয়ে উঠল।

আমরা পথ্য পেলুম বটে কিন্তু ডাক্তার ব'লে গেলেন, দিন রাত্রি যেন বিছানায় শুয়ে থাকি। তিনি সকালে ও সন্ধ্যায় এসে আমাদের বুক পেট সব পরীক্ষা ক'রে যেতে লাগলেন। দেবী ও শঙ্কর সর্বদাই আমাদের কাছে থাকতে লাগল। উদ্ধারকর্তারা কাত হলেন, অথচ উদ্ধৃতেরা দিব্যি ঘোরা-ফেরা করতে লাগলেন। এই নিয়ে আমাদের হাসাহাসি হ'ত।

সন্ধ্যার পর থেকে পণ্ডিতজী আমাদের কাছে এসে বসতেন। সন্ধ্যাটা হাসিঠাট্টা আমোদ ও নানারকম কথাবার্তায় আনন্দে আহ্লাদে কাটতে লাগল। প্রায় দিন পনেরো বিছানায় কাটিয়ে আমরা সুস্থ হয়ে উঠলুম।

ওদিকে দেবী ও শঙ্করের ইস্কুলে ফিরে যাবার দিন এগিয়ে আসতে লাগল। দুই ভাই-বোনের কিছু কাপড়-চোপড়ের দরকার—কিন্তু সুরাটে কিছুই পাওয়া যায় না। ঠিক হয়েছে হপ্তাখানেকের জন্যে দেবী ও শঙ্করকে নিয়ে পণ্ডিতজী কাপড়-চোপড় কিনতে বোম্বাই যাবেন।

কথাবার্তা চলছে, আলাপ-আলোচনা হচ্ছে—এই রকম একটা সময়ে একদিন দ্বিপ্রহরে খেতে ব'সে দেখলুম যে, দেবীর বাঁ চোখের কোণটা লাল হয়ে উঠেছে। জিজ্ঞাসা করলুম, বহেনজী, তোমার চোখটা লাল হয়ে উঠেছে যে ?

দেবী বললে, হ্যাঁ ভাইয়া, কাল রাত থেকে মাঝে মাঝে চোখটা দপ্‌দপ্‌ ক'রে উঠছে—বোধ হয় ঠাণ্ডা লেগেছে।

পণ্ডিতজী দেখে বললেন, খেয়ে উঠে চোখটায় গরম জলের সেঁক দিও।

সেদিন রাত্রে নদীর ধার থেকে ফিরে এসে দেখি, দেবীর সমস্ত চোখটাই রাঙা হয়ে উঠেছে—একটু ফুলেছে ব'লেও যেন মনে হ'ল।

দেবী বললে, দেখ তো ভাইয়া, আমার জ্বর এসেছে কি না?

কপালে হাত দিয়ে দেখলুম, তার বেশ জ্বর হয়েছে।

পণ্ডিতজী দেখে শুনে ডাক্তার ডাকলেন। ডাক্তারটি ওখানকার শ্রেষ্ঠ ডাক্তার। তিনি এসে দেখে ওষুধ দিয়ে গেলেন। রাতে দেবীর চোখের যন্ত্রণা অসম্ভব রকম বেড়ে গেল, সেই সঙ্গে সঙ্গে জ্বরও।

চিকিৎসা চলতে লাগল। চোখের ফোলাটা ক'মে গেল বটে; কিন্তু দেবী বলতে লাগল, চোখটার দৃষ্টি ক'মে আসছে। জ্বর একটু একটু র'য়েই গেল, তার ওপরে ভ্যাথ্ ভ্যাথ্ করতে করতে সে রোগা হয়ে যেতে লাগল। ডাক্তারেরা পণ্ডিতজীকে উপদেশ দিলেন বোম্বাইয়ে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করাতে—সেখানে চোখের বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের নামও ক'রে দিলেন।

পরের দিনই পণ্ডিতজী ছুটির জন্যে দরখাস্ত ক'রে দেবীকে নিয়ে বোম্বাই চ'লে গেলেন। শঙ্কর আমাদের কাছে রইল।

বোম্বাই যাওয়ার সময় আমি ও সুকান্ত স্টেশনে গিয়েছিলুম। গাড়ি ছাড়বার একটু আগে পণ্ডিতজী আমাদের দুজনকে একটু দূরে নিয়ে গিয়ে বললেন, তোমরা আমার সন্তানদের বাঁচাবার জন্যে নিজেদের জীবন তুচ্ছ করেছিলে—তোমাদের কি ব'লে কৃতজ্ঞতা জানাব, জানি না। আমার অনুরোধ, তোমরা আরও কিছুদিন এখানে থাক—দেবীরও ইচ্ছে তাই।

কিছুক্ষণ পরে গাড়ি ছেড়ে দিল। অত্যন্ত ভারী মন নিয়ে স্টেশন থেকে ফিরে এলুম।

প্রায় পনেরো দিন পরে পণ্ডিতজী দেবীকে নিয়ে বোম্বাই থেকে ফিরে এলেন। আমরা স্টেশনে তো তাকে প্রথমে চিনতেই পারি নি। সেই প্রফুল্ল শতদলের মতন নিটোল স্বাস্থ্য তার এই ক'দিনেই যেন ভেঙে পড়েছে। তার সেই মাখন-সিঁদুরে লালচে-সোনা রঙের ওপর কে যেন কালি ঢেলে দিয়েছে।

দেখলুম, তার বাঁ চোখের পর্দাটা যেন ঝুলে পড়েছে। ভাল ক'রে হাঁটতে পারে না—কি রকম ধুঁকতে ধুঁকতে কথা বলে। তার অবস্থা দেখে চোখে জল এসে গেল।

বাড়িতে এনে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে আমরা তার পাশে গিয়ে বসলুম। এরই মধ্যে থেকে থেকে সে বোম্বাইয়ের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে লাগল। কথা বলতে বলতে কেঁদে ফেলে সে একবার বললে, ভাইয়া, এই চোখটায় আর কিছুই দেখতে পাই না। জ্বর দিনরাত্রি লেগেই আছে।

পণ্ডিতজীকে কিন্তু দেখলুম সেই সদাপ্রসন্ন অবস্থাতেই আছেন। বাড়িতে এসে স্নান ক'রে তিনি কাজে বেরিয়ে গেলেন। সেদিন দুপুরবেলা খাবার-টেবিলে পণ্ডিতজীকে বললুম, কলকাতায় সণ্ডার্স সাহেব আছেন—চক্ষু-চিকিৎসায় তাঁর জোড়া নেই। তাঁকে একবার দেখালে হয় না?

পণ্ডিতজী বললেন, আচ্ছা, আমি খোঁজ নিয়ে দেখছি—কি করা যেতে পারে!

পরের দিন রাত্রিবেলা আমরা যখন দেবীকে ঘিরে ব'সে গল্প করছি, এমন সময় পণ্ডিতজী এসে ঘোষণা করলেন যে, তিনি ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব, আমাদের ইঞ্জিনিয়ার সাহেব ও তাঁর আপিসের আরও অনেককে সণ্ডার্স সাহেবের কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তাঁরা সকলেই বলেছেন যে, চক্ষু-চিকিৎসায় তাঁর জোড়া আর কেউ নেই। সকলেই পরামর্শ দিলেন, দেবীকে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে সণ্ডার্সকে দেখাতে।

পণ্ডিতজী আরও বললেন, তাঁর আপিসের এক বন্ধু কলকাতায় তার ক'রে দিয়েছেন—তাঁদের জন্যে একটা বাড়ি ঠিক করতে। বাড়ি ঠিক হয়ে গেলেই কলকাতা যাওয়া হবে।

দেবী সেই ম্লান মুখেও একটু হেসে বললে, যাক, এই ব্যারামের দৌলতে আবার কলকাতা দেখা হয়ে যাবে।

সেদিন রাত্রিবেলা খাওয়া-দাওয়ার পর নিজেদের ঘরে এসে সুকান্তকে বললুম,

আর কি বন্ধু! এবার ডেরা-ডাণ্ডা তোলো—এখানকার দেনা-পাওনা চুকে গেল ব'লেই তো মনে হচ্ছে।

সুকান্ত বললে, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব যে কুড়িটা টাকা দিয়েছিল, সেটা কার কাছে আছে? সেটা তো আমাদের টাকা!

বললুম, কার কাছে আছে জানি না। তবে পরহস্তগত ধন—সে থাকা না-থাকা সমান। তবু পণ্ডিতজীকে একবার জিজ্ঞাসা করা যাবে।

কাছে একটা কপর্দকও নেই—এমন অবস্থা এর আগে হয় নি। কিছুক্ষণ সেই চিন্তায় মনটা বিগড়ে রইল, তারপরে ঘুমিয়ে পড়লুম।

পণ্ডিতজী আপিসে ছুটির দরখাস্ত ক'রে দিলেন। এবার দীর্ঘদিনের ছুটি চাই, কারণ দেবী কতকাল ভুগবে এবং তাকে নিয়ে কতকাল ভুগতে হবে তা জানা নেই। ঠিক হ'ল, শঙ্করও সঙ্গে যাবে, দেবীর পরিচর্যার জন্যে সেই মারাঠী পরিচারিকাও যাবে।

দিন দুই বাদে আপিসের সেই বন্ধুর কাছে তার এল যে, তাদের জন্যে বাড়ি ঠিক হয়ে গেছে। হগ মার্কেটের খুব কাছে ফিরিঙ্গী-পাড়ায় সস্তায় একখানা ফ্ল্যাট ভাড়া পাওয়া গিয়েছে। এদিককার সব বন্দোবস্ত তখন সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছে, শুধু পণ্ডিতজীর ছুটির দরখাস্তের কোন জবাব পাওয়া যায় নি। পণ্ডিতজী বললেন, ছুটি না দিলে আমি চাকরিতে জবাব দেব।

দু-তিন দিন কেটে গেল, তবুও পণ্ডিতজীর দরখাস্তের কোন জবাব এল না দেখে তিনি ঠিক করলেন, এমনিই চ'লে যাবেন—তারপরে যা হবার তাই হবে—আর ব'সে থাকা চলে না।

সেদিন দুপুরবেলা খাবার-টেবিলে পণ্ডিতজীকে ব'লেই ফেললুম, আমরা কি তবে বোম্বাই চ'লে যাব?

পণ্ডিতজী বললেন, এই সব হাঙ্গামায় তোমাদের কথা একদম ভুলেই গেছি। তোমরা কি বোম্বাই যাবে, না, এখানে থাকবে?

—আপনি যা বলেন তাই হবে।

পণ্ডিতজী একটু ভেবে বললেন, দেখ, আমরা কলকাতা থেকে ফিরে আসি, তার পরে তোমাদের কথা চিন্তা করা যাবে। আমি বলি, ততদিন তোমরা এইখানেই থাক। শুধু চাকর-বাকরদের হাতে এতবড় বাড়ি আর এত জিনিস-পত্র ফেলে রেখে যাওয়া সমীচীন নয়। কি বল?

বললুম, তাই হবে।

পণ্ডিতজী আশ্বাসের সুরে আবার বললেন, খুব সম্ভব এখানকার চাকরি ছেড়ে দিয়ে আমাকে বোম্বাই যেতে হবে। তা যদি হয় তো কথাই নেই।

পণ্ডিতজীর কথায় কতকটা নিশ্চিন্ত হ'লেও, কি জানি কেন, মনে শান্তি পাচ্ছিলুম না। কি জানি, আবার ভাগ্যে কি আছে—এই রকম চিন্তা আমাকে আঁকড়ে রইল।

সেদিন রাত্রে আহারাদির পরে আমরা সবাই দেবীর ঘরে ব'সে গল্প করছি। কি জানি, কি কথার ওপর সুকান্ত বললে, কাল এতক্ষণ তোমরা ট্রেনে চ'ড়ে চলেছ।

তার উত্তরে দেবী বললে, ভাইয়া, তোমরাও আমাদের সঙ্গে চল না।

আমরা চুপ ক'রে রইলুম। ভাবতে লাগলুম, আবার কলকাতা !!!

দেবী আমার একখানা হাত ধ'রে অনুনয় করতে লাগল, চল না ভাইয়া, এখানে একলা কি তোমাদের ভাল লাগবে?

দেবীর কণ্ঠস্বর ভারী হয়ে উঠল দেখে পণ্ডিতজী বললেন, বেশ তো, চল না। কলকাতা তোমাদের দেশ—আমি সেখানকার কিছুই জানি না। তোমাদের মতন আপনার লোক কাছে থাকলে কত সুবিধা হবে, কত ভরসা পাব।

বাপের কথা শুনে দেবী উল্লসিত হয়ে বললে, তাই চল ভাইয়া। কেমন, যাবে তো?

দেবীর সে অনুরোধে 'না' করতে পারলুম না। কচি মেয়ের মতন আবদারের সুরে—হ্যাঁ ভাইয়া, হ্যাঁ ভাইয়া—করতে করতে বিছানায় উঠে নাচতে লাগল। আমাদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়ে তবে সে শুলো।

পরের দিন সন্ধ্যার সময় সকলে মিলে কলকাতায় রওনা হওয়া গেল। পা
পাছে দেবীর অসুবিধা হয় সেজন্যে পণ্ডিতজী একটি পুরো দ্বিতীয় শ্রেণীর
রিজার্ভ করায় আমরা বেশ আরামেই এসে পৌঁছলুম। স্টেশনে পণ্ডি
জের তাঁর আপিসের বন্ধুর সেই বন্ধু উপস্থিত ছিলেন। তাঁর সা
নতুন আবাসে গিয়ে বাজার ইত্যাদির ব্যবস্থা ক'রে দিয়ে আমরা বাড়ি
উপস্থিত হলুম।

বাড়িতে কি রকম সম্বর্ধনা হ'ল, সে কথা এখন থাক। তবে সেদিন আর
দেবীকে দেখতে যাওয়া হ'ল না।

সে সময় বড়বাজারে বগলার মাড়োয়ারী হাসপাতালে সণ্ডার্স সাহেব সপ্তাহে
একদিন না দুদিন ক'রে আসতেন। শোনা গেল, তিনি চন্দননগরে থাকেন—
হাসপাতাল ছাড়া বাইরের কোন লোককে চিকিৎসা করেন না। ইতিমধ্যে
মেডিক্যাল কলেজের তদানীন্তন প্রিন্সিপ্যাল লিউকিস্ সাহেবকে ডেকে দেবীকে
দেখানো হ'ল। তাঁর অনুরোধে সণ্ডার্স এসে তার চোখ পরীক্ষা করলেন।
দুই মহারথী মিলে দেবীর চিকিৎসা শুরু ক'রে দিল—টাকা উড়তে লাগল
ঝাঁকে ঝাঁক।

ওষুধের গুণেই হোক বা নতুন আবহাওয়ার গুণেই হোক—দিন দশেকের
মধ্যেই দেবীর স্বাস্থ্যের আশ্চর্য উন্নতি হতে লাগল। যে রুগী পাশ ফিরতে
পারত না, এক চক্ষু একেবারে দৃষ্টিহীন, অন্য চক্ষুও প্রায় সেই রকম হয়ে
পড়েছিল—সে উঠে হেঁটে বেড়াতে লাগল।

লিউকিস্ সাহেব বললেন, রক্তহীনতা রোগ—কেবল বিশ্রাম ও পথ্যের
ওপর রোগীর স্বাস্থ্য নির্ভর করছে।

প্রায় মাস দুয়েক এখানে কাটিয়ে বেশ সুস্থ হয়ে আলিপুরের চিড়িয়াখানা,
হাসিমুখে দিন সন্ধ্যাবেলা
তারা কলকাতা থেকে সুরাটের দিকে রওনা হ'ল

সে সময়ে সুকান্ত কলকাতায় ছিল না। এখানে তার থাকবার জায়গা

নই, কাজেই বাধ্য হয়ে তাকে দেশে ফিরে যেতে হয়েছিল। দেবী ও শঙ্কর জনেই তাদের সঙ্গে আমাকেও যাবার জন্তে পীড়াপীড়ি আরম্ভ করেছিল, কিন্তু তদিন বাদে ঘরে ফিরে এসে আবার বেরিয়ে পড়া সে সময় সম্ভব হ'ল না। ত্রের কথা দিলুম, আমি ও সুকান্ত মাস খানেকের মধ্যেই ওখানে গিয়ে জুটব। ণ্ডিতজীও আমার প্রস্তাব অনুমোদন ক'রে বললেন, এ সময়ে বাড়ি ছেড়ে ওয়া ঠিক হবে না।

তার পর একটু চুপ ক'রে থেকে আবার বললেন, আমি তোমাদের জন্তে ইন্তে হোক কিংবা সুরাটেই হোক—একটা কিছু ব্যবস্থা ক'রে চিঠি খলে তোমরা রওনা হ'য়ো।

দুই পক্ষই হাসিমুখে বিদায় নিলুম।

মাস দুয়েক কেটে গেল। প্রতিদিনই পণ্ডিতজীর কাছ থেকে চিঠি ও খবর পাবার আশায় ব'সে থাকি, কিন্তু নিত্যই নিরাশ হই। আমি যে খানে থাকব না এবং শীগগির বোম্বাইয়ে চাকরি নিয়ে চ'লে যাব—এ কথা বন্ধুবর্গদের কাছে গোপনে প্রকাশও ক'রে ফেলেছি। কোনো কোনো বন্ধুকে প্রতিশ্রুতিও দিয়ে ফেলেছি যে, বোম্বাই শহরে গিয়ে বসবার পর তাদেরও একটা যা হোক কিছু জুটিয়ে দেব। সুকান্তর সঙ্গেও দস্তুরমতন চিঠি-চালাচালি গোপনে। ঠিক হয়ে আছে, পণ্ডিতজীর চিঠি পেলেই তাকে জানাব। কিছু টাকাকড়ির ব্যবস্থাও ক'রে রেখেছে। এই রকম উদ্বেগ, আশা উৎকণ্ঠায় আমাদের দিন কাটছে, এমন সময় প্রায় মাস দুয়েক বাদে আমাদের অপ্রত্যাশিত পণ্ডিতজীর চিঠি এসে হাজির হ'ল।

বোম্বাইয়ের তাজমহল হোটেলের কাগজে লেখা চিঠি—

। স্থবির ও সুকান্ত,

কলকাতা থেকে এসেই তোমাদের চিঠি দেবার কথা ছিল, কিন্তু কার্যগতিকে সম্ভব হয় নি। আপিসের নানা গোলোযোগের মধ্যে দিন কাটছিল—

ভেবেছিলুম; সে সব মিটে গেলে শান্তিতে ব'সে তোমাদের চিঠি লিখব—তা আর হয়ে ওঠে নি।

ওখান থেকে যখন আসি, তখন দেবীর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে ডাক্তারেরা আমায় খুব সাবধান হতে ব'লে দিয়েছিলেন। কিন্তু শত সাবধানতা সত্ত্বেও মাসখানেকের মধ্যেই সে অসুস্থ হয়ে পড়ল। প্রায় মাস-দুই কঠিন রোগযন্ত্রণা ভোগ ক'রে সে চ'লে গিয়েছে।

আর আমার এ দেশে থাকবার প্রয়োজন নেই। এখানে আমার পূর্বপুরুষদের সঞ্চিত যে সব বিষয়সম্পত্তির মালিক আমি হয়েছিলুম, তা বিক্রি ক'রে শঙ্করকে নিয়ে আমি ফিরে চললুম ফ্রান্সে—ভবিষ্যৎ ঈশ্বরের হাতে।

কাল বেলা একটার সময় আমরা জাহাজে চড়ব। তোমরা দুজনে আমার সন্তানদের রক্ষা করতে নিজেদের প্রাণ বিপন্ন করেছিলে—সে কথা কখনও ভুলব না। সেজন্যে যতদিন বাঁচব ততদিন কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তোমাদের স্মরণ করব। ঈশ্বর তোমাদের মঙ্গল করুন।

সেই থেকে পণ্ডিতজী বা শঙ্করের দেখা পাওয়া তো দূরের কথা, তাদের কোনও খোঁজই পাই নি। কিন্তু দেবী আমাকে ভোলে নি। মাঝে মাঝে স্মৃতির সরণী বেয়ে এসে সে আমাকে চমকে দিয়ে চ'লে যায়।

॥ তৃতীয় পর্ব সমাপ্ত ॥